ড. সুহাইল তাক্কুশ

মুসলিম জাতির ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

অনুবাদ

সাআদ হাসান

মাহমুদ সিদ্দিকী

আমার আস্থা, পাঠক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে আনন্দ ও উপকারিতা একসঙ্গে উপার্জন ও উপভোগ করবেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ঘটনার সমাধানের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার মুখোমুখি হতে পারবেন। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন গ্রন্থটিকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন এবং আরব ও মুসলিম পাঠকদের এর দ্বারা উপকৃত করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও মনোবাঞ্ছা পূরণ করার একমাত্র মালিক ।

-ড. মুহাম্মাদ সুহাইল তাক্কুশ

ড. সুহাইল তাক্কুশ

মুসলিম জাতির ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

সাআদ হাসান
মাহমুদ সিদ্দিকী
অনূদিত

বই : মুসলিম জাতির ইতিহাস (২ খণ্ড)
মূল : ড. সুহাইল তাক্কুশ
অনুবাদ : সাআদ হাসান, মাহমুদ সিদ্দিকী
সম্পাদনা : মাহমুদ সিদ্দিকী
নিরীক্ষণ : ইমরান রাইহান
প্রকাশকাল : মে ২০২২/শাওয়াল ১৪৪৩
প্রকাশনা : ২১
পৃষ্ঠাসজ্জা : আবু আফিফ মাহমুদ
বানান সমন্বয় : মুহিব্বুল্লাহ মামুন
প্রকাশক : বোরহান আশরাফী
চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (১ম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক : মাকতাবাতুল আমজাদ, ফোন : ০১৭১২-৯৪৭ ৬৩৫
অনলাইন পরিবেশক : উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল, পরিধি

মূল্য : ১২০০.০০৳

Muslim Jatir Itihas by Dr. Suhail Taqqush. Translated by Saad Hasan, Mahmud Siddiqui, Edited by Mahmud Siddiqui,
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657; 01303-855 225

অর্পণ

মরহুম আব্বার মাগফিরাত কামনায়
আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন
এবং
পরম মমতাময়ী আম্মার সুস্বাস্থ্য কামনায়
আল্লাহ তাঁর নেক হায়াতকে আমাদের ওপর দীর্ঘায়ত করুন।

—সাআদ হাসান

সূচি

দ্বিতীয় অধ্যায়

নববি যুগ

তৃতীয় অধ্যায়

খেলাফতে রাশেদার যুগ

(১১-৪০ হি./৬৩২-৬৬১ খ্রি.)

চতুর্থ অধ্যায়

উমাইয়া বংশের শাসনামল

(৪১-১৩২ হি./৬৬১-৭৫০ খ্রি.)

পঞ্চম অধ্যায়

আব্বাসি শাসনামল

আব্বাসিদের প্রথম যুগ

(১৩২-২৩২ হি./৭৫০-৮৪৭ খ্রি.)

আব্বাসি শাসনের দ্বিতীয় যুগ
(২৩২-৩৩৪ হি./৮৪৭-৯৪৫ খ্রি.)

আব্বাসি শাসনের তৃতীয় যুগ
(৩৩৪-৪৪৭ হি./৯৪৫-১০৫৫ খ্রি.)

আব্বাসি শাসনের চতুর্থ যুগ
(৪৪৭-৬৫৬ হি./১০৫৫-১২৫৮ খ্রি.)

অনুবাদকের কথা

মানব সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিক পরিবর্তনের প্রামাণ্য ও লিখিত দলিল হলো ইতিহাস। ইতিহাস হলো বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ। মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যা সমাজ-সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তা সবই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান বিশ্বে নির্যাতিত ও নিপীড়িত মুসলিম জাতির রয়েছে সোনালি অতীত, আছে গৌরবময় ইতিহাস। একসময় মুসলমানরাই ছিল বিশ্বে পরাশক্তির অধিকারী। গোটা পৃথিবীই ছিল তাদের ভয়ে কম্পমান। তাদেরকে চোখ রাঙানি দেওয়ার মতো সাহস কারও ছিল না। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ সর্বত্রই ছিল তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মুসলিম বাহিনী এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। মুসা বিন নুসাইর বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করে মরক্কো, তাঞ্জিয়ার-সহ প্রায় সমগ্র আফ্রিকাতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে মাত্র ১২ হাজার মুসলিম সৈন্য রডারিকের ১ লাখের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে আন্দালুস (স্পেন, পর্তুগাল) জয় করে এবং মুসলমানরা সেখানে প্রায় ৮০০ বছর শাসন করে। তৎকালীন কর্ডোভার শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, সভ্যতা, ও ঐশ্বর্যের দ্যুতি যখন চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল তখন বর্তমান জ্ঞানগর্বিত ও সভ্যতাপ্রদীপ্ত ইংরেজ, ফরাসি ও জার্মানদের পূর্বপুরুষগণ কুসংস্কার, জঞ্জাল ও অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মুসলমানরাই ভারত উপমহাদেশ শাসন করে।

চতুর্দশ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানরা উসমানি সাম্রাজ্যের অধীনে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বেশিরভাগ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করত। প্রায় ৫২ লাখ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত সেই সাম্রাজ্যে পৃথিবীর বর্তমান মানচিত্রে প্রায় ৪২টি দেশের অবস্থান। সেই সময় তাদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, বর্তমান সুপার পাওয়ার আমেরিকা ১৭৯৫ সালে উসমানি

বাহিনী কর্তৃক আলজেরিয়ার উপকূলে আটককৃত নাবিক ও জাহাজসমূহ ফেরত লাভ এবং আটলান্টিক ও ভূমধ্য সাগরে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য উসমানি খেলাফতকে মোটা অঙ্কের এককালীন নগদ ও বার্ষিক কর প্রদানের শর্তে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯০১ সালে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের কাছে ইহুদিরা লোভনীয় প্রস্তাবের বিনিময়ে ফিলিস্তিনে সামান্য জমি বরাদ্দ চেয়েছিল; কিন্তু সেদিন সুলতান আবদুল হামিদ তাদেরকে যে জবাব দিয়েছিলেন ইতিহাসের পাতায় তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি বলেছিলেন, "ফিলিস্তিন গোটা মুসলিমবিশ্বের সম্পদ। এর এক মুষ্টি মাটিও আমি তাদের দেবো না; কারণ, আমি এর মালিক নই। আমি বেঁচে থাকতে কোনো দিন ফিলিস্তিনের ভূমি ইহুদিদের হতে দেবো না।"

বর্তমান প্রজন্মকে মুসলমানদের সেই হারানো গৌরব ফিরে পেতে হলে নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস জানতে হবে। কারণ, ইতিহাস মানুষের আত্মোপলব্ধির চাবিকাঠি। ইতিহাস পাঠ মানুষকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুঝতে এবং ভবিষ্যতের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণে সাহায্য করে। নিজ জাতির সফল সংগ্রাম এবং গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি বৈরুতে অবস্থিত জামিয়াতুল ইমাম আল-আওযায়ি-এর 'ইসলামের ইতিহাস' বিভাগের অধ্যাপক ড. সুহাইল তাক্কুশের একটি অনবদ্য রচনা। গ্রন্থকার এ গ্রন্থের শুরুতে জাহেলি যুগের আরব সমাজের ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। অতঃপর তিনি 'নববি যুগ' শিরোনামের অধীনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন, নবুওয়ত লাভ, মক্কি-জীবন ও মাদানি-জীবনের গুরত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো সংক্ষিপ্ত ভাষায় সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা একজন সিরাত পাঠকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরপর তিনি খেলাফতে রাশেদার যুগ হতে উসমানি সাম্রাজ্য পর্যন্ত চৌদ্দশ বছরের ইসলামি শাসন ও মুসলিম জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অত্যন্ত সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, ইতিহাসের পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের জন্য যা জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরি।

ড. সুহাইল তাক্কুশের এ বইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি অল্প কথায় ইসলামি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল, রাজত্ব ও শাসন নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং ঘটনাপ্রবাহের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিবরণের চেয়ে বিশ্লেষণ

ও সামগ্রিক মূল্যায়নকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে এ বই পাঠের মাধ্যমে পাঠক ইসলামি ইতিহাস ও মুসলিম শাসনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির বিশ্লেষণ সহজে আয়ত্ত করতে পারবে এবং বইটি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক চিত্র তার মস্তিষ্কে গেঁথে যাবে। লেখক প্রতিটি তথ্যের সাথে তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আরবি, ইংরেজি, ফারসি-সহ বিভিন্ন ভাষার প্রামাণ্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। লেখক বিভিন্ন ঘটনার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে নিজস্ব মতামত প্রদান করে তার প্রাজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে মনে রাখতে হবে যে, যেহেতু এটি একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসগ্রন্থ, তাই অনুসন্ধিৎসু পাঠককে ঘটনাবলির বিস্তারিত ও আদ্যোপান্ত জানতে এটির ওপর নির্ভর না করে ইতিহাসের বৃহৎ গ্রন্থাবলির সাহায্য নিতে হবে।

ড. সুহাইল তাক্কুশ রচিত (التاريخ الإسلامي الوجيز) 'মুসলিম জাতির ইতিহাস' গ্রন্থের সিরাত অংশের অনুবাদ করেছেন উদীয়মান তরুণ আলেম মাওলানা মাহমুদ সিদ্দিকী, যিনি ইতোমধ্যেই বিভিন্ন রচনা ও লেখালেখির মাধ্যমে তার প্রতিভার প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছেন। আল্লাহ তার লেখনীকে উম্মতের জন্য ব্যাপক উপকারী হিসেবে কবুল করুন। বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা শতভাগ বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রেখে লেখকের বক্তব্য ও মর্মকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। কোথাও বিশেষ কোনো তথ্য বা সংশোধনীর প্রয়োজন হলে টীকার মাধ্যমে তা সংযোজন করে দিয়েছি এবং পাঠক যেন তথ্যসূত্র সহজে খুঁজে বের করতে পারেন তাই মূলগ্রন্থের শেষে গ্রন্থপঞ্জিতে বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে বাংলা নামের পাশাপাশি মূল আরবি ও ফারসি কিতাবের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকাল ইত্যাদি উল্লেখ করেছি, আর ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার গ্রন্থের ক্ষেত্রে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে বইয়ের নাম উল্লেখ করেছি। পাঠকের অধিক উপকারার্থে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মানচিত্রসমূহও বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো বইটিকে নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। এরপরও যেহেতু মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই এ বইয়ের মধ্যে যা-কিছু সঠিক ও উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে তা কেবলই মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ এবং যেসব ভুল পাওয়া যাবে; তার দায়ভার আমার ও শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত হবে। তারপরও মানবিক দুর্বলতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কোনো ভুলত্রুটি কারও নজরে এলে আমাকে তা অবগত করলে কৃতজ্ঞ হব।

বইটির ব্যাপারে সকলের সুচিন্তিত অভিমত সাদরে গৃহীত হবে। পরিশেষে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ ও আনুষাঙ্গিক সব ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য চেতনা প্রকাশন ও এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ। আল্লাহ সকলের চেষ্টা ও শ্রমকে তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন এবং এ বইয়ের লেখক ও পাঠক-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

সাআদ হাসান
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
১৫. ০৪. ২০২২ খ্রি.
m.saadhasan92@gmail.com

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সাইয়িদুনা খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং সালাম ও বরকত নাজিল হোক তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবির প্রতি। কথা হচ্ছে, কোনো কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে শুধু বিষয়বস্তু বললে হয় না; বরং রচনার ধাপগুলোও বলতে হয়। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি পহেলা হিজরি থেকে ১৩৪২ হিজরি পর্যন্ত (৬২২-১৯২৪ খ্রি.) এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মুসলিম বিজয়ের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে রচিত। মুসলিমবিশ্বের ইতিহাস পাঠ করার পর লক্ষ করেছি, নববি যুগ বাদে প্রত্যেক যুগের ঘটনাবলি ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব-সংক্রান্ত যে চিন্তা ও বিশ্লেষণ, তা অনেকাংশে সত্য প্রমাণ করেছে। সাম্রাজ্যের জন্মলাভ দিয়ে শুরু, ক্রমবিকাশ পার হয়ে উত্থানের শীর্ষচূড়ায় আরোহণ, অতঃপর ক্রমান্বয়ে পতন। আসলে সাম্রাজ্যগুলো পরতে পরতে ভাঙনের বীজ ধারণ করে; খুব দ্রুত তা বাড়তে থাকে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়; একসময় ভাঙন ঘটে। স্মৃতি হিসেবে রয়ে যায় কেবল কীর্তি। আর তার ইতিহাস হয় পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষার উপাদান। প্রথমে ভূমিকাস্বরূপ জাহেলি যুগ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করে এই গ্রন্থে আমি আটটি মুসলিম শাসনযুগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

নববি যুগ ইসলামধর্মের আকিদার মূল ভিত স্থাপন করেছে, নির্ধারণ করে দিয়েছে কর্মপদ্ধতি। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় একক নেতৃত্বের ছায়াতলে জাজিরাতুল আরবের ভূখণ্ডগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। সুতরাং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর সিরাত হলো সকলের অনুসরণীয় আদর্শ। নবীজির সিরাতে যে-পূর্ণতা পাওয়া যায়, বাবাদের উচিত সন্তানদের তা শিক্ষা দেওয়া। একজন মানুষের সাধ্য যতটা বিস্তৃত হতে পারে, তার সর্বক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মানবিক পূর্ণতার সর্বোত্তম উদাহরণ।

প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারিত্রিক পূর্ণতা, বুদ্ধির পূর্ণতা এবং আত্মার পূর্ণতা—সব ধরনের উত্তম গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং রব; এবং সর্বোত্তম শিক্ষা দিয়েছেন। নবীজিকে বানিয়েছেন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের জীবন্ত নমুনা; যিনি তাঁর ঈমানি শক্তি দিয়ে যুগের সমস্ত ভ্রান্তি নিরসন করে দিতে পারেন। তিনি তাঁর কওমের চিরাচরিত অভ্যাস ও চিন্তাচেতনা বদলে দিতে পেরেছেন। তাদের চারিত্রিক সমস্যাবলি সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের উত্তম আদর্শের পথে পরিচালিত করেছেন এবং তাদের মহান ও পবিত্র মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। যারা ঈমানের শক্তি দিয়ে নিজেদের পথ রচনা করতে চায়, তাদের জন্য নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে প্রায়োগিক শিক্ষা রয়েছে।

খেলাফতে রাশেদার যুগকে (১১-৪০ হিজরি/৬৩২-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ) নববি যুগের ব্যাপ্তি হিসেবেই ধরা হয়। কারণ খোলাফায়ে রাশেদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খুব বেশি সম্পৃক্ত ছিলেন এবং নবীজির পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। পার্থক্য হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহির ধারক ছিলেন। পাশাপাশি ওহির কারণে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পরিবর্তনও আসত।

আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর সংক্ষিপ্ত খেলাফতকাল (১১-১৩ হিজরি/৬৩২-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) বড় ধরনের কিছু ঘটনার সম্মুখীন হয়, যা অগ্রসরমান ইসলামি রাষ্ট্রের কাঠামোর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কিছু গোত্রের মধ্যে ইরতিদাদের (ধর্মত্যাগ) ফিতনা দেখা দেয়। মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার প্রকাশ পায়। মুরতাদ ও নবুওয়তের দাবিদারদের নির্মূল করার পর জাজিরাতুল আরবের বাইরে ইসলামের বিজয় শুরু হয়।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. (১৩-২৩ হিজরি/৬৩৪-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) ইসলামের বিজয়কে পূর্ণতা দান করেন। খেলাফতের পরিধি বিস্তৃত হয়ে শাম, মিসর, ইরাক ও পারস্যের অঞ্চলগুলো অন্তর্ভুক্ত করে। বিজিত অঞ্চলগুলোর মানুষজন ইসলামে প্রবেশ করে। কেউ কেউ ইসলাম অন্তরে বদ্ধমূল করতে পারেনি; বরং ইসলাম ছিল তাদের কাছে কপটতা গোপন করা ও গা-বাঁচানোর উপায় এবং সুযোগের অপেক্ষামাত্র। ফলে উমর রাযি. এই 'জাতীয়তাবাদী চেতনা'র শিকার হয়ে শহিদ হন।

উসমান ইবনে আফফান রাযি.-এর খেলাফতকাল (২৪-৩৫ হি./৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) ছিল ইসলামি রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিরতার সূচনাকাল। এমনকি তিনি নিজেও এ অস্থিরতার শিকার হয়ে শহিদ হন।

আলি ইবনে আবি তালিব রাযি.-এর খেলাফতকালে (৩৬-৪০ হি./৬৫৬-৬৬১ খ্রি.) ফিতনা বাড়তে থাকে। এ সময় একাধিক ফেরকার জন্ম হয় এবং সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ডালপালা বিস্তৃত হতে থাকে। এর সাথে যুক্ত হয় পারস্পরিক যুদ্ধ ও সংঘাত। আর এইসব কিছুরই শিকার হন আলি ইবনে আবি তালিব রাযি.।

খেলাফতে রাশেদার পর প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া খেলাফত সূচনা থেকে পতন পর্যন্ত আগাগোড়া অধিকাংশ ইতিহাসবিদের কাছে এক প্রহেলিকাঘন চিত্র-স্বরূপ বিরাজমান। তাদের রচনাতে উমাইয়া খেলাফত বিবিধ বীভৎসরূপে অঙ্কিত হয়ে বিভীষিকার অভিধায়ে চিত্রিত হয়ে আছে। এই অন্ধকার আরও বাড়িয়েছে উমাইয়া শাসনামলে সংঘটিত মুসলিমদের অনুভূতি নাড়িয়ে দেওয়া বড় দুর্ঘটনাগুলো। কারবালার দুর্ঘটনা, মক্কা-মদিনায় হামলা। এগুলো উমাইয়াদের সুখ্যাতি ছাপিয়ে নেতিবাচক মনোচিত্র তৈরি করেছে। উসমান রাযি.-এর হত্যা ও সিফফিন যুদ্ধের পর রাজনৈতিক অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করা দলের সংখ্যাও বেড়েছে। শিয়া, খারেজি, ক্ষমতালোভী এবং বিদ্বেষীদের সঙ্গে সঙ্গে উমাইয়াদের শত্রুসংখ্যাও বেড়েছে। অপরদিকে উমাইয়ারা ব্যাবহারিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক এমন কিছু কীর্তি রেখে গেছে, যা তাদের সম্পর্কে নিছক ক্ষমতালিপ্সার অভিযোগ নাকচ করে দেয়। তাওহিদ ও জিহাদের পতাকা সমুন্নত করার ক্ষেত্রে তারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তারা যে-বিজয় নিয়ে এসেছে, যে-মর্যাদাসৌধ তারা নির্মাণ করেছে, ইসলামের মৌলিক চেতনা থেকে তা আলাদা করা সম্ভব নয়; যা নববি যুগ থেকে মুসলিমদের প্রধান উদ্দীপক হিসেবে কাজ করেছে।

আব্বাসি ইতিহাসের ঘটনাগুলো জটিল ও দুর্বোধ্য। নানারকম রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। আব্বাসি যুগকে উমাইয়া যুগের সম্পূরক কাল ধরা হয়। তবে আব্বাসি খেলাফতে আরবি, পারসিক ও তুর্কি—বিভিন্ন জাতীয়তাবাদ প্রভাব বিস্তার করেছিল। উমাইয়াদের থেকে আব্বাসিদের কাছে ক্ষমতা স্থানান্তরের প্রক্রিয়া একটি গণঅভ্যুত্থানের রূপ

নেয়। যা ইসলামি শাসনের বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বাঁকের জন্ম দিয়েছে। এটি মুসলিম-সমাজের মৌলিক চিত্র পালটে দিয়েছে; জীবনের সকল ক্ষেত্রে ফেলেছে সুস্পষ্ট ছাপ। এই ঘটনা অনারব মুসলিমদের সামনে রাজনৈতিক অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ এবং ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বরং বলা যায়, নেতৃত্বের কেন্দ্রে আসার পথ সুগম করে দিয়েছে।

আব্বাসি শাসনের প্রথম ধাপের (১৩২-২৩২ হিজরি/৭৫০-৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) দুর্ঘটনাগুলো খলিফাদের ভালো কাজের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু শেষ ধাপের (২৩২-৬৫৬ হিজরি/৮৪৭-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) ঘটনাগুলো ঘটেছে খেলাফতে আব্বাসির ছায়ায় গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর অধীনে। যারা খেলাফতের রাজনৈতিক শক্তির পতনের কালে মুসলিমবিশ্বকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

আন্দালুসের ইতিহাসের (৯৫-৮৯৭ হিজরি, ৭১৩-১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ) ঘটনাগুলোকে ধরা হয় মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে। উন্নতি, উৎকর্ষ, অধঃগতি ও পতন-সহ সবটুকুকে। এ কথা স্পষ্ট যে, আন্দালুস-বিজয় ছিল মরক্কো বিজয়ের স্বাভাবিক বিস্তার। পরবর্তী সময়ে একটি অপরটির সাথে একাকার হয়ে গিয়েছে। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ উভয়কে ঐক্যের ছায়াতলে নিয়ে আসে। আন্দালুস তার স্বর্ণযুগ কাটিয়েছে প্রথমে উমাইয়া প্রশাসনের অধীনে এবং পরে উমাইয়া খেলাফতের আমলে। এরপর আন্দালুসের শহরগুলো পতনের সাক্ষী হয়েছে। আন্দালুসের সমাজ বিবদমান বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। যা স্পেনিশদের রাষ্ট্র পুনরুদ্ধার তৎপরতায় প্রচণ্ড রকম উৎসাহিত করেছে। এই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে গ্রন্থের আলোচনা এগিয়েছে।

তারপর মাগরিবে প্রতিষ্ঠিত আদ-দাওলাতুল উবাইদিয়ার (ফাতেমিয়া) (২৯৭-৫৬৭ হিজরি/৯১০-১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ) ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছি। সেখান থেকে চলে গেছি মিসরে—মাযহাবের ইখতিলাফের কারণে প্রাচ্যে চলমান আব্বাসি খেলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখার জন্য। প্রতিষ্ঠা থেকে নিয়ে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির হাতে পতন পর্যন্ত উবাইদি সাম্রাজ্য যতগুলো ধাপ অতিক্রম করেছে, তার সবগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি।

মোঙ্গলদের হামলায় (৬৫৬ হিজরি/১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে) আব্বাসি খেলাফতের পতন ঘটে। এরপর আইয়ুবি সাম্রাজ্যের ছায়ায় বেড়ে ওঠা তুর্কি মামলুকরা আড়াই শতাব্দী (৬৪৮-৯২৩ হিজরি/১২৫০-১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত মুসলিমবিশ্বের নেতৃত্বের আসনে অবস্থান করে। ইসলামি ঐতিহ্য রক্ষায় তারা প্রচুর কুরবানি দিয়েছে। তারা মুসলিমবিশ্বে দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিয়েছে। মুসলিম প্রাচ্য থেকে অবশিষ্ট ক্রুসেডারদের তাড়িয়ে দিয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা সত্ত্বেও কায়রোতে আব্বাসি খেলাফতের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছে।

তারপর উসমানিদের (৬৯৮-১৩৪২ হিজরি/১২৯৯-১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ) হাতে খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকের শুরুর দিকে মামলুকদের পতন ঘটে। উসমানিরা ইসলামের অর্জনগুলো উত্তরাধিকাররূপে লাভ করে। তারা তা সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার আরও কিছু অঞ্চল নিজেদের শাসন অন্তর্ভুক্ত করেছিল—যারা সামগ্রিক মুসলিম ঐক্য বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিংবা ইউরোপীয়দের জন্য যারা হুমকিস্বরূপ ছিল। তারা ইউরোপীয় শক্তির মোকাবেলায় পাশ্চাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। উসমানিরা মুসলিমবিশ্বের পরিধি এমন সব অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল, যেখানে ইতঃপূর্বে কখনো ইসলামের প্রবেশ ঘটেনি।

কিন্তু এই উসমানি সাম্রাজ্যও পর্যায়ক্রমে পতনের সম্মুখীন হয়। সুলতান সুলাইমান আল-কানুনির মৃত্যুর (৯৭৪ হিজরি মোতাবেক ১৫৬৬ খ্রিষ্টাব্দ) সঙ্গে সঙ্গে কার্যত পতন শুরু হয়ে যায়। একদিকে উসমানি সমাজ ও শাসনব্যবস্থায় শিথিলতা দেখা দেয়, অপরদিকে জাগতিক উন্নয়নের বাহনে ভর করে ইউরোপীয়রা পুনর্জাগরণ ও নতুন যুগের সূচনা করে। তিন মহাদেশেই উসমানি সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলগুলো আস্তে আস্তে হাতছাড়া হতে শুরু করে। ১২৯৫ হিজরি মোতাবেক ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বার্লিন কনফারেন্সের মাধ্যমে উসমানি সাম্রাজ্যের দৃশ্যমান পতনের সূচনা হয়। চূড়ান্ত পতন ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। একদিক দিয়ে প্রবেশ করে ইউরোপীয় ও জায়নবাদীরা, অপরদিকে উসমানি সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক লিপ্সা; যারা সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে বরখাস্ত করে ক্ষমতা গ্রহণ

করেছিল। উসমানি খেলাফতের ভগ্নাবশেষের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় ঐতিহ্য বিস্মৃত আধুনিক তুরস্ক।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, আরবি ভাষাভাষীদের পাঠাগারগুলো একজন বিশেষজ্ঞের গবেষণালব্ধ একটি গ্রন্থের অপেক্ষায় আছে; যাতে মুসলিম শাসনামলসমূহের ইতিহাস সামগ্রিক মূল্যায়নে উপস্থাপিত হবে। একজন আরব ও মুসলিম পাঠকের সামনে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে আমি এই সর্বজনগ্রাহ্য সত্যিকার মূল্যায়ন-শৈলীর ওপরই নির্ভর করেছি। যাতে একজন পাঠক সামগ্রিকভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাস জানতে পারে। পাশাপাশি আমি বাহুল্য বিবরণ পরিহার করেছি; ইতিহাসের রহস্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জানতে আগ্রহ পোষণ করেন এমন অনুসন্ধানী পাঠক, যেগুলোকে প্রয়োজনীয় মনে করেন।

আমার আস্থা, পাঠক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে আনন্দ ও উপকারিতা—একসঙ্গে উপার্জন ও উপভোগ করবেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ঘটনার সমাধানের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার মুখোমুখি হতে পারবেন। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন গ্রন্থটিকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন এবং আরব ও মুসলিম পাঠকদের এর দ্বারা উপকৃত করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও মনোবাঞ্ছা পূরণ করার একমাত্র মালিক।

ড. মুহাম্মাদ সুহাইল তাক্কুশ
০১. ০৪. ২০০১, বৈরুত

প্রথম অধ্যায়

জাহেলি যুগ[১]

[১] ঐতিহাসিকগণ ইসলামপূর্ব আরবের ইতিহাসকে 'জাহেলিয়াতের ইতিহাস' বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। জাহেলিয়াত পরিভাষাটি ইসলাম আগমনের পর সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম-পরবর্তী অবস্থা থেকে আলাদা বোঝাতে ইসলাম-পূর্ববর্তী অবস্থাকে জাহেলিয়াত বলা হয়।–*আল মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম* : আলি জাওয়াদ, খ. ১, পৃ. ৩৭।

পূর্বকথন

মুসলিম শাসনের ইতিহাস অধ্যয়নের আগে আমাদের ইসলাম-পূর্ববর্তী সময়ের ইতিহাস জানতে হবে। বিশেষ করে আরব জাতিগুলোর ইতিহাস এবং পার্শ্ববর্তী পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের অবস্থা বুঝতে হবে।

ইসলামি আকিদার ঐক্যের ছায়াতলে আসার পূর্বের জাহেলি যুগ হলো এই জাতিগুলোর ইতিহাসের প্রথম উৎস। চলুন জেনে নিই, পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী জাতিগুলো তাদের থেকে কতটুকু সাহায্য পেয়েছিল। মুসলিম বিজেতারা এদের মুখোমুখি হয়েছিল অনেকটা ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিয়ে। এই সাম্রাজ্যগুলোর অনেকে মুসলিম বিজেতাদের হাত ধরে পরবর্তীকালে ইসলামে প্রবেশ করেছিল।

আমরা এখন জাহেলি যুগে প্রবেশ করছি। শুরুর ধাপে আছি। জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে জাজিরাতুল আরবের বাসিন্দারা যেসব পরিবেশ-পরিস্থিতি অতিক্রম করেছে, প্রথমে আমরা এর মৌল বিষয়গুলো খুঁজে বের করতে চেষ্টা করব। কারণ, সেই মৌল বিষয়গুলোই ইতিহাসে তাদের উৎকর্ষের পথে প্রধান চালিকাশক্তিরূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

এ কথা সুবিদিত যে, ইসলামপূর্ব আরবের ইতিহাসের মোট দুটি ধাপ রয়েছে। দ্বিতীয় ধাপটির পরিসীমা হলো খ্রিষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ—এই দুই শতাব্দীর আগ পর্যন্ত। ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে মোটামুটি একমত।

আরবদের জীবনব্যবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার মৌলিক বিষয়গুলো ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; যেখানে তারা জন্মলাভ করেছে এবং বেড়ে উঠেছে। এজন্য প্রথমেই আমরা জাজিরাতুল আরবের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করব।

ভৌগোলিক পরিবেশ

জাজিরাতুল আরবের (আরব উপদ্বীপপুঞ্জ) ভৌগোলিক পরিবেশ জাহেলি যুগের ইতিহাসে উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। জাজিরার বাসিন্দাদের ওপর তাদের ভৌগোলিক পরিবেশ বিশেষ প্রভাব রেখেছে। মানুষ পরিবেশের সন্তান। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার পরিবেশে যদি

স্পষ্ট ভিন্নতা থাকে, তা হলে এর আবশ্যিক ফলাফল হলো—অঞ্চলভেদে তাদের সভ্যতা ও অগ্রসরমানতার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা থাকবে। আমরা পরবর্তী ধাপগুলোতে জাজিরাতুল আরবের ভৌগোলিক পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করব। স্বাভাবিকভাবে ভৌগোলিক পরিবেশের আলোচনা তিনটি ভাগে বিভক্ত : ১. ভৌগোলিক অবস্থান, ২. গঠন ও অবকাঠামোগত অবস্থা এবং ৩. অভ্যাস ও আচরণগত অবস্থা।

ভৌগোলিক অবস্থান

জাজিরাতুল আরব হলো, এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। এর পরিধি ৩০ লাখ বর্গকিলোমিটার। ভূখণ্ডটি তিন দিক থেকে জলবেষ্টিত। পূর্ব সীমান্তে আরব উপসাগর, দক্ষিণ দিকে ভারত উপ-মহাসাগর এবং পশ্চিম দিকে লোহিত সাগর। উত্তর দিকে এর পরিধি আকাবা উপসাগর (Gulf of Aqaba) থেকে নিয়ে আরব উপকূলের মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই পরিধি যে-সীমান্ত তৈরি করেছে—একে বলা হয় 'আল-হিলালুল খাসিব' বা চন্দ্রাকার ভূমি (Fertile Crescent)।[২]

আরব্য পণ্ডিতগণ রূপকার্থে তাদের ভূখণ্ডকে উপদ্বীপ বলে ডাকেন।[৩]

গঠন ও অবকাঠামোগত অবস্থা

গঠন ও অবকাঠামোগতভাবে জাজিরাতুল আরবের অধিকাংশ ভূখণ্ড মরুভূমি ও সমভূমির সমন্বয়ে গঠিত। তাদের আচার-আচরণ ও স্বভাব-প্রকৃতিতে পার্থক্য থাকলেও সেখানে মরু-স্বভাবের প্রভাবই বেশি। কারণ, জাজিরার কিছু ভূমি বালুর ঢিবি, আবার কিছু ভূমি পাহাড়, টিলা ও অগভীর গর্ত। উঁচু মালভূমি তো আছেই। আরবের গঠন ও অবকাঠামোগত ভূগোল অধ্যয়ন করে আমরা দেখতে পাই—জাজিরাতুল আরব বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত :

আন-নুফুদ : বিস্তীর্ণ বালু-মরুভূমি, যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে গ্রানাইট পাথরের চূর্ণ। নুফুদ জাজিরাতুল আরবের উত্তর দিকে নজদ ও শামের মরু অঞ্চল এবং নজদ ও আহসার মাঝামাঝি অবস্থিত।[৪]

---

২. *কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক*, আল-ইস্তাখরি, আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ আল-ফারিসি, পৃ. ২১; *সিফাতু জাজিরাতিল আরব*, হামাদানি, আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আহমাদ, পৃ. ১।

৩. *মুজামুল বুলদান*, ইয়াকুত আল-হামাবি, খ. ২, পৃ. ১৩৭।

৪. *আল মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, আলি জাওয়াদ, খ. ১, পৃ. ১৫২-১৫৩।

আল-হিরার : হাররা হলো লাভাময় কালো পাথুরে পাহাড়। আল হিরার বা লাভাময় কালো পাথুরে পাহাড় জাজিরাতুল আরবের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। অবশ্য কোনো কোনো মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং নজদের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলেও লাভাময় কালো পাথুরে পাহাড় রয়েছে। এ ছাড়া দক্ষিণাঞ্চলে 'আর রাবউল খালি' বা শূন্য মরুভূমিতে (Empty Quarter) তো পাওয়া যায়-ই। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'হাররাতু তাবুক' এবং খাইবারের নিকটে অবস্থিত 'হাররাতু নার'।[৫]

আরব উপদ্বীপ

৫. *মুজামুল বুলদান*, খ. ২, পৃ. ২৪৫।
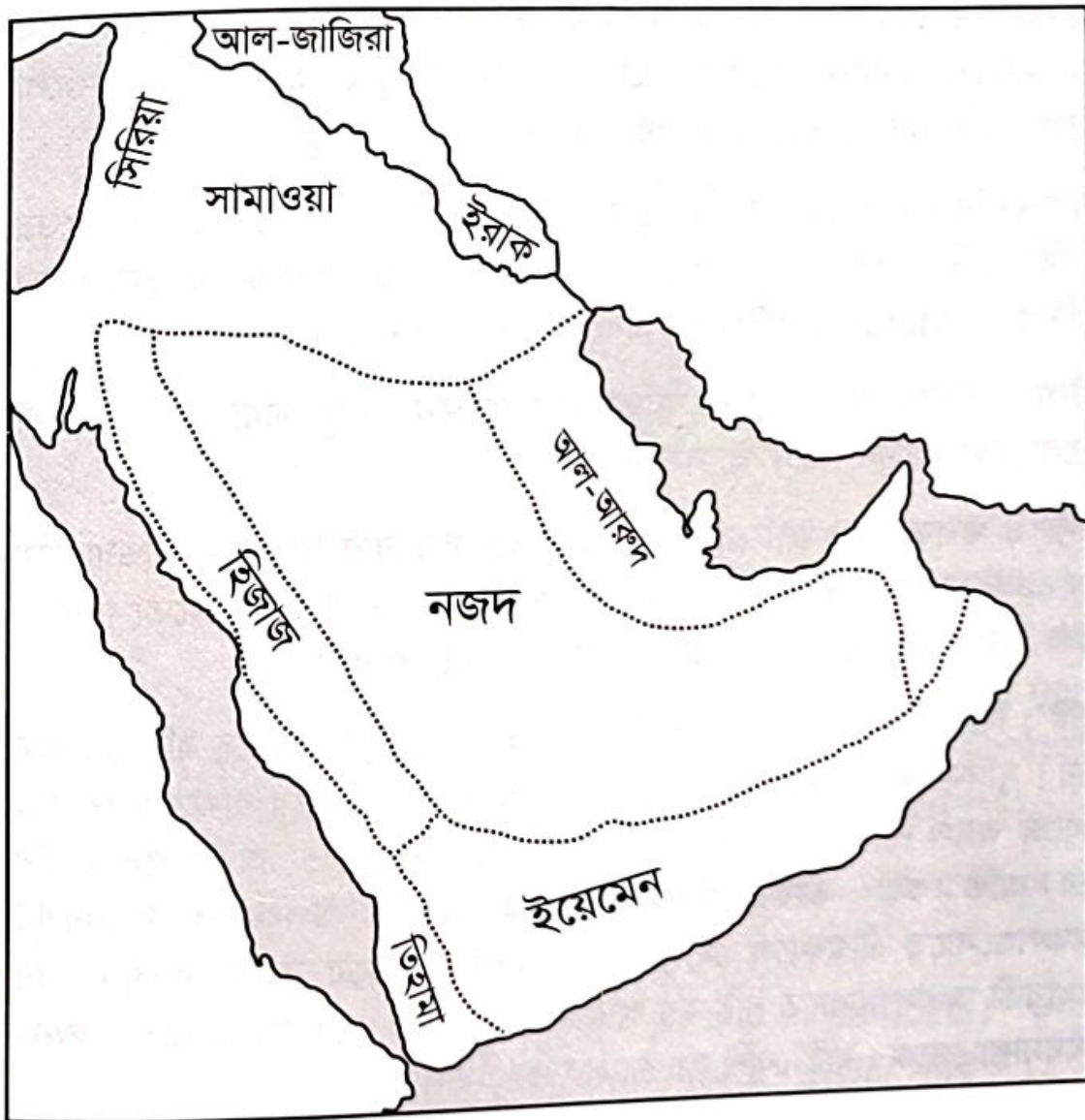
আদ-দাহনা : আদ দাহনা হলো লাল বালুময় বিস্তীর্ণ ভূমি। উত্তরে নুফুদ থেকে নিয়ে হাদরামাউত পর্যন্ত এবং দক্ষিণে মাহরা পর্যন্ত, পশ্চিমে ইয়েমেন এবং পূর্বে ওমান পর্যন্ত বিস্তৃত। আদ দাহনার দক্ষিণ ভাগকে 'আর রাবউল খালি' বা শূন্য মরুভূমি (Empty Quarter) বলা হয়। পশ্চিম ভাগকে বলা হয় 'আহকাফ'।[৬]

আদ-দারাত : আদ দারাত হলো সমভূমি। টিলাবেষ্টিত কিছুটা গোলাকার অঞ্চল। এই এলাকায় কিছুটা ভূগর্ভস্থ পানি পাওয়া যায়। যার ফলে সেখানে ঘাস ও মরু-উদ্ভিদ জন্মায়।[৭]

আস-সুহুল : আস সুহুল হলো সমতল ভূমি। একটা ক্ষীণ রেখা হয়ে জাজিরাতুল আরবকে ঘিরে রেখেছে কিছু সমতল ভূমি। প্রসিদ্ধ সমভূমিগুলো হলো—তিহামা, হাদরামাউত এবং ওমানের উপকূলীয় ভূমিগুলো।

পর্বতশ্রেণি : সাধারণত উপকূলীয় সমভূমির পরেই থাকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের সারি। প্রসিদ্ধ পর্বতমালা হলো, লোহিত সাগরের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা মুতিল্লাহ (Metula) পর্বতমালা এবং দক্ষিণ পর্বতমালা।

টিলা : টিলাগুলোর অবস্থান পর্বতমালার পেছনে। এর মধ্যে বিখ্যাত টিলা হলো, 'হাজবাতুন নজদ' বা নজদের টিলা।

নদী ও উপত্যকা : জাজিরাতুল আরবে বড় বড় নদী বা সমুদ্র পাওয়া যায় না। এজন্য আরবাঞ্চলের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য হলো, তা আগুনের মতো গরম ও রুক্ষ অঞ্চল। তবে আরবে প্রচুর পরিমাণে উপত্যকা রয়েছে।

বৃষ্টি : তিন দিক থেকে পানিবেষ্টিত হলেও জাজিরাতুল আরবে বৃষ্টি খুব কম হয়। দুদিক থেকে লোহিত সাগর ও আরব উপসাগর ঘিরে রাখলেও কোনো কাজে আসে না। কারণ, একদিকে সাগর-দুটি সংকুচিত, অপরদিকে জমির স্তর অতি শুষ্ক। ভারত উপমহাসাগরের আর্দ্রতা উপকূলের কাছাকাছি অঞ্চলগুলোতে গ্রীষ্মকালে মৌসুমি বৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগে। আর মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলোতে বৃষ্টি হয় আরব-উপসাগরের আকাশে বাষ্পীভূত হওয়া মেঘমালা থেকে। বৃষ্টি বেশি হয় শাম্মার পর্বতমালায়।

---

৬. The Empty Quarter (in the Geographical Journal) : H. Philpy. 81. PP1-261.
১০. *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, খ. ১, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

হিজাজে মাঝেমধ্যে খরা মৌসুম চলে। এই অবস্থা কখনো টানা তিন বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত থাকে। আবার মাঝেমধ্যে শীতকালে মক্কা-মদিনায় প্রবল বর্ষণ হয়। বর্ষণ থেকে সৃষ্ট পাহাড়ি ঢল নেমে আসে উপত্যকা ও গিরিপথে। অনেক সময় কাবা পর্যন্ত সয়লাব হয়ে পড়ে সেই ঢলের রেশ।

বৃষ্টিবর্ষণের এই অনির্দিষ্টতার ফলে জাজিরাতুল আরবের বাসিন্দাদের জীবনযাপনে পার্থক্য দেখা দেয়। উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টি অনিয়মিত হয় বলে স্থায়ী কোনো কৃষিপ্রধান জীবন গড়ে ওঠেনি। সেখানে চারণভূমিতে যে-ঘাস জন্মায়, তাতে পশু-চরিয়ে যাযাবর লোকেরা জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে, সেখানকার জীবন পশুচারণ ও যাযাবরপ্রধান হয়ে ওঠে। অপরদিকে দক্ষিণাঞ্চলে নিয়মিত বৃষ্টি হওয়ার কারণে কৃষিপ্রধান স্থায়ী সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

আবহাওয়া : জাজিরাতুল আরবের আবহাওয়া সাধারণত প্রচণ্ড গরম। গ্রীষ্মকালে পাথুরে অঞ্চলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে লুহাওয়া প্রবাহিত হয়। সবচেয়ে কোমল বাতাস হলো পুবালি বাতাস। আরবরা একে 'সাবা' বলে। উত্তুরে বাতাস সাধারণত শীতল হয়। বেশি শীতল হয় পুবালি বাতাস। কারণ, প্রায় সময় তা তুষারে পরিণত হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

জাজিরাতুল আরবের প্রাকৃতিক পরিবেশ কত ভাগে বিভক্ত—ভূগোলবিদদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে এই শ্রেণিবিন্যাসে কিছুটা পার্থক্য দেখা দিয়েছে। গ্রিক ও রোমক ভূগোলবিদগণ আরবের প্রাকৃতিক পরিবেশকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের প্রথম যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি তারা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনা করেছেন উঁচু-নিচু ভূ-ভাগকে। তাদের করা ভাগটি নিম্নরূপ—

১. সুখীসমৃদ্ধ আরব। হিজাজ, ইয়েমেন এবং নজদ—এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।
২. পাথুরে আরব। সিনাই উপদ্বীপ (Sinai Peninsula) ও নাবাতিয়্যাহ সাম্রাজ্য (Nabataean Kingdom) এর অন্তর্ভুক্ত।
৩. মরু আরব। এর অন্তর্ভুক্ত হলো, 'বাদিয়া আশ-শাম' (Syrian Desert) বা সিরীয় মরুভূমি।

তবে আরব ভূগোলবিদরা এই শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে নিছক প্রাকৃতিক পরিবেশ বিবেচনা করেননি। বরং এ থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামপূর্ব যুগের আরব অধিবাসীদের জীবনযাত্রার চিত্রগুলোও সামনে রেখেছেন। তারপর পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন।[৮]

ভাগটি নিম্নরূপ—

তিহামা : তিহামা হলো লোহিত সাগরের কোলঘেঁষা উপকূলীয় সংকীর্ণ অঞ্চল। যার পরিধি ইয়াম্বু থেকে ইয়েমেনের নাজরান পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণে একে বলা হয়—ইয়েমেনের তিহামা।

হিজাজ : হিজাজ হলো তিহামার পূর্ব দিকে অবস্থিত উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের সারি, যা তৈরি করেছে সারাত পর্বতমালা (Sarawat Mauntains)। হিজাজ নজদের টিলা ও তিহামার মাঝে ব্যবধান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হিজাজের অঞ্চল সিরিয়া-সীমান্তের গিরিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাহাড়ি উপত্যকা, আগ্নেয়গিরি এবং পাথুরে ভূমির অবস্থান। যখন কূপ ও ঝরনার পানি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে শুরু করে, তখন ইয়াসরিব ও ওয়াদিল কুরার মতো বড় বড় জনপদগুলো গড়ে ওঠে।

নজদ : পূর্ব দিকে হিজাজ নজদের বিস্তৃত টিলা পর্যন্ত প্রসারিত, যেটিকে জাজিরাতুল আরবের হৃৎপিণ্ড বলা যেতে পারে। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঢালু হয়ে নেমে মিশে গেছে আরুজের সাথে। নজদের উত্তর দিকে অবস্থিত নুফুদ মরুভূমি। যা তাইমার (Tayma) মরূদ্যান থেকে শুরু হয়ে পূর্ব দিকে প্রায় ৩০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। উঁচু উঁচু বালির ঢিবি দিয়ে ভরতি। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে বিস্তৃত পশুচারণভূমি।

আরুজ : আরুজের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলো হলো—ইয়ামামা, বাহরাইন এবং এর আশেপাশের অঞ্চল। ভূগোলবিদ ইয়াকুত হামাভি অবশ্য ইয়ামামাকে নজদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেন।

ইয়েমেন : জাজিরাতুল আরবের পুরো দক্ষিণাঞ্চলকে ইয়েমেন বলা হয়। এর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলো হলো—হাদরামাউত, মাহরা (Mehri) এবং আশ-

---

৮. *মুজামুল বুলদান*, খ. ২, পৃ. ১৩৭-১৩৮; *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, খ. ১, পৃ. ১৬৩-১৮১।

শিহর। জাজিরার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণকে বলা হয় আশ-শিহর। বর্তমানেও এটি এ নামে প্রসিদ্ধ।

ইয়েমেন হলো তিন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয়ে গঠিত। **এক.** সংকীর্ণ কিন্তু উর্বর উপকূলীয় অঞ্চল, যা ইয়েমেনের তিহামা নামে পরিচিত। **দুই.** উপকূলের সমান্তরালে দাঁড়িয়ে থাকা পর্বতমালা, যা বিস্তীর্ণ সারাত পর্বতমালার (Sarawat Mountains) অংশ। **তিন.** তার পর সেখানে আছে নজদ ও শূন্য মরুভূমি (Empty Quarter) পর্যন্ত বিস্তৃত টিলা। এই তিন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয়ে গঠিত অঞ্চল হলো ইয়েমেন। ইয়েমেনে প্রচুর পাহাড়ি উপত্যকা এবং ফসলি সমতল ভূমি আছে।

আরব জাতিসমূহ

আরব জাতির ইতিহাস রচয়িতাগণ ইসলামপূর্ব আরবকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেন :

বিলুপ্ত আরব [العرب البائدة] : এরা হলো ওই সকল প্রাচীন আরব গোত্র, যারা ইসলাম আসার পূর্বে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ গোত্র হলো—আদ, সামুদ, তাসাম, জুদাইস এবং আমালিকা সম্প্রদায়।

শুদ্ধভাষী খাঁটি আদি আরব [العرب العاربة] : খাঁটি বা আদি আরব হলো কাহতান গোত্রের শাখাগুলো। তাদের আদি নিবাস ইয়েমেনে। কাহতানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দুটি শাখাগোত্র হলো, জুরহুম ও ইয়ারুব।

রূপান্তরিত বা পরিশোধিত আরব [العرب المستعربة] : রূপান্তরিত আরব হলো আদনানি বংশধর, যারা আদনান বিন ইসমাইল বিন ইবরাহিম খলিলের বংশধর। তাদের মধ্যে প্রথম ইসমাইল আলাইহিস সালাম জাজিরাতুল আরবে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং মক্কায় আবাস গড়ে তোলেন। তাদের রূপান্তরিত আরব বলার কারণ হলো, ইসমাইল আলাইহিস সালাম মূলত ইবরানি অথবা সুরিয়ানি ভাষায় কথা বলতেন। তারপর জুরহুম গোত্রের সদস্যরা যখন মক্কায় ইসমাইল আলাইহিস সালাম এবং তাঁর মায়ের সাথে বসবাস শুরু করেন, তখন ইসমাইল তাঁদের এক কন্যাকে বিয়ে করেন ও আরবি ভাষা শিখে নেন। শহুরে ও বেদুইন—আরবের অধিকাংশ জনগণই রূপান্তরিত বা ওই পরিশোধিত আরব।

ইসলামপূর্ব আরবের অবস্থা

অর্থনৈতিক অবস্থা

আরবের জনগণ নিজ নিজ ভূখণ্ডের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত ছিল, যার ফলে মরু অঞ্চলের বাসিন্দারা প্রধানত ভ্রাম্যমাণ পশুচারণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভর করেছে। একই সময়ে উর্বর অঞ্চলের বাসিন্দারা নির্ভর করেছে চাষাবাদের ওপর। অবশ্য তারা ব্যবসাপাতিও একেবারে ছেড়ে দেয়নি। পাশাপাশি শিল্পজ্ঞানও ছিল এদের, যার দরুন এরা ছিল মরুবাসিন্দাদের তুলনায় ভাগ্যবান।

জাজিরাতুল আরবের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে পানির উৎসের ভিন্নতার একটি স্বচ্ছ চিত্র সামনে আসে। যার কারণ মূলত দুটি বিষয়।

এক. ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়ার ভিন্নতা

এর প্রভাব পড়েছে বেশ কিছু অঞ্চলে; মরু অঞ্চলগুলোতে, যেখানে ভ্রাম্যমাণ পশু চরানো ছাড়া আর কিছু করার নেই। কিছু অঞ্চল আছে, প্রাকৃতিকভাবে অতটা রুক্ষ নয়, সেখানে ঘাস জন্মায় প্রচুর এবং তুলনামূলকভাবে থাকেও দীর্ঘদিন। এ কারণে মরুবাসী রাখালেরা যেসব অঞ্চলে বেশি চারণভূমি পাওয়া যায়, সেসব অঞ্চলে অনেকটা স্থায়ীভাবে বসবাস করত। যেমন : 'চন্দ্রাকার ভূমি'র (Fertile Crescent) পাশে অবস্থিত অঞ্চলগুলো।

আবার কিছু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মরূদ্যান আছে, যেখানে কিছু ঝরনার দেখা মিলে। এর মাধ্যমে সীমিত পরিসরে চাষাবাদ করা যায়। যেমনটা নজদ ও হিজাজের কিছু মরূদ্যানে দেখা যায়।

আরও কিছু অঞ্চল আছে, যেখানে নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণে মৌসুমি বর্ষণের ফলে উর্বর মাটির উপস্থিতি পাওয়া যায়। যেমনটা জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণ ভাগে দেখা যায়।

দুই. জাজিরাতুল আরবের ভূ-সামুদ্রিক অবস্থান একদিক থেকে নিকটপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের অঞ্চল এবং অপরদিকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের কোলঘেঁষা

অঞ্চলগুলোর মাঝামাঝিতে। এই দুই অঞ্চলের মাঝখানে অবস্থিত জাজিরা হলো ভূ-সামুদ্রিক ব্যবসায়ী কাফেলাগুলোর ট্রানজিট রোড।

এখানে প্রাকৃতিক ও জনগণের অবস্থা থেকে বর্ণনা করা শুরু করা যাক এবার। জাহেলিয়াতের শেষদিকে আমরা জাজিরাতুল আরবের বাসিন্দাদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত দেখতে পাই।

প্রথম শ্রেণিটির স্থায়ী কোনো আবাসন ব্যবস্থা নেই। তারা বারবার নিজেদের আবাসন পরিবর্তন করে এবং পশু চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। দ্বিতীয় শ্রেণিটি হচ্ছে, যাদের স্থায়ী আবাসস্থল আছে। তারা কৃষিকাজ করে। তৃতীয় শ্রেণিটির অবস্থা এর মাঝামাঝি। তারা কখনো আবাসন পরিবর্তন করে, কখনো-বা স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে।

এই শ্রেণি বিভাগের মাধ্যমে তাদের অর্থনীতির কিছু চিত্র সামনে আসে। সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপ :

পশুচারণ : পশুচারণ মানে হলো, স্থির বা চলমান অবস্থায় পশুকে বেঁধে রাখা। জাজিরাতুল আরবের মরুবাসীদের বিরাট একটি অংশের প্রধান অর্থনৈতিক উৎস হলো এই পশুচারণ। মরু অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থাই এমন। প্রধানত তারা উট চরাত। কারণ, উটের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য যেকোনো পশুর তুলনায় মরুভূমির ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য বেশি উপযোগী। আর যেসব অঞ্চলে ঘাস জন্মায় ভালো, সেগুলোতে বেশি চরানো হতো ছাগল; কখনো কখনো ঘোড়া ও অন্য কোনো গবাদি পশু। পশু চরানোর জমিগুলো সাধারণত গোত্রের যৌথ মালিকানাধীন হতো। তবে এর মানে এই নয় যে, ব্যক্তি মালিকানাধীন চারণভূমি ছিল না। তবে এর স্থায়িত্ব নির্ভর করত পানি ও ঘাসের পর্যাপ্ততার ওপর।

লড়াই : মরু-রাখালেরা অর্থনৈতিকভাবে আরেকটি উৎসের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সেটি হলো, মরূদ্যানগুলোর বাগানের উৎপাদিত খেজুর। কিন্তু সেটা পেতে হতো লড়াই করে।

কাফেলা অতিক্রমের মুনাফা : মরুবাসীরা তাদের এলাকা দিয়ে ব্যাবসায়িক কাফেলা অতিক্রম থেকে মুনাফা অর্জন করত। গোত্রের লোকেরা তাদের এলাকার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দীর্ঘ পথে কাফেলাকে পথ দেখাত এবং বিভিন্ন সেবা দিত। এর বিনিময়ে তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক পেত।

মধ্যস্থতা : রাখালেরা শহর এবং মরু এলাকার মাঝে মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করত। বিশেষ করে বিস্তৃত উর্বর সমভূমির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে। যেমন : রাফিদিন উপত্যকায় (Mesopotamia) এবং সিরীয় এলাকায়। এর থেকেও তারা কিছুটা পারিশ্রমিক পেত। তবে এসব মরু-রাখালদের জন্য সীমান্তবর্তী শহরগুলোর সঙ্গে কোনো প্রকার ব্যাবসায়িক লেনদেনের অনুমতি ছিল না।

কৃষি ও চাষাবাদ : আরবের অর্থনীতির আরেকটি প্রধান উৎস হলো কৃষি ও চাষাবাদ। কৃষি মূলত ছিল ইয়েমেন এবং যেসব অঞ্চলে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যেত, সেসব অঞ্চলের অর্থনৈতিক নির্ভরতা। বিভিন্ন প্রকারের ফসল চাষাবাদ হতো। ফল-ফলাদি, গম, সবজি ইত্যাদি। এর মধ্যে বিশেষভাবে তিন প্রকারের চাষ প্রসিদ্ধ। খেজুর, আঙুর ও গম। এ ছাড়া প্রাকৃতিক মসলা ও সুগন্ধি তো আছেই। দক্ষিণাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল এবং হিজাজ ও ইয়ামামার গ্রামগুলোতে প্রচুর চাষাবাদ এবং ফল-ফলাদি হতো। ইয়েমেন প্রসিদ্ধ ছিল লোবান, সুগন্ধি ও বাখুর গাছের কারণে। তায়েফ প্রসিদ্ধ ছিল আঙুর ফলের কারণে। আর খেজুর তো পুরো জাজিরাতুল আরবের প্রধান ফল।

ব্যবসা : আরবদের অর্থনৈতিক জীবনে ব্যবসায় একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। কারণ, ব্যবসায় তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছিল। আরবদের ব্যবসা ছিল কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।

সুগন্ধি ও মসলা উৎপন্ন হতো জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণাঞ্চলে। এগুলো বাইরে রপ্তানিও করা হতো।

জাজিরাতুল আরবের অবস্থান হলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝখানে। যেখান দিয়ে বাণিজ্যিক স্থলপথ গেছে। উপকূল দিয়ে গেছে লোহিত সাগর পার হয়ে সামুদ্রিক পথ। এটি সামগ্রিকভাবে জাজিরাতুল আরবকে এবং বিশেষভাবে হিজাজকে বানিয়েছে সেতুপথ, যা শামের অঞ্চলগুলোর মধ্যে সংযোগ তৈরি করেছে। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলের অঞ্চলগুলোকে ইয়েমেন, হাবশা, সোমালিয়া ও ভারত মহাসাগরের উপকূল ঘেঁষা অঞ্চলগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এই বাণিজ্যপথে অবস্থিত অঞ্চলগুলো বৈষয়িকভাবে বেশ লাভবান হয়েছে। একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মক্কা এবং ইয়েমেনের কিছু শহরের মতো বড় বড় জনপদ। এই অঞ্চলগুলো বানিয়ে নিয়েছে সর্বজনীন পথ; চলাচলের জন্য ব্যবসায়ী ও মুসাফির, সকলেই যা ব্যবহার করেছে। এর মাধ্যমে আরবের অঞ্চলগুলো বৈশ্বিক

বাণিজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথগুলোর মিলনস্থলে পরিণত হয়েছে; যা প্রাচ্যকে মিলিত করেছে পাশ্চাত্যের সাথে।

এই বাণিজ্য ও শিল্প কার্যক্রমকে উপলক্ষ্য করে কয়েকটি মৌসুমি মেলার আয়োজন হতো। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ মেলাগুলো হলো—ওকাজ, জুল মাজান্না ও জুল মাজায। এ ছাড়াও অনাবাদি অঞ্চলে আরও কিছু স্থায়ী বাজার ছিল।

সামাজিক অবস্থা

আরবের সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে মরু-বেদুইন ও শহুরে মানুষের সমন্বয়ে। বেদুইনরা হলো মরুভূমির বাসিন্দা। উটের দুধ ও গোশত খেয়ে তারা জীবনধারণ করে। পানি ও ঘাসের উৎস যেখানে, সেখানে তারা বসবাস করে। আর শহুরে মানুষ বলতে উদ্দেশ্য হলো, নগর ও গ্রামের বাসিন্দা—যারা চাষাবাদ, চাকরি, ব্যবসা, শিল্পকর্ম ইত্যাদি কাজ করে জীবনধারণ করে। এরা স্থায়ী ঘরবাড়ির সাথে পরিচিত। মরুজীবন ও শহুরে জীবন নির্ণয় করার উপায় হলো, জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য ও ধরন দেখা।[৯]

যেহেতু রুক্ষতাজনিত বৈশিষ্ট্য জাজিরাতুল আরবে প্রতুল, তাই স্থায়ী বসবাসকারীর চেয়ে মরুবাসীর সংখ্যাই বেশি। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়মনীতির ক্ষেত্রেও মরুজীবন প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। শহুরে ও মরুচারী—উভয় সমাজ দুটি বিষয়ে একে অপরের সঙ্গে মিল রাখে। এটিই তাদের ঐক্যের কারণ, এটিই আবার শ্রেণিগত বিভক্তির কারণও।[১০]

আরবসমাজ নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিল, যা তাদের সদস্যদের একটি গোত্রের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সহযোগিতা করেছে। গৌত্রিক সম্পর্কের মাটি কামড়ে পড়ে থাকা এবং একধরনের ঐক্যের চিন্তা গোত্রগুলোর মাঝে জাগিয়ে তুলেছে। বিষয়গুলো হলো—

গোত্রপ্রীতি ও প্রতিশোধপ্রবণতা : প্রাচীন আরবের যেসব গোত্রকেন্দ্রিক যুদ্ধের কথা প্রচলিত আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দুটি প্রবণতা দায়ী। সেকালের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হলো—বাসুস যুদ্ধ,[১১] দাহিস ও গুবারা যুদ্ধ,[১২] হারবুল

---

৯. *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, খ. ৪, পৃ. ২৭০।

১০. *আল-আরব ফিল উসুরিল কাদিমাহ*, লুতফি আবদুল ওয়াহহাব, পৃ. ৩৭১।

১১. **বাসুস যুদ্ধ :** এই যুদ্ধটি লেগেছিল বকর ও তাগলাব গোত্রের মধ্যে। ৪০ বছর এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়। এর কারণ ছিল—বকর গোত্রের বাসুস নামের এক নারীর একটি উটকে হত্যা করা হয়েছিল।

ফিজার বা ফিজার যুদ্ধ।[১৩] অপরদিকে স্বজনপ্রীতি তৈরি হতো বংশ অথবা রক্তের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে, যাতে করে জোটবদ্ধতার অন্য কারণগুলো পাওয়া না গেলে এটা হতে পারে জোটবদ্ধতা ও বিচ্ছিন্ন সদস্যদের একতাবদ্ধ করার অন্যতম মাধ্যম।

তো, গোত্র হলো মরুভূমিতে জীবনধারণের প্রধান স্তম্ভ। নিজের জানমাল রক্ষার জন্য বেদুইনরা গোত্রের আশ্রয় নিত। একইভাবে গোত্রের জন্য সম্পদ ও জীবন বিলিয়ে দিত। মরুচারী বেদুইনরা গোত্রকেন্দ্রিক সমাজের বাইরে রাষ্ট্র বলতে কিছু বুঝত না। গোত্রের সঙ্গে সঙ্গে বেদুইনদের মিত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ, যুদ্ধ প্রতিহত করা, জানমাল রক্ষা করা এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের অবাধ্যতায় লাগাম পরানোর ক্ষেত্রে সব গোত্রের শক্তি সমান নয়। যার ফলে প্রতিরক্ষামূলক মিত্রশক্তি গঠিত হতো। একইভাবে আক্রমণের জন্যও মিত্রশক্তি গঠিত হতো। অপরদিকে নগর বাসিন্দারা নিজ নিজ ভূমিতে বসবাস করত। তাদের জীবনব্যবস্থার প্রকৃতিই ছিল এমন, যাতে মিত্র গোত্রের প্রয়োজন খুব একটা হতো না।

যৌথ জীবনব্যবস্থা : অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই আরব সমাজের মরু-জীবনব্যবস্থায় পানি ও ঘাসের ক্ষেত্রে যৌথ অংশগ্রহণ আবশ্যিক ছিল। গোত্রের জন্য এটি ছিল মূল্যবান প্রাণশক্তি। এই যৌথতা গোত্রের সদস্যদের একে অপরের সাথে ঐক্যবদ্ধ ও যূথবদ্ধ থাকতে উদ্‌বুদ্ধ করত। আরবসমাজ অর্থনৈতিক জীবনের এমন কিছু দিক আবিষ্কার করতে পেরেছিল, যা তাদের পারস্পরিক ঐক্য বজায় রাখতে উদ্‌বুদ্ধ করে। এর একটি ছিল—ন্যূনতম একটি পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে কোনো বিষয়ের যৌথ মালিকানা থাকা।

এ ছাড়া জাহেলিয়াতের শেষদিকে কিছু রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যা তাদের সামাজিক পরিবেশকে একতাবদ্ধ করার কথা ভাবতে

---

[১২]. **দাহিস ও গুবারা যুদ্ধ :** দাহিস ও গুবারা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আবস ও জুবইয়ান গোত্রের মধ্যে। স্থায়ী হয়েছিল ৪০ বছর। এই যুদ্ধের কারণ ছিল—দাহিস ও গুবারার মধ্যকার প্রসিদ্ধ রেস। দাহিস হলো কায়েস বিন জুহাইর নামক এক ব্যক্তির ঘোড়া, গুবারা হলো হুজাইফা বিন বদর নামক এক ব্যক্তির ঘোড়া।

[১৩]. **হারবুল ফিজার বা ফিজার যুদ্ধ :** এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল নিষিদ্ধ মাসে। এ কারণে এই যুদ্ধকে ফিজার বা পাপাচার বলা হয়। কয়েকটি আরব গোত্রের মধ্যে লেগেছিল এই যুদ্ধ। কুরাইশও এতে অংশগ্রহণ করেছিল। হারবুল ফিজার মোট চারবার হয়েছিল। সর্বশেষটি হলো প্রসিদ্ধ হারবুল ফিজার।

সহায়তা করেছিল। এখানে আমরা দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করব; ইসলাম আগমনের ঠিক কিছুদিন পূর্বে জাজিরাতুল আরব যার সাক্ষী হয়েছিল।

প্রথম ঘটনা : মক্কায় আবরাহার ব্যর্থ হামলার পর ইয়েমেনে তৈরি হয় রাজনৈতিক সংঘাত, যা পরে এক ঐতিহাসিক বিষয়ে পরিণত হয়। এই সংঘাত হয়েছিল বিভিন্ন দেশের সমন্বয়ে গঠিত শক্তি এবং বহিঃশক্তির মধ্যে। হাবশিরা ইয়েমেনের অঞ্চলগুলোকে দখল করে নিয়েছিল। অপরদিকে পারস্যও তা দখল করতে লালায়িত ছিল। এই সংঘাত সম্মিলিত আরব জাতীয়তার একটা চেতনা তৈরি করতে সক্ষম হয়। যেমন ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, হাবশার বিরুদ্ধে জয়ের পর আবদুল মুত্তালিব সাইফ ইবনে যি-ইয়াযান আল-হিমইয়ারিকে অভিনন্দন জানাতে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন। আবুস সালত ইবনে রবিআ সাকাফির মতো, ভিন্ন বর্ণনায় উমাইয়া ইবনে সালত এবং আদি ইবনে যায়েদের মতো আরব কবিরা এই বিজয় নিয়ে কাব্যগাথা রচনা করেছিলেন।[১৪]

দ্বিতীয় ঘটনা : প্রসিদ্ধ যি-কার যুদ্ধ (৬০৯ খ্রি.)। জাজিরাতুল আরবে বসবাসকারী গোত্রগুলোর মধ্যে নতুন আঙ্গিকে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন—আরবদের এই সম্মিলিত চেতনার পরিপক্ব বহিঃপ্রকাশ ছিল এই যুদ্ধটি। বিশেষ করে পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের গোত্রগুলোর এই সম্পর্ক গড়ে তোলা আরও বেশি প্রয়োজন। এই দিনটিকেই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিত্রিত করেছিলেন এভাবে—'এটাই হলো ১ম দিন, যেদিন আরবরা অনারবদের থেকে আলাদা দলে বিভক্ত হয়েছিল।[১৫] আরব ও অনারব সকলে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি দাঁড়াবার ব্যাপারে নবীজির এই উক্তি ঘটনাটির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে তুলে ধরে। গোত্রে গোত্রে অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের পলিমাটির ওপর ভিত্তি করে যে পরিবর্তনের ধারা দেখা গেছে—সেই পরিবর্তিত প্রকৃতি থেকে ঘটনাটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে।[১৬]

---

[১৪]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনে হিশাম, আবুল কাসেম আবদুর রহমান খাছআমি সুহাইলি রচিত *আর-রাওজুল উনুফ* হতে উদ্ধৃত, খ. ১, পৃ. ৮৩-৮৫, ১৬১-১৬২।

[১৫]. *তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক* (তারিখে তাবারি), খ. ২, পৃ. ১৯৩।

[১৬]. *আন-নাযাআতুল মাদ্দিয়্যাহ ফিল-ফালসাফাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যাহ*, হুসাইন মুরুওয়াহ, খ. ১, পৃ. ৩১৪।

বিভাজনের কারণ আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, মরুবাসী ও শহুরে—আরবের উভয় সমাজে সামাজিক ঐক্যের ভেতর দিয়েও বিভাজনের অনেক কারণ বিদ্যমান ছিল। গোত্রকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় স্বজনপ্রীতির ডাকে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কোনো সদস্যের আগ্রহে ভাটা দেখা দেয়। গোত্রীয় রীতিনীতি কোনো কোনো ক্ষুদ্র দলের মধ্যে বিভাজনের দেয়াল তৈরি করে রাখে। তো, যেসব গোলামকে আজাদ করে দেওয়া হতো, যারা গোত্রের বংশধারার অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না, তারা পরিণত হতো মাওয়ালি তথা আজাদকৃত গোলাম নামে এক ভিন্ন শ্রেণিতে কিংবা পরিণত হতো গোত্রের অনুসারীতে। একইভাবে কোনো আগন্তুক কবিলায় আশ্রয় গ্রহণ করলে এক বা একাধিক কারণে সেও মূল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না। এভাবেই একটি কবিলা ও গোত্রের ভেতর দল ও শ্রেণি গড়ে উঠত। যারা পরিপূর্ণ নিজেদের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে পারত না। এগুলোই হতো বিভাজনের কারণ।[১৭]

এগুলো ছাড়াও সাধারণভাবে একটি সমাজ কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত থাকত, যার শীর্ষে থাকত কবিলা বা গোত্রের প্রধান ব্যক্তি। গোত্র কখনো প্রধানের সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারত না। কবিলার কয়েকজন লোক নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ গোত্রপ্রধানকে সহযোগিতা করত। এর অধিকাংশ সদস্য হতো প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তিগণ।

এর ফলে, গোত্রের ভেতরে শ্রেণিবিভাজন গড়ে ওঠে। কারণ, গোত্রের ভেতর যাদের মনে করা হতো সমস্তরের, তাদের সঙ্গে গোত্রের আচরণ নিয়ে তারা সন্তুষ্ট ছিল না। কেউ কেউ সমতার অভাব অনুভব করত।

আরবসমাজ ইয়েমেনে এই সমতার অভাব দেখতে পায়। সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে তারা বৈষম্য করে। সেখানে কিছু সম্পদশালী ব্যক্তি এবং শাসকশ্রেণির বংশধররা মিলে একটি স্বতন্ত্র দল তৈরি করে ফেলে। তারা রাষ্ট্রীয় সবগুলো পদ কুক্ষিগত করে রাখে। একইভাবে সেখানে কৃষক, পেশাজীবী ও সুগন্ধি সংগ্রহকারী শ্রমিক ছিল। সমাজের এই শ্রেণিবিভাজন যুগের পর যুগ পরম্পরা ধরে চলে আসছে। এর কোনো পরিবর্তন হয়নি। কোনো সদস্য নিজের পেশা পরিবর্তন করে অন্য শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে—এই সক্ষমতাও ছিল না। সামাজিক জীবনের ক্ষতিকর কিছু বিষয় জাহেলি সমাজে মহামারির মতো

---

১৭. *আল-আরব ফিল উসুরিল কাদিমাহ*, পৃ. ৩৮৪-৩৮৭।

ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন : মদ, জুয়া ও অবাধে নারীভোগ। নারীরা ছিল দুধরনের—দাসী ও স্বাধীন। স্বাধীন নারীর চেয়ে দাসীর সংখ্যা ছিল বেশি। তাদের আবাস ছিল নিম্নমানের ঘরে। কোনো আরব কোনো দাসীকে সন্তানের মা বানালে, সেই সন্তানকে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দিত না। অবশ্য কেউ কেউ সাহসিকতা দেখিয়ে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দিত। নারীরা সবসময় অনাচার ও অত্যাচারের শিকার হতো। একবার তালাকপ্রাপ্তা হলে দ্বিতীয়বার পছন্দের ব্যক্তিকে বিয়ে করতে পারত না। বরং জড়বস্তুর মতো উত্তরাধিকার সম্পদ বলে বিবেচিত হতো। অপরদিকে স্বাধীন নারীরা, বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত ঘরের নারীরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। কোনো কোনো বিষয়ে তারা পরামর্শকের মর্যাদা পেত। অনেক কাজে পুরুষের সাথে যৌথভাবে অংশগ্রহণও করত।

বৈবাহিক সম্পর্ক কিছুটা উন্নত ছিল। বিবাহের নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। মেয়ের পরিবারের সন্তুষ্টি এবং মেয়ের সঙ্গে পরামর্শের পর তার সম্মতি পাওয়া গেলে স্বামী মিলিত হতো স্ত্রীর সাথে। এটাই ছিল বৈধ বিবাহ। পরিবার ও মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের প্রবাদতুল্য আত্মমর্যাদাবোধ থাকা সত্ত্বেও বৈধ বিবাহ বাদে আরবে আরও অনেক ধরনের বিবাহের প্রচলন ছিল। যা তাদের অধিকাংশ মানুষ ভালো চোখে দেখত না।[১৮]

অপদস্থতা, লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের ভয়ে কন্যাসন্তানকে অশুভ মনে করা এবং জ্যান্ত পুঁতে ফেলা—এসব রীতি জাহেলি সমাজে কোনো কোনো গোত্রের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলন পেয়েছিল। ইসলামপূর্ব আরবদের মধ্যে দাসপ্রথা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলাম এসে এমন এক ব্যবস্থা তৈরি করে, যা সময়ের সাথে সাথে দাসপ্রথাকে বাতিল করে দেয়। মুসলিমদের মধ্যে দাস বানানো হারাম করেছে, দাস মুক্ত করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে। এভাবে ইসলাম দাস তৈরির পথ করে দিয়েছে সীমিত এবং দাসমুক্তির পথ করে দিয়েছে উন্মুক্ত।

---

১৮. আরবের প্রচলিত বিবাহের একটি হলো 'নিকাহুল ইস্তিবযা'। অর্থাৎ দুজন বিবাহিত ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে স্ত্রী বিনিময় করা। আরেক প্রকার বিবাহ ছিল, অনূর্ধ্ব ১০ জন পুরুষ মিলে একজন নারীর সাথে মিলিত হতো। সন্তান প্রসবের পর তাদের একজনকে পিতা হিসেবে নির্ধারণ করা হতো। এ জাতীয় আরও কিছু বিবাহ প্রচলিত ছিল—নিকাহুল খাদান, মুতআ, বদল, শিগার ইত্যাদি। বিস্তারিত জানতে দেখুন, *বুলুগুল আরব ফি মারিফাতি আহওয়ালিল আরব*, মুহাম্মাদ শুকরি আলুসি, খ. ২, পৃ. ৩-৫।

ধর্মীয় অবস্থা

ক. শিরকের প্রকাশ

ইসলামের পূর্বে আরব জাতি এক ও অভিন্ন ধর্মের অনুসারী ছিল। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আনীত একনিষ্ঠ তাওহিদের ধর্ম মানত তারা, যা পরে ইসলামের মধ্যে মূর্ত হয়েছে। একপর্যায়ে আরবরা গোমরাহ হয়ে যায়। ফলে সামাজিক পরিবেশের ক্রমপরিবর্তন এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশার কারণে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শিরক তথা অংশীদারত্বের রেওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে।

তাদের কেউ ঈমান রাখত আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর তাওহিদের প্রতি। কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখলেও দেবতার পূজা করত। কারণ, তারা মনে করত, দেবতার পূজা করলে তারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য এনে দেবে। মনে করত, উপকার-অপকারের ক্ষমতাও দেবতার অধিকারে রয়েছে। কেউ কেউ আবার ইহুদি, খ্রিষ্টান বা অগ্নি উপাসনার ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আরেক দল কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করত না। আরেক দল বিশ্বাস করত—উপাস্যরা এই দুনিয়াতে মানুষের বিচার করে ফেলে; মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশ, পুনরুত্থান—কোনো কিছু নেই।

কুরআন মাজিদে জাহেলিয়াতের শিরকের প্রকারগুলোর দিকে বিভিন্ন আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেগুলো হলো :

পাথর, কাঠ, খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরি নিষ্প্রাণ প্রতিমার পূজা করা। এ ছাড়া নির্দিষ্ট কিছু গাছকে তারা আল্লাহর পরিবর্তে সহায়রূপে গ্রহণ করেছিল। গাছ যেন তাদের আল্লাহ তাআলার নৈকট্য পাইয়ে দেয়—এই উদ্দেশ্যে।[১৯]
প্রকৃতির পূজা। যেমন, নক্ষত্রপূজা। এটা আরবের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। চন্দ্র, সূর্য ও শুক্র—এই তিন নক্ষত্রকে বলা হতো 'সালুস' বা 'প্রভু নক্ষত্রত্রয়ী'।

আরবের কেউ কেউ বিশ্বাস করত—জিনরা আল্লাহ তাআলার অংশীদার।[২০] একইভাবে ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার শরিক ও তাঁর কন্যা।[২১]

---

[১৯]. দেখুন, সুরা যুমার, আয়াত ৩।

[২০]. দেখুন, সুরা আনআম : আয়াত ১০০।

[২১]. দেখুন, সুরা সাবা : আয়াত ৪০।

অন্য আয়াতে আছে, আল্লাহ তাআলা ভিন্ন অন্য এক বা একাধিক উপাস্য গ্রহণ করাই হলো শিরক।[২২]

আরও বিভিন্ন পূজার প্রচলন ছিল। ধর্মবিদদের আধুনিক নামকরণ অনুযায়ী যাকে টটেমিজম (Totemism) বলা যেতে পারে। এ হলো মনমগজে গেড়ে বসা আদিম কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস। এর ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে দল বা গোত্রের ওপর। গোত্র বা দলের সদস্যরা পবিত্র একটি ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হবে; টটেমিজমের বন্ধন—যা হবে দলটির প্রতীক। আরবরা নিজেদের নাম রাখত বিভিন্ন প্রাণীর নামে। যেমন, বনু আসাদ (সিংহ)। জলীয় প্রাণীর নামেও নাম রাখত। যেমন, কুরাইশ (হাঙর)। বিভিন্ন উদ্ভিদের নামে তারা নাম রাখত। যেমন, হানজালা (আরবীয় একটি ফল, তরমুজের মতো দেখতে। (ইংরেজিতে Colocynth)। পাখির নামে নাম রাখত। যেমন, নাসর (ইগল বা বাজপাখি)। এই নামগুলো যদিও শুভ ধারণার জন্য রাখা হয়েছে; তবে এর দ্বারা আরবদের প্রাণী ও উদ্ভিদকে পবিত্র জ্ঞান করার মনোভাবের ইঙ্গিত বহন করে।[২৩]

দেব-দেবীর প্রতীক বা মূর্তিপূজার মূল উৎপত্তির ক্ষেত্রে আরও দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। **এক.** ধারণা করা হয়, মূর্তিপূজার উদ্ভব হয়েছে আমর ইবনে লুহাই আল খুযাইর থেকে। **দুই.** বলা হয়, জাহেলি জীবনের ক্রমপরিবর্তনের ফলে আঞ্চলিকভাবে এটির প্রচলন শুরু হয়।[২৪]

খ. তাওহিদমুখিতা

জাহেলি যুগের শেষদিকের কথা। ইসলাম তখন সমাগত প্রায়। এ সময় আরবসমাজে ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের বোঝাপড়া-সহ তাওহিদমুখিতা প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় হিময়ারি সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায়[২৫] তখন ইহুদিধর্ম বেশ প্রচার পায়; বিশেষ করে ইয়েমেনে। ওয়াদিল-কুরা, খায়বর, তাইমা ও ইয়াসরিবে তা প্রসার লাভ করে। একই সময়ে খ্রিষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে বিভিন্ন গোত্রে। উত্তরে তাগলিব, গাসসান ও কুজাআতে; দক্ষিণে ইয়েমেনে। খ্রিষ্টধর্ম আবার

---

২২. দেখুন, সুরা আম্বিয়া : আয়াত ২৪।

২৩. কিতাবুল ইশতিকাক : ইবনু দুরাইর, পৃ. ৩।

২৪. এই দুটি বর্ণনা সম্পর্কে জানতে দেখুন, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ১, পৃ. ৯৯-১০০।

২৫. *তারিখুল ইসলাম আসসিয়াসি ওয়াদদিনি ওয়াসসাকাফি ওয়াল ইজতিমায়ি*, ইবরাহিম হাসান, খ. ১, পৃ. ৭৩,

কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে জাজিরাতুল আরবে প্রবেশ করেছে দুটি—নাসতুরি ও ইয়াকুবি।

এসব উপাস্য ও বহুত্ববাদী ধর্ম থাকা সত্ত্বেও এর ভেতর দিয়ে বিশুদ্ধ একত্ববাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ কথা ধ্রুব সত্য যে, জাজিরাতুল আরবে ইহুদি ও খ্রিষ্ট ধর্মদুটির প্রচার তাদের ধর্মীয় চেতনা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল; বিশেষ করে আল্লাহর অস্তিত্ব, সৃষ্টি, উপাসনা, কিয়ামত ও পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ে। দীর্ঘ সময় আরবরা পৌত্তলিক বোঝাপড়া এবং ইহুদি-খ্রিষ্ট চিন্তা-ভাবনার মাঝে বসবাস করেছে। এর ফলে জাহেলি সমাজে উপর্যুক্ত সমস্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র এক অবস্থান নিয়ে একদল মানুষের আবির্ভাব ঘটে। তাদের অবস্থান না পৌত্তলিক আর না ইহুদি বা ঈসায়ি; বরং চিন্তার উদ্রেককারী স্বতন্ত্র এক অবস্থান।

এই নতুন ধর্মীয় চেতনার নেতৃত্ব দিয়েছে একদল আলোকিত মানুষ। তারা নিজেদের ধর্মীয় দুরবস্থার ব্যাপারে সচেতন হয়েছে। তারপর এর চেয়ে কিছুটা উন্নত আকিদায় উন্নীত হবার চেষ্টা করেছে। এগুলো তারা উদ্ভাবন করেছে ইহুদি ও ঈসায়ি ধর্মপণ্ডিতদের সংস্পর্শে থেকে। এই লোকগুলো 'আহনাফ' বা একনিষ্ঠ একত্ববাদের অনুসারী হিসেবে পরিচিত ছিল। তাদের মধ্যে আমরা কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতে পারি। কুস[২৬] ইবনে সায়িদা আল-ইয়াদি, ওয়ারাকা[২৭] ইবনে নাওফাল, উমাইয়া[২৮] ইবনু আবিস সালত এবং উসমান[২৯] ইবনুল হুওয়াইরিস প্রমুখ।[৩০]

---

২৬. কুস ইবনে সায়িদা আল ইয়াদি। জাহিলি যুগের বিশিষ্ট আরব কবি ও নিজ সমকালের বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। কুস ইবনে সায়িদা ভালো বক্তাও ছিলেন। উকাজ মেলায় তিনি নবীজির সাক্ষাৎ লাভ করেন। তবে তিনি ইসলামের যুগ পাননি। কেউ কেউ তাকে সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত করলেও ইবনুস সাকান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন—কুস ইবনে সায়িদা নবুওয়ত আসার পূর্বেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। [*আল-ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা*, ৫/৪১২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ] নবীজি থেকে তার নামে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। এ প্রসঙ্গে ইবনুল আসির জাযারি লেখেন, "কুস ইবনে সায়িদা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেন, তখনো তিনি নবুওয়ত পাননি"। এটুকু বলার পর সাথে সংশয় জুড়ে দিয়েছেন—"যদি এই বর্ণনা প্রমাণিত হয়ে থাকে আর কি।" [*উসদুল গাবাহ*, ৪/৩৮৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ]।—নিরীক্ষক

২৭. ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল আল আসাদি। উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রাযি.-এর চাচাতো ভাই। পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থসমূহের আলেম ছিলেন তিনি। প্রথম যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহি নাজিল হয়, ভীতসন্ত্রস্ত নবীজিকে তিনি সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তিনি যে সত্য নবী, পরবর্তী সময়ে তাঁকে মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে—এই সবকিছু ওয়ারাকা

একনিষ্ঠ তাওহিদবাদী—এঁরা অন্যদের তুলনায় চিন্তা ও চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও উন্নত সভ্যতা পালনে স্বতন্ত্র ছিলেন। তবে তারা প্রত্যেকে চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এক ছিলেন না। একইভাবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক কোনো সম্পর্ক ও বন্ধনও ছিল না। অর্থাৎ তাদের মধ্যে ঐক্যের যোগসূত্র একটি ব্যাপক বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল, যা তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছিল। সেটি হলো—মূর্তিপূজা, বহু উপাস্য ত্যাগ ও এক উপাস্যের অস্তিত্বের প্রতি ঈমান। এ ছাড়া তাদের চারিত্রিক আরেকটি বিষয় প্রসিদ্ধ ছিল, সেটি হলো—তারা লোক ও লোকালয় এড়িয়ে চলত। একনিষ্ঠ দ্বীনে ইবরাহিমের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করে বেড়াত। তাদের কেউ কেউ আবার ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় কিতাব পড়ত। তারা জাহেলিয়াতের নিকৃষ্ট আচার পরিত্যাগ করার দাওয়াত দিত। যেমন জ্যান্ত কন্যাসন্তান কবর দেওয়া, মদ পান করা ও অবাধে নারীভোগ করা।

ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত পরিবর্তনগুলো ঘটার পাশাপাশি আরও কিছু বিষয় ঘটে। সেগুলো হলো : কয়েকটি গোত্র মিলে একটি মূর্তির পূজা

নবীজিকে জানিয়েছিলেন। ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল জাহিলি যুগে ছিলেন খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী। তবে তিনি শিরক থেকে মুক্ত হয়ে শেষ নবীর অপেক্ষায় ছিলেন।
নবুওয়ত আসার পরপর নবীজিকে দেখেছেন বিধায় ইমাম তাবারি, বাগাভি ও ইবনুস সাকান তাকে সাহাবি গণ্য করেছেন। তবে, বিশুদ্ধ মত হলো—তিনি সাহাবি ছিলেন না। নবুওয়তের দায়িত্ব পালন শুরুর দিকেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। হাফেজ ইবনে হাজারও তাই লিখেছেন—"তাকে সাহাবি গণ্য করায় 'আপত্তি' আছে।" [*আল-ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা*, ৬/৪৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ]—নিরীক্ষক

[২৮]. উমাইয়া ইবনে আবিস সালত ছিল জাহেলি আরব কবি। উমাইয়া ছিল পড়াশোনা জানা মানুষ। পূর্ববর্তী কিতাবাদি পড়ার ফলে তার মধ্যে পৌত্তলিকতার প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়। দ্বীনে হানিফ—অর্থাৎ, ইবরাহিম ও ইসমাইল আলাইহিমাস সালামের ধর্ম অনুসরণের চেষ্টা করত। এই চেষ্টার অংশ হিসেবে মদ হারাম করে এবং মূর্তিপূজা ত্যাগ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্‌বুদ্ধ হলেও কার্যত ইসলাম গ্রহণ করেনি। হিজরি সপ্তম বর্ষে তার ইন্তেকাল হয়। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. লেখেন, সকল জীবনীকার এই বিষয়ে একমত যে, উমাইয়া ইবনে আবিস সালত কাফের অবস্থায় মারা গেছে। [*আল-ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা*, ১/৩৮৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ]—নিরীক্ষক

[২৯] পুরো নাম—উসমান ইবনুল হুওয়াইরিস ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উযযা। উসমান ইবনুল হুওয়াইরিস ছিল জাহেলি আরব কবি। ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল ও অন্যদের সাথে মিলে উসমানও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে। এরপর রোম সাম্রাজ্যে চলে গিয়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। রোমান সম্রাটের সাথে তার একটি মুখরোচক ঘটনাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। অপর তিনজনের মতো উসমানও ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি। বিবরণ থেকে অনুমেয় যে, নবুওয়ত লাভের পূর্বে কিংবা নবুয়তের শুরু যুগেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়।—নিরীক্ষক

[৩০]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ১, পৃ. ২৫৩-২৬৩।

করা। এটা আমরা দেখতে পাই খাসআম, বাজিলা, দাউস গোত্রে। তাবালায় অবস্থিত সকল আরব মিলে একটি মূর্তির পূজা করত, যার নাম ছিল জুল-খালাসাহ।[৩১]

হাজিদের খাদ্যব্যবস্থাপনা, জমজমের পানি পান করানো, বাইতুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ-সহ হজের আনুষ্ঠানিক সমস্ত দায়িত্ব কুরাইশদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে সেগুলো ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর হজের সময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য কার্যকরী একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল—হজের মৌসুমের সকল কাজ শান্তিপূর্ণভাবে পালনের ব্যাপারে বিভিন্ন গোত্রের আবশ্যকীয় সহযোগিতা এবং হারাম মাসে যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থাকা।

এই গোত্রগুলো এমন এক ব্যবস্থাপনার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, বাজার ও হজ-ব্যবস্থাপনা ছিল যাদের রাজতোরণ। তা এমন এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, যা একত্ববাদের দিকে তাদের ধাবিত করে।

শিক্ষাদীক্ষা ও সাহিত্যচর্চার হালহাকিকত

অনেকের মধ্যে এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, ইসলামপূর্ব আরবরা ছিল মূর্খ। তারা লিখতে পড়তে জানত না। তাদের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির চর্চা ছিল খুব কম, ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, 'জাহল' তথা জ্ঞানের বিপরীতার্থক মূর্খতা শব্দ দিয়ে জাহেলিয়াতের ব্যাখ্যা হলো সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা। জাহেলিয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নির্বুদ্ধিতা, আহম্মকি, রূঢ়তা ও প্রতারণা ইত্যাদি। এগুলো ছিল জাহেলি সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এ কথা স্পষ্ট যে, ওই যুগে শিক্ষাদীক্ষা আরবের দেশগুলোতে প্রসার লাভ করেনি; বিশেষ করে হিজাজ অঞ্চলে তা আদৌ প্রসার লাভ করেনি। কেননা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে আরবদের আদৌ পরিচয় ছিল না, তবে পুরাতত্ত্ব, কোষ্ঠীধারা, জ্যোতিষশাস্ত্র—ইত্যাদি বিষয়ে তারা ছিল সবিশেষ পারদর্শী। অঞ্চল ও প্রয়োজনভেদে লেখাপড়ার চর্চার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন; যার ফলে লেখাপড়ার প্রসার শহুরে মানুষদের মধ্যে ঘটলেও মরুবাসী আরবদের মধ্যে তা প্রসার পায়নি। মরু আরবরা বিশেষ প্রয়োজনের খাতিরেই কেবল পড়তে লিখতে শিখত।

---

৩১. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ১, পৃ. ১০৭।
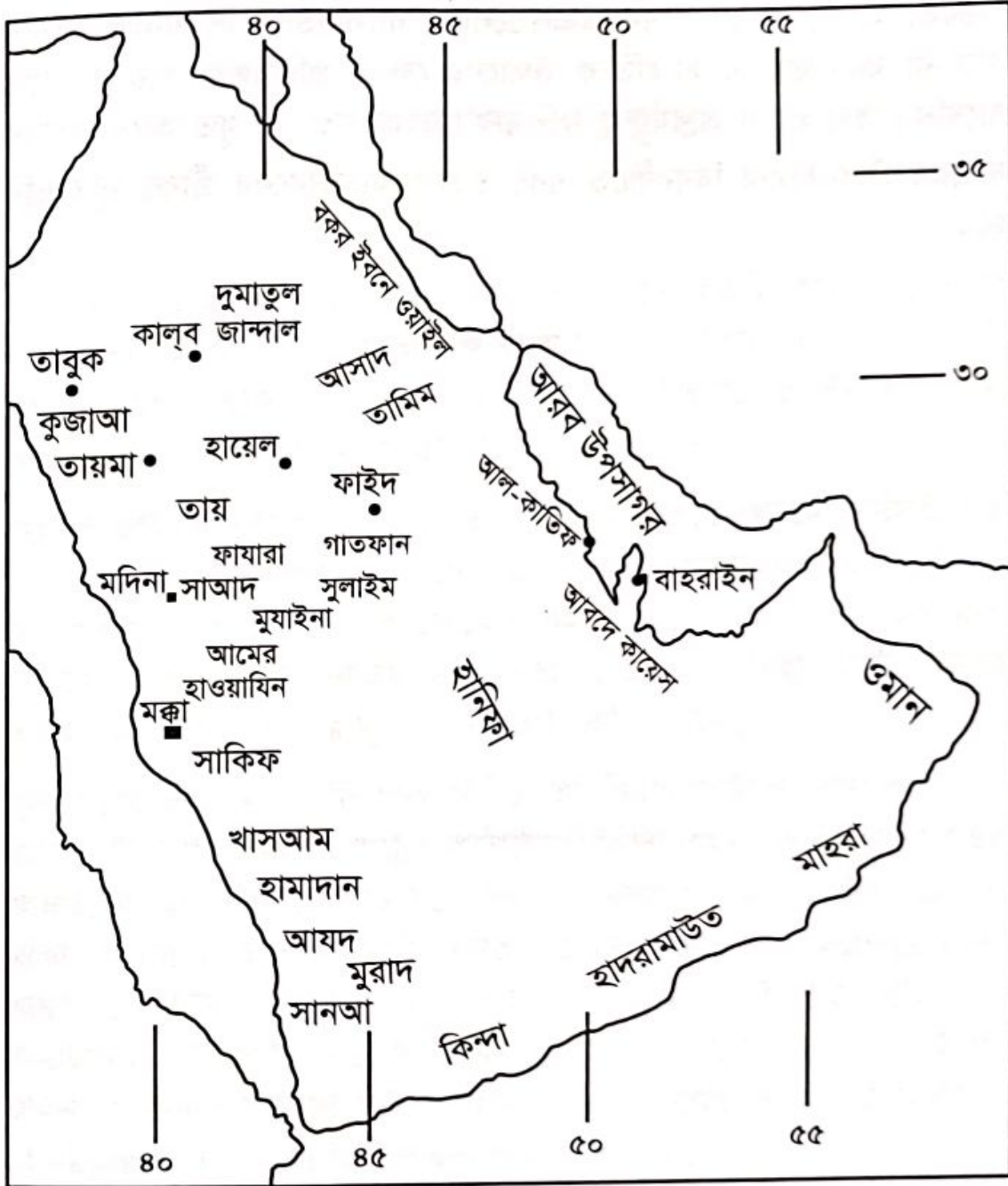
আরব উপদ্বীপে গোত্রগুলোর অবস্থান

আরবদের সাহিত্যচর্চার উৎকর্ষের ক্ষেত্রে মক্কা ও বিভিন্ন মৌসুমি বাণিজ্য মেলায় কবি-সাহিত্যিকদের সম্মেলনের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে আমরা যখন জানতে পারি যে, তারা বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করত— পার্শ্ববর্তী রোম ও পারস্যের জাতিবর্গের সাথে মিশত। তারা রোম-পারস্য সভ্যতার জৌলুস দেখে প্রভাবিত হতো আর তা প্রতিফলিত হতো তাদের কবিতা, বক্তৃতা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীগুলোতে।

বাস্তবতা হলো, বৃহত্তর আরব অঞ্চলগুলোতে ব্যাপকভাবে শিক্ষাদীক্ষা প্রসার লাভ না করা তাদের সাহিত্যিক উত্থানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তার প্রমাণ আরবদের কবিতার চমৎকারিতা, যা ধৃত আছে তাদের সাধারণ জীবনযাত্রার বিবরণীতে এবং তাদের মরুজীবনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে।

* * *

রাজনৈতিক পরিস্থিতি

প্রাককথন

আরবরা তাদের জন্য যে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছিল, তাতে পরিচালনা কিংবা বিচারব্যবস্থার সুশৃঙ্খল কোনো কাঠামো ছিল না, যেমনটা আমরা এখন বুঝি। তবে আরবসমাজ মোটাদাগে রাজনৈতিক কিছু পরিকাঠামো বুঝত। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো হলো :

গোত্রীয় কাঠামো : যেখানে রাজনৈতিক কাঠামো বলতে গোত্রই সর্বেসর্বা এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। হোক তা গোত্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কিংবা বহিঃশক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে। এই কাঠামোটি প্রচলিত ছিল মরু-আরবে। এই কাঠামো-বিষয়ে মক্কা এবং তার অধিবাসীরা একটি বিশেষ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে; যার মূল ভিত্তি হলো, বাণিজ্যব্যবস্থা।

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় কাঠামো : এটি হলো বিভিন্ন বাণিজ্যিক ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ছোট ছোট রাজ্য বা রাষ্ট্রের কাঠামো। অথবা এমন কেন্দ্রে তৈরি হওয়া অঞ্চল, যা যুদ্ধপ্রবণ বড় দুটি সাম্রাজ্যের (পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য) মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। যেমন, আম্বাত (Nabataeans) সাম্রাজ্য, তাদমুর (Palmyrene) সাম্রাজ্য। অথবা উপর্যুক্ত দুটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী সাম্রাজ্য—যেখানে উভয় সাম্রাজ্যের শাসন চলে। যেমন, গাসসানি সাম্রাজ্য বাইজেন্টাইন শক্তির অনুগত ছিল আর মানাযিরা (Lakhmids) সাম্রাজ্য ছিল পারস্য শক্তির অনুগত।

স্বাধীন রাষ্ট্রকাঠামো : জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণ অংশে বেশ কিছু স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। এর বৈশিষ্ট্য হলো, সেগুলো দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছিল। কারণ, তা নির্ভরশীল ছিল বিশাল উর্বর ভূমির ওপর এবং সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে মৌসুমি বৃষ্টি হতো।

* * *

হিজাজের শাসনব্যবস্থা

মক্কা

অঞ্চলভেদে জাজিরাতুল আরবের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও শাসনব্যবস্থায় অনেক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। জাজিরার পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলটি হলো হিজাজ। বড় বড় শহরের পত্তন হয় সেখানে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহরটি হলো মক্কা। যার অবস্থান হিজাজের প্রাণকেন্দ্রে। বৈশ্বিক বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র বা কেন্দ্র। জাহেলি পৌত্তলিক ধর্মবিশ্বাসীদের সবচেয়ে বড় তীর্থস্থান। মক্কার অবস্থান ইয়েমেন ও শামের বাণিজ্যিক পথের ঠিক মাঝখানে, সারাত (Sarawat) পর্বতমালার এক উপত্যকায়। চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে রুক্ষ পাহাড়ের সারি। কুরআন মাজিদে শহরটির অবস্থানের কথা এভাবে উল্লেখ হয়েছে—بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ—'একটি ফসলহীন উপত্যকায়।'[৩২]

সময়ের হিসেব ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মক্কার ইতিহাসকে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ হলো, কুসাই ইবনে কিলাবের যুগের পূর্বে গত হওয়া সময়। দ্বিতীয় ভাগ হলো, তার যুগের পরের সময়।

ইতিহাস-নির্দেশক সকল উৎস ও উপাদান এ কথার ইঙ্গিত বহন করে, কালের বিচারে মক্কা যে একটি প্রাচীন শহর সে কথা নিশ্চিত। কাবার অবস্থানের কারণে তখন থেকেই মক্কা একটি পবিত্র ভূমির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে বাণিজ্যিক মোহনা এবং জমজম কূপের কারণে একে একে এর জৌলুস আরও বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

স্পষ্টভাবে মক্কার ইতিহাস আমরা জানতে পারি খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শুরুর দিকে, কুসাইয়ের সময় থেকে। কুসাই কুরাইশদের একটি দলে পরিণত করেছিলেন। কুসাই ইয়েমেনের খুযাআ গোত্রের তরফ থেকে দায়িত্ব গ্রহণের পর শহুরে সকল ব্যবস্থাপনা সুশৃঙ্খলভাবে আঞ্জাম দিয়েছিল।[৩৩]

---

৩২. সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৭।

৩৩. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ, খ. ১, পৃ. ৭০-৭১।

একটা কথা এখানে স্পষ্ট যে, মক্কার জীবনমঞ্চে এক নতুন দৃশ্যের অবতারণা শুরু হয়েছিল। নেতৃত্ব ও ক্ষমতা অর্জনের বিভিন্ন নীতি ও মর্যাদা নির্ধারিত হতে শুরু করেছিল—যার ভিত্তি হলো ব্যবসা থেকে অর্জিত সম্পদের প্রাচুর্য ও মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব। এর ভিত্তিতে মক্কায় কুরাইশদের হাতে নেতৃত্বের বদল হয়েছিল। গোত্রপ্রীতির ভিত্তিতে নেতৃত্বের বদল হয়নি; বরং নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছে সর্বসম্মত এক নীতির ওপর ভিত্তি করে—সম্পদ ও সম্মানের ভিত্তিতে। এটি ছিল তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির ফসল।

কুসাইয়ের শাসনব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে মক্কার সমাজব্যবস্থাকে বংশীয়ভাবে এক হলেও দুটি ভাগে ভাগ করা যায় :

কুরাইশুল বিতাহ : কিছু লোককে কুসাই মক্কার সমতল বিস্তীর্ণ ভূমিতে আবাস গড়ে দিয়েছিল। এরপর তারা মক্কার দুদিকের পাহাড়ের বিভিন্ন গিরিপথে ছড়িয়ে পড়ে। তারা হলো—হাশিম, উমাইয়া, মাখযুম, তাইম, আদি, জামাহ, সাহম, নাওফেল ও যোহরা। এই গোত্রগুলো হলো কুরাইশদের প্রাণ এবং সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত। মক্কার সমস্ত গুরুদায়িত্ব তাদের হাতে ন্যস্ত হয়। শহুরে মানুষের মতো তারা ঘরবাড়ি বানিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। বাণিজ্য ও কাবার খেদমতে মনোযোগী হয়। রিজিক-রাজ্য-সহ সবকিছুর মালিক হয়। সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে তারা আয়েশি জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়।

কুরাইশুজ জাওয়াহির : কিছু লোককে কুসাই মক্কার বাইরে বসবাসের জায়গা করে দিয়েছিল। তাদের সাথে ছিল মক্কার সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র শ্রেণি, মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ জনগণ, দাস ও আজাদকৃত দাসেরা। তারা সেখানে বেদুইনদের মতোই জীবনযাপন করে। ধনসম্পদ ও স্থায়ী বসবাসের ক্ষেত্রে তারা কুরাইশুল বিতাহের সমপর্যায়ে পৌছুতে পারেনি।[৩৪]

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক নিয়মে কুরাইশরা শুরুতে ছিল মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায়; পরে তারা ব্যবসায়ী হয়েছে। পারস্য ও রোম বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যকার ক্রমাগত যুদ্ধ মক্কায় ব্যাবসায়িক জৌলুসের পরিবেশ তৈরি করে দেয়। কারণ, তখন সমর ও সামরিক তৎপরতার কারণে ইরাক ও শামের মধ্যকার পথগুলো বন্ধ ছিল। আর মক্কার অধিকাংশ লোক ছিল ব্যবসায়ী। উত্তর-দক্ষিণের সকলে সেখানে এসে যাত্রাবিরতি করত।

---

[৩৪] মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার : আবুল হাসান মাসউদি, খ. ২, পৃ. ৩২।

ব্যাবসায়িক কাফেলাগুলো নিরাপদে মক্কা হয়ে গন্তব্যে পৌঁছে যেত। এটি সম্ভব হতো দুটি কারণে—

এক. চুক্তি। যেসব গোত্রের ওপর দিয়ে ব্যাবসায়িক কাফেলা অতিক্রম করবে, তাদের গোত্রপ্রধান ও পার্শ্ববর্তী বাণিজ্যিক অঞ্চলের রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে সর্বসম্মত একটি চুক্তি ছিল—যাতে নিরাপদে অতিক্রম করে কাফেলাগুলো উদ্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে পারে।

দুই. আরবরা সাধারণভাবে মক্কায় কুরাইশদের ধর্মীয় নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। কারণ, তারা আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী ও খাদেম।

কুরাইশরা বার্ষিক দুটি বাণিজ্যিক সফরের নিয়ম চালু করে। গ্রীষ্মকালে কাফেলাগুলো হিন্দুস্তানের পণ্য নিয়ে শামে যাবে। সেখান থেকে গাজা, আইলা[৩৫] ও বসরা[৩৬] যাবে। তারপর বেচাকেনার কাজ শেষ করে নতুন করে পণ্য নিয়ে ফিরে আসবে। সেখান থেকে আনা পণ্যের মধ্যে থাকত—শস্যবীজ, তেল, মদ, অস্ত্রশস্ত্র, হাতেবোনা কাপড় ও দাসী। শীতকালে কাফেলা যাবে ইয়েমেনে। আর হাবশার সাথে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম চলত সমুদ্রপথে।

কুরাইশরা ব্যবসা থেকে পণ্যের ওপর নির্ধারিত শুল্ক পেত। তারা তাদের অঞ্চলের ওপর দিয়ে যাওয়া বাণিজ্য-কাফেলাগুলো থেকে কর পেত। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ ব্যাবসায়িক কার্যক্রমে অংশ নিত। কেউ অর্থ বিনিয়োগ করে অংশগ্রহণ করতে না পারলে চৌকিদার বা গাইড হিসেবে কাজ করত।

কুরাইশদের কেউ কেউ ব্যবসা করে প্রচুর সম্পদ অর্জন করে। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা তাদের অন্যতম। বাণিজ্যিক কার্যক্রম থেকে জন্মলাভ করে সুদ—যা ছিল আরবের বাণিজ্য বিপ্লবের প্রত্যক্ষ অনুষঙ্গ। এ ছাড়াও ঋণ ও বন্ধকের প্রচলন ঘটে। এসবে ব্যাবসায়িক হিসাব সংরক্ষণের জন্য পড়ালেখা শেখার প্রয়োজন দেখা দেয়।

---

[৩৫] আইলা হলো, শামের দিকে লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী একটি শহর। বলা হয়, আইলা হলো হিজাযের শেষ এবং শামের শুরু। মুজামুল বুলদান : হামাভি, খ. ১, পৃ. ২৯২১।

[৩৬] বসরা হলো, দামেশক প্রদেশের অন্তর্গত একটি শহর। প্রাচীন ও আধুনিক– উভয় সময়ের ছোট ছিমছাম প্রসিদ্ধ এক শহর বসরা। মুজামুল বুলদান : খ. ১, পৃ. ৪৪১।

শৃঙ্খলা ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির সাথে আরেকটি বিষয় যুক্ত হয়—যা ছিল কুসাইয়ের শাসন ব্যবস্থাপনার আবশ্যকীয় ফলাফল। কুরাইশরা রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ধর্মীয় মর্যাদার জায়গা এককভাবে অধিকার করে নেয়। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অর্জনগুলো রক্ষার জন্য কুরাইশরা তৈরি করে কিছু মৌলিক নীতিমালা। এই শাসন ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

পরিষদ : এটি ছিল মক্কার নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক ক্ষমতাচর্চার প্রথম ক্ষেত্র। এই পরিষদ মক্কার নেতৃবৃন্দ, মুখপাত্র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে গঠিত হতো। তাদের সবাই সম্পদশালী হতো না। তারা এই পদ অলংকৃত করত মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান-গরিমা দিয়ে। অথবা বংশমর্যাদা ও সম্মানের কারণে। নিজেদের অর্জনগুলো রক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হলেও তাদের মাঝে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। এটি ছিল কেবল অধিকার রক্ষার পরিষদ; কোনো সংস্কার ও পরিবর্তন তারা গ্রহণ করত না।

নদওয়া বা পরামর্শ পরিষদ : পূর্বোল্লিখিত পরিষদের সাথে সমন্বিত এই নদওয়া ছিল মক্কার ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক ক্ষমতাচর্চার দ্বিতীয় ক্ষেত্র। যুদ্ধ ও শান্তি—উভয় অবস্থায় এটি পরামর্শপরিষদ হিসেবে স্বীকৃত ছিল। এই নদওয়ায় সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ করা হতো। গণসংশ্লিষ্ট সাধারণ বিষয়েও সিদ্ধান্ত আসত এখান থেকে। যেমন, যুদ্ধের পতাকা বাঁধা, ব্যাবসায়িক কাফেলা রওনা হওয়া, বৈবাহিক আকদ অনুমোদন ইত্যাদি। নদওয়া ছিল শাসন ব্যবস্থাপনার সদর দফতর। মক্কার নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এর উদ্ভাবন করেছিল কুসাই ইবনে কিলাব। নদওয়ায় প্রবেশাধিকার এবং পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ চল্লিশোর্ধ্ব ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যত্যয়ও ছিল।[৩৭]

আর-রিফাদাহ : প্রতি মৌসুমে কুরাইশরা তাদের সম্পদের কর জমা দিত কুসাইর কাছে। সেই সম্পদ দিয়ে হাজিদের জন্য খাবারের আয়োজন করা হতো।[৩৮]

---

৩৭. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ১, পৃ. ১৪৮-১৪৯।
৩৮. প্রাগুক্ত : খ. ১, পৃ. ১৫৩।

আস-সিকায়াহ : হাজিদের জমজমের পানি পান করানোকে সিকায়াহ বলা হতো। মেহমানদারির সঙ্গে পানি পান করানোর দায়িত্বও কুসাই কুরাইশের অধিকারে ন্যস্ত করেছিল।[৩৯]

আল-হিজাবাহ : হিজাবাহ হলো কাবার পাহারা দেওয়া। অর্থাৎ কাবার খেদমত, হেফাজত ও চাবি সংরক্ষণ করা।[৪০]

ঝান্ডা : এটিও কুসাই প্রণীত নিয়ম। পতাকা কেবল যুদ্ধের সময় বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনকারী সেনাপ্রধানই ধারণ করতে পারত।

এই পদগুলো সৃষ্টি করা হলে তা কুসাইয়ের সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এগুলো ছিল মক্কার নিয়তিতে কুরাইশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার দাপুটে প্রকাশ। এসব রিসালাতের যুগের আগের কথা।

বাণিজ্যিক কার্যক্রম, শাসনব্যবস্থাপনা এবং মক্কার বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি সত্ত্বেও সমাজ ছিল গোত্রকেন্দ্রিক। একদিকে কাবার রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে তৈরি হওয়া চুক্তি, অপরদিকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঐক্য—গোত্রকেন্দ্রিক জীবনে তারা এগুলো লঙ্ঘন করত না। এক বংশ আরেক বংশের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন করত না। বরং সব বংশের লোকেরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। যৌথ যেকোনো স্বার্থ তাদের ঐক্যবদ্ধ করে ফেলত।

সাধারণ পরিষদের উপস্থিতি এই বাস্তবতায় ব্যাঘাত ঘটাত না। কারণ, সাধারণ পরিষদ গোত্রীয় পরিষদগুলোর সিদ্ধান্তের বাইরে যেত না। প্রতিটি গোত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয়দের সমন্বয়ে গঠিত একটি করে পরিষদ থাকত। সেই পরিষদ গোত্রের বিভিন্ন বিষয়ে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিত। তবে পরিষদ কখনো ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করত না। প্রতিটি সদস্য গোত্র বা দলের অধিকারের কথা মাথায় রেখে নিজের স্বাধীনতা ভোগ করত। গোত্রীয় পরিষদ গঠিত হতো ১০ জন দায়িত্বশীল, সম্ভ্রান্ত ও প্রবীণ ব্যক্তির সমন্বয়ে। তারা শহরের প্রধান কেন্দ্র ব্যবহার করত। এই পদগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের বড় ছেলে বা পরিবারের দায়িত্বশীলের কাছে অর্পিত হতো। একে 'দারুন নদওয়ার শাসন' বা 'নদওয়াতু কুরাইশের শাসন' নামে

---

৩৯. প্রাগুক্ত : খ. ১, পৃ. ১৪৮।

৪০. প্রাগুক্ত।

অভিহিত করা যেতে পারে—যা দাঁড়িয়ে ছিল খ্যাতির ওপর ভিত্তি করে। বিভিন্ন অঞ্চলের সবকিছুর মিলনস্থল ছিল এই হিজাজ।[৪১]

তবে এই শাসনব্যবস্থা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দিয়েছিল, যার প্রভাব আমরা মক্কার বিভিন্ন শপথনামায় দেখতে পাই। কুসাইয়ের মৃত্যুর পর এই শহরটি ক্ষমতা ও সামাজিক পদ ভাগাভাগি নিয়ে গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ভয়ংকর এক লড়াইয়ের সাক্ষী হয়েছে। এর ফলে কয়েকটি শপথচুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। কুরাইশকে যা দুটি উল্লেখযোগ্য ভাগে বিভক্ত করে দেয়। বলছি—মুতাইয়াবিনদের শপথচুক্তি ও আহলাফদের শপথচুক্তির কথা।[৪২]

তারপর হিলফুল ফুজুলকে মুতাইয়াবিনেরই[৪৩] সম্পূরক হিসেবে গণ্য করা হয়। মক্কার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীগুলোও একের পর এক এ জাতীয় শপথ করে যাচ্ছিল। এই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সক্রিয় ছিল।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের কিছু কাল পরে রাজনৈতিক এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফের সক্রিয় হয়ে ওঠে। বনু হাশিমের হুসাইন ইবনে আলি ইবনে আবি তালিব এবং মুআবিয়া রাযি. কর্তৃক নিযুক্ত মদিনার গভর্নর বনু আবদে শামসের ওয়ালিদ ইবনে

---

[৪১]. *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, খ. ৪, পৃ. ৪৮-৫০।

[৪২]. কুসাই ইবনে কিলাবের মৃত্যুর পর পুনরায় মক্কার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক পদবণ্টন নিয়ে তার বংশধরদের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। এর ফলে তারা দুটি বিবদমান প্রতিপক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বনু আবদে মানাফ ইবনে কুসাইয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো—আবদে শামস, হাশিম, মুত্তালিব ও নাওফাল। তাদের নেতৃত্বে ছিল আবদে শামস। তারা সিদ্ধান্ত নেয়—বনু আবদুদ দারের হাতে থাকা কাবার রক্ষণাবেক্ষণ, ঝান্ডা, জমজমের পানি পান করানো এবং হাজিদের মেহমানদারির দায়িত্ব ছিনিয়ে নেবে। বনু আবদুদ দারের নেতা ছিল আমের ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে আবদুদ দার। এই প্রেক্ষিতে কুরাইশরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল বনু আবদে মানাফের সাথে, আরেকদল বনু আবদুদ দারের সাথে। বনু আবদে মানাফ ও তাদের মিত্রগোষ্ঠী মিলে সুগন্ধিভরতি একটি পাত্র বের করে। কাবার সামনে পাত্র রেখে তারা সকলে তাতে হাত ডুবিয়ে শপথ গ্রহণ করে। (আরবিতে সুগন্ধিকে বলা হয় তিব। এবং সুগন্ধি ব্যবহারকারীকে বলা হয় মুতাইয়াব।) এজন্য তাদের বলা হয় মুতাইয়াবিন। অপরদিকে বনু আবদুদ দারও শপথ করে। তাদের সঙ্গে মিত্রগোষ্ঠীরাও সাহায্য করার ব্যাপারে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করে। (আরবিতে মিত্র গোত্র বা গোষ্ঠীকে বলা হয় আহলাফ।) তাই তাদের বলা হয় আহলাফ। দেখুন, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ১, পৃ. ১৫৩-১৫৪।

[৪৩]. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের ২০ বছর পূর্বে হিলফুল ফুজুল কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কে জানতে দেখুন, *আর-রাওজুল উনুফ*, সুহাইলি, খ. ১, পৃ. ১৫৬।

ওতবার মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং হুসাইন রাযি. কর্তৃক হিলফুল ফুজুলের সহযোগিতা নেওয়ার হুমকি প্রদান এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।[৪৪]

ইয়াসরিব

ইয়াসরিব—মক্কা থেকে ৩০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। উঁচু ভূমি-ঘেরা এক উর্বর উপত্যকায় অবস্থিত এই শহরটির একেক খণ্ড ভূমি অপর খণ্ডের চেয়ে উঁচু। সেখানে প্রচুর পরিমাণে কূপ ও ঝরনা রয়েছে। ফলে শহরটিতে সুষম পরিবেশের পাশাপাশি খেজুর বাগান, গাছপালা ও ফসলে ভরপুর। অবশ্য গ্রীষ্মকালে মাঝেমধ্যে রোদ প্রচুর তেতে ওঠে। তবে তা রুক্ষ মক্কার রৌদ্র-তাপের মতো অত তীব্র নয়।

বর্ণনাকারীরা বলেন, ইয়াসরিবের প্রথম বাসিন্দা আমালিকা গোষ্ঠী। পরে ফিলিস্তিন থেকে রোমানদের নির্যাতনের শিকার হয়ে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইহুদিরা এখানে এসে আবাস গড়ে তোলে।[৪৫] তারপর দক্ষিণ দিক থেকে 'সাইলুল আরিম'[৪৬] বা বাঁধভাঙা বন্যার ঘটনার পরপর আসে আউস ও

---

৪৪. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ১, পৃ. ১৫৩-১৫৬।

৪৫. ফিলিস্তিনে রোমান ঘাঁটির বিরুদ্ধে ইহুদিদের হামলার পরপর ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সেনাপতি টিটাস (Titus) বাইতুল মাকদিস গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইহুদিদের পুনরায় হামলার পর রোমান সেনাপতি হাড্রিয়ান (Hadrian) শহরগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদিদের বিতাড়িত করেছিল। এর মধ্যে জাজিরাতুল আরবও অন্তর্ভুক্ত। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে পুনরায় ফিলিস্তিনে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত এটিই ছিল সর্বশেষ নির্বাসন।

৪৬. সাইলুল আরিম বা বাঁধভাঙা বন্যা। ইয়েমেনে বসবাসকারী সাবা সাম্রাজ্যের অধীনে পার্শ্ববর্তী মারিব নদীর মুখে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়। উদ্দেশ্য, বন্যা রোধ করে মারিব নদীর পানিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা। ঐতিহাসিক এই বাঁধের ফলে মারিব নদীর পানি দিয়ে ইয়েমেনের ফল-ফসলের ব্যাপক ফলন হতে থাকে। একসময় তারা হঠকারিতা করে তৎকালীন প্রেরিত নবীকে অস্বীকার করলে আল্লাহ তাআলা তাদের এই বাঁধ ভেঙে দিয়ে বন্যার শাস্তি দেন। প্রবল বন্যায় তাদের সকল বাগান নষ্ট হয়ে জমির উর্বরতাও নষ্ট হয়ে যায়। কুরআনুল কারিমে এই ঘটনার বিবরণ এসেছে এভাবে—

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ○ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾

সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন দুটি উদ্যান, একটি ডানদিকে, একটি বামদিকে। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিজিক খাও এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। স্বাস্থ্যকর শহর এবং ক্ষমাশীল পালনকর্তা। অতঃপর তারা অবাধ্যতা করল ফলে আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম প্রবল বন্যা আর তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন

খাযরাজ গোত্র। তারা এসে ইয়াসরিবে প্রভাব বিস্তার করে এবং মূল নেতৃত্ব অধিকার করে। আউস ও খাযরাজ ছিল পৌত্তলিক দুটি গোত্র। তারা মক্কায় হজ করতে যেত আবার দেব-দেবীর প্রতিমা পবিত্র মনে করত। ইয়াসরিবের জমি উর্বর হওয়ার কারণে সেখানে অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। ইয়াসরিবের লোকেরা সুরক্ষিত ঘরবাড়িতে বসবাস করলেও তাদের জীবনাচার মরুবাসী বেদুইনদের তুলনায় কোনো অংশে ভিন্ন ছিল না। বোঝা যায়—তাদের কাছে খ্রিষ্টধর্ম একটি পরিচিত বিষয় ছিল।

ইহুদিরা এই দুই গোত্রের মধ্যে নিয়মিতভাবে যুদ্ধ বাধিয়ে রাখার চেষ্টা করত—যাতে তাদের মনোযোগ অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা যায়। ফলে আউস ও খাযরাজের মধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ লেগে ছিল। যদি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে আবির্ভূত না হতেন, আল্লাহর মেহেরবানিতে তারা পরস্পর ভাই ভাই না হয়ে যেত—তা হলে এসব যুদ্ধ থেকে তাদের বিরত রাখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

তায়েফ

তায়েফ মক্কার পূর্ব-দক্ষিণ দিকে ৭৫ মাইল দূরে এবং প্রায় ৬ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। চতুর্দিকে বাগান। দেখতে অনেকটা এক টুকরো শাম যেন। বেশ উঁচুতে অবস্থিত হওয়ার ফলে তায়েফের আবহাওয়া ছিল স্বাস্থ্যকর। কুরাইশরা সেখানে গ্রীষ্মকাল যাপন করতে যেত। তায়েফে অবস্থান করত সাকিফ গোত্র। মক্কার পর অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ বিচারে তায়েফকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে গণ্য করা হতো।

উত্তর দিকের সাম্রাজ্যসমূহ

আম্বাত সাম্রাজ্য (Nabataean Kingdom)

এই সাম্রাজ্যটি জাজিরাতুল আরবের উত্তর-পশ্চিম অংশে খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজধানী বাতরাকে (Petra) কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাণিজ্যিক পথের কাছাকাছি এর অবস্থান ছিল—যা সাবা ও জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণ ভাগের প্রতিবেশী অঞ্চল এবং উত্তরে সিরিয়ার সমুদ্রবন্দরগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছিল। আম্বাত সাম্রাজ্য

দুই উদ্যানে, যাতে উদ্‌গত হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং সামান্য কুলবৃক্ষ। [সুরা সাবা : ১৫-১৬]—নিরীক্ষক

উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল—যা তার শাসকদের প্রতিবেশী অঞ্চলের ওপর সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তারে উৎসাহী করে তুলেছিল। অপরদিকে তাদের তৎপরতা নাবাতিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রোমান সাম্রাজ্যকে বিরক্ত করে তোলে। নাবাতিনরা লেখার জন্য আরামিক (Aramaic) ভাষা গ্রহণ করে।[৪৭] নাবাতিরা একটি মিশ্র সভ্যতা লালন করত। তারা ছিল কথ্যভাষায় আরবি, লেখ্যভাষায় আরামীয়, ধর্মে সেমিটিক (Semitic)। তারা শিল্প ও স্থাপত্যকুশলতায় গ্রিক-রোমক ধারা ব্যবহার করত। এতৎসত্ত্বেও মৌলিকভাবে তারা ছিল আরবীয়।

নাবাতিরা আরবদের সঙ্গে মিলে জাহেলি যুগে হিজাজের প্রসিদ্ধ মূর্তি দোশারার (Dushara) পূজা করত। দোশারা ছিল তাদের প্রধান উপাস্য। দোশারা তৈরি হতো পাথরখণ্ড বা পাথরের স্তম্ভ দিয়ে। তাদের অন্য উপাস্যগুলো ছিল—লাত, চাঁদ, মানাত ও হুবাল ইত্যাদি।

নাবাতিদের প্রসিদ্ধ রাজন্যবর্গ হলো, প্রথম হারিস (১৬৯-১৪৬ খ্রিষ্টপূর্ব), দ্বিতীয় হারিস (১১০-১০৬ খ্রিষ্টপূর্ব), তৃতীয় হারিস (৮৭-৬২ খ্রিষ্টপূর্ব)। আর সর্বশেষ রাজা হলো, তৃতীয় মালেক (১০৬-১০১ খ্রিষ্টপূর্ব)। তৃতীয় মালেকের শাসনামলে রোমান সম্রাট ট্রাজান (Trajan) নাবাতিন সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়।[৪৮]

তাদমুর সাম্রাজ্য (Palmyrene Empire)

তাদমুর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তার অবস্থানকেন্দ্রের। তাদমুর সাম্রাজ্য একদিক থেকে ইরাক ও শামের মধ্যবর্তী বাণিজ্যিক পথে স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়েছে। অন্যদিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই বিবদমান বৃহৎশক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে।

এই সাম্রাজ্যের নিদর্শনগুলো হিমসের কাছাকাছি অবস্থিত। সময়ের হিসাবে তাদমুর এক প্রাচীন সাম্রাজ্য। তবে এর রাজনৈতিক প্রসিদ্ধি ছড়িয়েছে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শুরুর দিকে। অবশ্য পরে রোমান শক্তির আওতাভুক্ত হয়ে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়। তবে তাদমুর

---

[৪৭]. *তারিখুদ দাওলাতিল আরাবিয়্যাহ*, সায়্যিদ আবদুল অযিয সালেম, পৃ. ১০২।
[৪৮]. প্রাগুক্ত : পৃ. ১১১।

সাম্রাজ্য তার উন্নতির শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করে খ্রিষ্টীয় ১৩০ থেকে ২৭০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে।

তাদমুর বা পালমিরেন সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজা হলো, উজাইনা (Odaenathus), তার ছেলে ওয়াহবুল লাত (Vaballathus), তারপর রানি জানুবিয়া (Zenobia)। রানি জানুবিয়া সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে একটি রাজনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে। উত্তরে রোমান অঞ্চলের ওপর সাম্রাজ্য বিস্তার এবং দক্ষিণে মিসর দখল বিষয়ে। জানুবিয়ার এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফলও হয়েছিল। মিসরে রোমানরা তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল জানুবিয়ার এই সম্প্রসারণমূলক রাজনীতি এবং লাগাতার অঞ্চল জয় করে রোম দখলের অভিপ্রায় প্রচার-প্রসার লাভ করে। এটা স্পষ্ট যে, এই সংবাদ রোমসম্রাট অরিলিয়ানুসকে (Aurellianus) চিন্তিত করে তোলে। অরিলিয়ানুস জানুবিয়ার ঘরের ভেতর হামলা করে বিজয় ছিনিয়ে নেয়। রোমক বাহিনী জানুবিয়ার রাজধানী তছনছ করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। এটা ২৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। তারপর জানুবিয়া আত্মগোপন করে আস্তে আস্তে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে। কিন্তু ছোট একটি গ্রাম এবং সিরিয়ার সম্মুখভাগের একটি দুর্গ ছাড়া তার হাতে আর কিছুই ফিরে আসেনি। তাদমুরে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার লাভ করে এবং তা খ্রিষ্টান যাজকদের এলাকায় পরিণত হয়।[৪৯]

---

৪৯. এই সাম্রাজ্যের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে দেখুন, *তারিখুদ দাওলাতিল আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ১১৫-১৩৬।

নববি যুগে জাজিরাতুল আরবের মধ্য-উত্তরাঞ্চল ও শামে আরবগোত্রসমূহের অবস্থান
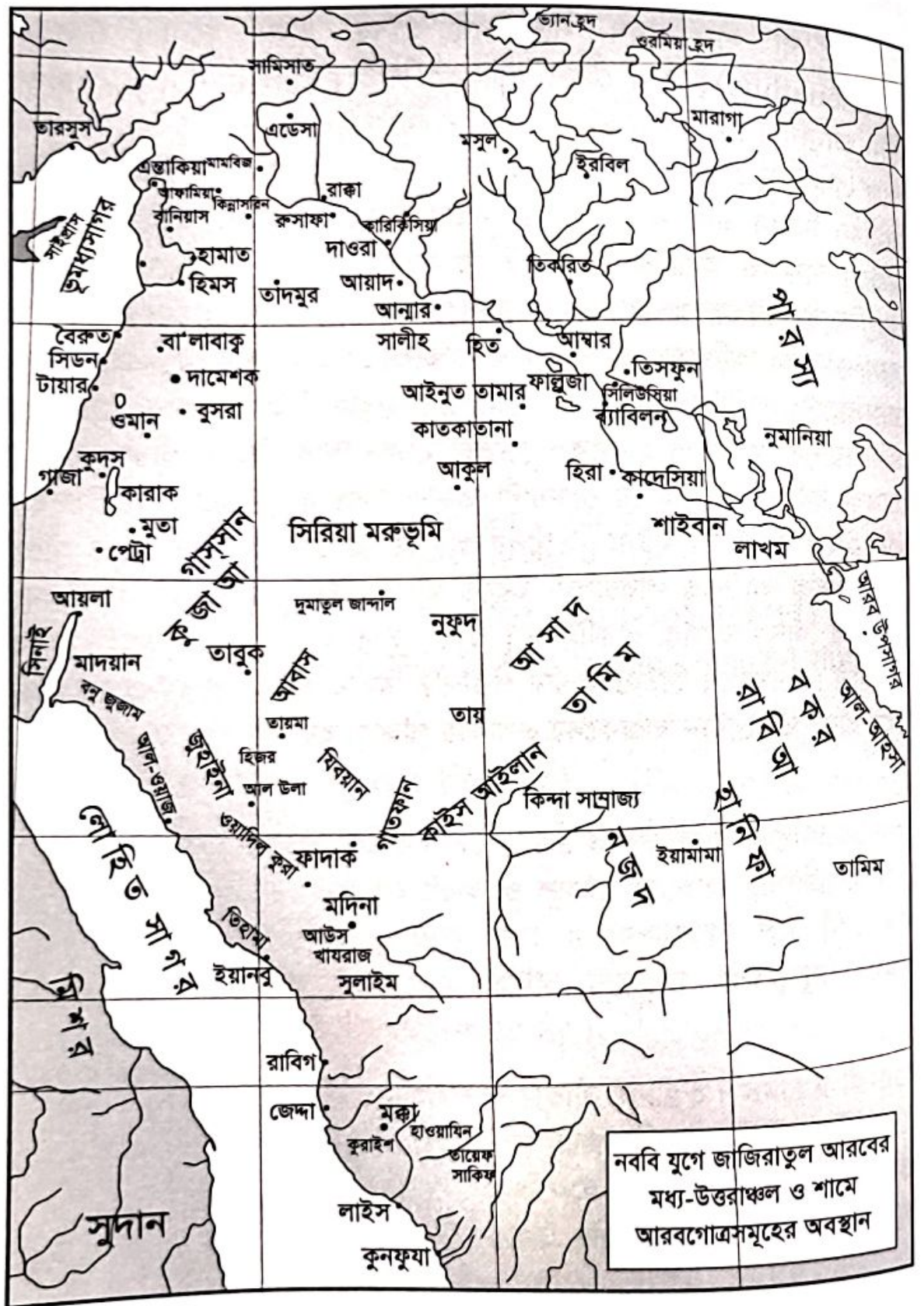
পালমিরেন সভ্যতা ছিল সিরীয়, গ্রিক ও পারস্য জাতির সংমিশ্রণে গঠিত। অথচ পালমিরীরা ছিল আরব গোত্র। তাদের ভাষণ ও লেখার ভাষা ছিল পাশ্চাত্যের আরামিক ভাষা। অধিকন্তু আরামিক ভাষার পাশাপাশি গ্রিক ভাষাও প্রচলিত ছিল।

উপাসনার দিক থেকে পালমিরীয়দের ধর্ম উত্তর সিরিয়া ও মরু আরব গোত্রগুলোতে প্রচলিত ধর্মের চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল না। তাদের প্রসিদ্ধ উপাস্য ছিল—সূর্যদেবতা, বা'লদেবতা, লাত ও ইশতার (Ishtar) ইত্যাদি।

গাসসানি সাম্রাজ্য (Ghassanid Kingdom)

গাসসানি বা আলে জাফনাহ হলো ইয়েমেনের আরব। তাদের মূল বংশ আযদ। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে সাবা অঞ্চলে সাইলুল আরিম বা বাঁধভাঙা বন্যার ঘটনার আগে বা পরে তারা উত্তর দিকে হিজরত করে। প্রথমে তিহামার গাসসান নামক জলাধারের নিকট বসবাস শুরু করে। সেই জলাধার থেকে তারা পানি সংগ্রহ করত। এ থেকেই তাদের নাম হয়ে যায় গাসসানি। আর আলে জাফনাহ ডাকা হয় তাদের প্রথম রাজা জাফনাহ ইবনে আমর মুজাইকিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে। তারপর তারা শামের উপকণ্ঠে হিজরত করে। সেখানে কুজাআর একটি গোত্র ছিল—যারা বনু সালিহের দজাইমা বংশগত। বাইজেন্টাইন রাজা তাদেরকে কর প্রদানের শর্তে সে অঞ্চলে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছিল। দজাইমাদের শক্তিসামর্থ্য দুর্বল হয়ে এলে গাসসানিরা বালকা থেকে হাওরানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। তারা বসরাকে রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করে। সেখানে তারা সীমিত পরিসরে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারত। গাসসানিরা মূলত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের গভর্নর ছিল।[৫০]

গাসসানিরা রোমান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অনুগত হিসেবে আবশ্যকীয় সব দায়িত্ব পালন করেছে। মরুবাসীদের হামলা থেকে সীমান্ত রক্ষা করেছে। পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গাসসানিরা এবং তাদের সমর্থক মানাযিরা আরবরা বাইজেন্টাইনকে সাহায্য করেছে।

---

৫০. *মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*, খ. ২, পৃ. ১০৬-১০৭; *আল-ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদা' ওয়াল খাবার* (তারিখে ইবনে খালদুন) : খ. ২, পৃ. ৫৮৫; *তারিখুদ দাওলাতিল আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ১৪৩।

এই সাম্রাজ্যটি সভ্যতার উঁচু মার্গে পৌছে সাসানি ও বাইজেন্টাইন সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। গাসসানি সাম্রাজ্য প্রসিদ্ধ ছিল প্রচুর দুর্গ, সিনাগগ, গির্জা ও বড় বড় স্থাপত্য শিল্পের কারণে। গাসসানিরা বাইজেন্টাইনদের যুদ্ধশৈলী গ্রহণ করেছিল। গ্রিক ভাষা থেকে এমন অনেক শব্দ নিয়েছিল, যা তাদের মধ্যে পরিচিত ছিল না। যেমন : গির্জা, পাদরি।

গাসসানিদের প্রসিদ্ধ রাজা হলো, হারিস ইবনে জাবালাহ (৫২৮-৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ)। তাকে হারিস ইবনে আবি শামরও ডাকা হয়। পারস্য ও ইরাকের আরবদের বিরুদ্ধে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের (Justinian) যুদ্ধে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। সেই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাস্টিনিয়ান তাকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করে। এবং শামের আরবদের ওপর হারিসের স্বাধীন শাসন মেনে নেয়। পাশাপাশি হারিস হিরার (Hirah) আমির মুনযির বিন মাউস সামার সাথে কয়েকটি বড় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উত্তর দিকে বাতরা থেকে তাদমুরের উত্তরে রুসাফা (Rusafa) পর্যন্ত এলাকা বিস্তৃত হয়। এই বিস্তৃতির পর ইবনে জাবালার শাসনকালকে গাসসানিদের দেখা সেরা শাসনকাল হিসেবে গণ্য করা হয়।

গাসসানিরা 'মনোফেজি' মতাদর্শকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের একটাই সত্তা; ঐশী সত্তা। অর্থাৎ মানবপ্রভু।

হারিস ইবনে জাবালাহ তার পুত্র মুনযিরকে (৫৬৯-৫৮১ খ্রি.) রেখে যায়। মুনযির ধর্ম-রাজনীতি ও মানাযিরাদের সাথে যুদ্ধের ক্ষেত্রে পিতার পথ অনুসরণ করে চলে। ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হিরার রাজা কাবুসের সাথে লাগাতার কয়েকটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হলো, আইনে উবাগ[৫১] যুদ্ধ; যেখানে মুনযির নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেছিল।

তারপর মুনযির ও বাইজেন্টাইনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। যথাসম্ভব কিছু ধর্মীয় বিরোধকে কেন্দ্র করে। অথবা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য আশঙ্কা করছিল—শক্তি বেড়ে গেলে মুনযির তাদের ওপর হামলা করতে পারে। তাই তারা পূর্বের দেওয়া সব সহযোগিতা-প্রতিশ্রুতি থেকে মুনযিরকে বঞ্চিত করে। তারপর বন্দি করে সিসিলিতে নির্বাসনে পাঠায়।

---

৫১. আইনে উবাগ হলো ফোরাত থেকে শাম যাওয়ার পথে আম্বারের পেছনে একটি উপত্যকার নাম। *মুজামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ১৭৫।

মুনযিরের সন্তানরা নুমানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু ৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে নুমান ইন্তেকাল করে। এরপর গাসসানিদের ঐক্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তাদের সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। কিছু লোক দুর্বল আমিরদের তত্ত্বাবধানে ভাগ ভাগ হয়ে যায়। তাদের শেষ আমির ছিল—জাবালাহ ইবনুল আইহাম। তারপর মুসলিমরা ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তাদের অঞ্চল জয় করে নেয়।

হিরা সাম্রাজ্য[৫২] (Lakhmids Kingdom) হিরা সাম্রাজ্য লাখমি (Lakhmids), মানাযিরা ইত্যাদি একাধিক নামে প্রসিদ্ধ। এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় বনু তানুখের কিছু গোত্রের হাত ধরে—যারা ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে আবাস গড়েছিল। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের শুরুতে তারা ইয়েমেন থেকে হিজরত করে সেখানে যায়।

আমর ইবনে আদি হিরাকে রাজধানী বানিয়ে এই সাম্রাজ্যের ভিত স্থাপন করে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য এবং তাদের গভর্নর গাসসানিদের মুখোমুখি অবস্থানের কারণে হিরা সাম্রাজ্য পারস্যের বাহনে চড়ে এগিয়ে যায়।

এই সাম্রাজ্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক স্থিরতা নিশ্চিত করতে পেরেছিল—যা তাদের উন্নয়নশীল স্থাপত্যচর্চার সুযোগ করে দিয়েছিল। বাণিজ্যিক কাফেলার পথিমধ্যে অবস্থিত হওয়ায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হবার সুযোগ তৈরি হয়। ফলে, মানাযিরারা আয়েশি জীবনযাপন করতে থাকে। পাশাপাশি তারা কৃষিকাজ করতে থাকে। সম্ভবত এগুলোই গাসসানিদের জীবনযাত্রার তুলনায় তাদের জীবনযাত্রাকে আরও স্থিতিশীল, আরও সভ্য ও উন্নত করেছিল।

হিরা সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজা হলো, আমর ইবনে আদি ইবনে নসর। পারস্য সম্রাট সাপুর যাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল। তারপর অধিষ্ঠিত হয় তার পুত্র ইমরুল কায়েস (২৮৮-৩২৮ খ্রি.), তারপর প্রথম নুমান ইবনে ইমরুল কায়েস (৩৯০-৪১৮ খ্রি.)। নুমান দুটি ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে একটি

---

[৫২]. মানাযিরাদের ইতিহাস জানতে দেখুন, *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, খ. ৩, পৃ. ১৫৫-৩১৪। **হিরা :** হিরা হলো কুফা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি শহরের নাম। শহরটি নাজাফ নামক এলাকায় অবস্থিত। ভূগোলবিদদের মতে, পারস্য সাগরের একপাশ গিয়ে মিলেছে নাজাফ ও হিরার সাথে, যেখান থেকে খাওয়ারনাক প্রাসাদ পূর্ব দিকে মাত্র এক মাইল। আর সাদির প্রদেশটি হিরা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূমিতে অবস্থিত। বুখতে নাসরের শাসনকাল এবং তারপর লাখমিদের যুগ থেকে জাহেলি যুগ পর্যন্ত এটি আরব রাজাদের আবাসস্থল ছিল।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ২, পৃ. ৩২৮।

শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেছিল। ব্যাটালিয়নদুটি ছিল শাহবা ও দুসার গোত্র। খাওয়ারনাক ও সাদির প্রাসাদ তার স্থাপত্যকীর্তি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। নুমানের ক্রমবর্ধমান শক্তির দিকে তাকিয়ে সালেহ বাহরামের মধ্যে জুলুমের খাহেশ তৈরি হয়। যে তার পিতা প্রথম ইয়াজদেজিরদের (Yazdegerd I) পরে পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি মানাযিরাদের সম্মান বৃদ্ধি করেছিল।

মানাযিরারা তাদের জীবনে উন্নতির চূড়ায় পৌঁছে মুনযির বিন মাউস সামারের (৫১৪-৫৫৪ খ্রি.) শাসনামলে। মুনযির ওমান পর্যন্ত রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেছিল। ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে গাসসানি ও বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বেশিরভাগ যুদ্ধে মুনযির জয়লাভ করে। কিন্তু গাসসানিদের বিরুদ্ধে হালিমা যুদ্ধের দিন মুনযির নিহত হয়।

মুনযিরের পর ক্ষমতায় বসে তার ছেলে আমর ইবনে হিন্দ (৫৫৪-৫৬৯ খ্রি.)। আরবরা তার উপাধি দেয় মুহাররিক (দগ্ধকারী)। কারণ, আমর ইয়ামামাতে আওয়ারা যুদ্ধের দিন বনু তামিমের ১০০ লোককে পুড়িয়ে মেরেছিল। ওয়াতির তাগলিব গোত্রের সাথে আমর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। জানা যায়—আমরের ক্ষমতা নজদের পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তরের বহু গোত্রের ওপর বিস্তার লাভ করেছিল। তার শাসনামলে কবি ও সাহিত্যিকদের আগমনে হিরা হয়ে উঠেছিল সাহিত্যের আলোকিত এক কেন্দ্র।

আমরের পর আরও অনেক শাসক হিরার শাসনভার গ্রহণ করেছিল। তাদের সর্বশেষজন হলো, মুনযির বিন তৃতীয় নুমান বিন চতুর্থ মুনযির। তার শাসনাধীনে থাকা অবস্থায় ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. হিরা জয় করেন।

হিরার অধিবাসীরা ব্যবসা করত। আরব সভ্যতায় তাদের বিরাট অবদান রয়েছে। জাজিরাতুল আরবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও প্রচারের ক্ষেত্রে তারা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছে।

লাখমের বংশধররা মুনযির ইবনে মাউস সামার শাসনামলে খ্রিষ্টধর্মের নাসতুরি[৫৩] মতাদর্শ গ্রহণ করে। কেউ কেউ ইয়াকুবি[৫৪] মতাদর্শ গ্রহণ করে।

---

৫৩. খ্রিষ্টধর্ম সে সময় বেশ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নাস্তুরিয়া (Nestorianism), আরেকটি হলো ইয়াকুবিয়া (Yakibiyah)।

জানা যায়, তারা পারস্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু হিরার পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে উঠলে নতুন করে পারস্যের কাছে মাথানত করতে তারা বাধ্য হয়।

দক্ষিণ অংশের সাম্রাজ্যসমূহ

মুইনিয়া সাম্রাজ্য (১৩০০-৬৩০ খ্রিষ্টপূর্ব)[৫৫]

ইয়েমেনে প্রতিষ্ঠিত মুইনিয়া সাম্রাজ্যকে আরবের সর্বপ্রাচীন সাম্রাজ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। আরবি উৎসগ্রন্থসমূহে এই সাম্রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এর উল্লেখ পাওয়া যায় গ্রিক ও রোমান উৎসগ্রন্থে। মুইন সাম্রাজ্য ছিল সাবা ও কাতাবান অঞ্চলের উত্তরে অবস্থিত। নাজরান ও হাদরামাউতের মধ্যবর্তী উর্বর এক সমতল অঞ্চলে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খেজুর বাগান, কাঠ গাছ, চারণভূমি ও রাজধানী কারনার কারণে মুইনিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সাম্রাজ্যটি শুধু মুইন নামেও প্রসিদ্ধ।

মুইনিয়াদের উৎপত্তি হয় জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তাদের রাজনৈতিক শক্তি উত্তর দিকে হিজাজ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। শাসনব্যবস্থা হিসেবে মুইনিয়া ছিল কয়েকটি প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত রাজতন্ত্র। প্রতিটি প্রাদেশিক প্রধান কেন্দ্রীয় রাজত্বের প্রতিনিধি হিসেবে শাসন করত। প্রতিটি প্রদেশে আলাদা পরিচালনা পরিষদও ছিল।

নাস্তুরিয়া (Nestorianism) : সিরিয়ায় জন্ম নেওয়া নাস্তুরিয়ুসের (৩৮০ খ্রি.-৪৫১ খ্রি.) দিকে সম্পৃক্ত করে এই দলটিকে নাস্তুরিয়া বলা হয়। ৪২৮ খ্রিষ্টাব্দে নাস্তুরিয়ুস চার বছরের জন্য কনস্টান্টিনোপলের প্রধান পোপের পদ লাভ করে। এই সময় সে নিজের মতবাদ প্রকাশ ও প্রচার করে। নাস্তুরিয়ুসের মূল বক্তব্য ছিল—ঈসা আলাইহিস সালাম মানবিক ও ঐশ্বরিক বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত। তিনি ইলাহ নন। বরং ঐশী নির্দেশ এবং মানবিক দেহ—এই দুয়ের সমন্বয়ে তার অস্তিত্ব। কারণ, একজন ব্যক্তি একই সাথে মানুষ ও ঈশ্বর হতে পারে না। ঈসা মাসিহের মধ্যে মানবিক গুণাবলি পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান; সুতরাং তিনি ইলাহ হতে পারেন না। ইলাহের সাথে কেবল তার যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল। এই হিসেবে মারইয়ামকেও ঈশ্বর-মাতা বলা যাবে না। কারণ, মাসিহ একজন মানুষ। [*তাখজিল মিন হারফিত তাওরাতি ওয়াল ইনজিল*, ১/৪৮৬, সালিহ আল-জাফরি (৬৬৮ হি.), টীকা দ্রষ্টব্য]—নিরীক্ষক

৫৪. ইয়াকুবিয়া (Yakibiyah) : এই মতের অনুসারীদের বক্তব্য হলো, স্বয়ং মাসিহ হলেন ঈশ্বর। এদের একদলের মতে, আল্লাহর নির্দেশ রক্ত-মাংসে পরিণত হয়ে মাসিহ হয়েছে। আরেকদলের মতে, ঈশ্বর মানবরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। [*আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল*, ২/৩০-৩১, শাহরাস্তানি, মুয়াসসাসাতুল হালাবি]—নিরীক্ষক

৫৫. মুইনদের ইতিহাস জানতে দেখুন, *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, খ. ২, পৃ. ৭৩-১২৪।

সাবা সাম্রাজ্য (৮০০-১১৫ খ্রিষ্টপূর্ব)[৫৬]

সাবা সাম্রাজ্যের অবস্থান ছিল মুইন ও কাতাবানের মাঝামাঝি স্থানে। সাবায়িদের উৎপত্তি হয় উত্তর দিকের অঞ্চল থেকে। এ সিরীয়দের তাড়া খেয়ে খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ সালের দিকে তারা ইয়েমেনে চলে আসে। তখন তারা দুর্বল মুইনিদের ওপর চড়াও হয় এবং মুইনিদের অধীন অঞ্চলগুলোতে নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার করে। তারপর মুইনি সাম্রাজ্য ভেঙে দিয়ে নিজেরা সেটি অধিকার করে।

সাবায়িরা শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে সম্প্রসারমান আমিরি শাসন থেকে ধীরে ধীরে পৌরহিত্য, তারপর সাম্রাজ্যব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যায়। প্রথমে তারা সিরওয়াহ[৫৭] (Sirwah) শহরকে তাদের রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করে। তারপর মারিবে (Marib) স্থানান্তরিত হয়। এই অঞ্চলের উর্বরতা তাদের স্থিতিশীল জীবনযাপন করতে সহায়তা করে। বাণিজ্যিক বন্দরগুলো তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়িয়ে দেয়। সাবা সাম্রাজ্য তিনটি কারণে ধীরে ধীরে অধঃপতনের মুখে পতিত হয় :

এক. মিশরে টোলেমিক (Ptolemaic) রাজবংশের হাত ধরে বাণিজ্যিক রুট স্থলপথ থেকে জলপথে পরিবর্তিত হয় এবং তারা প্রাচ্যের বাণিজ্যকে একচেটিয়া দখলে নিয়ে নেয়।

দুই. মারিবের বাঁধ ভেঙে যায়, যা সেচব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত।

তিন. সাবার রাজারা বিভিন্ন রাজ্যকে সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে। তারা এসব রাজ্যের জায়গির ব্যবস্থা নিয়ে সংঘাতে জড়ায়। এই সংঘাত অভ্যুত্থান ও অস্থিতিশীল পরিবেশের উদ্ভব ঘটায়—যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে সাবা সাম্রাজ্যের শক্তি দুর্বল হতে থাকে। হিমইয়ার সাম্রাজ্যের রাইদানের অধিবাসীরা ছিল সমুদ্রোপোকূলবর্তী বাসিন্দা। শক্তিসামর্থ্যে পোক্ত হওয়ার পর তারা সাবায়ি সিংহাসন কেড়ে নেয়।

---

৫৬ সাবায়ি সাম্রাজ্যের ইতিহাস জানতে দেখুন, *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, খ. ২, পৃ. ২৫৮-৩৪৭।

৫৭. **সিরওয়াহ** (Sirwah) : যার শাব্দিক অর্থ হলো—দুর্গ বা প্রাসাদ। সিরওয়াহ মূলত একটি দুর্গের নাম। কথিত আছে, দুর্গটি সুলাইমান আলাইহিস সালামের নির্মাণ করা। এই দুর্গের নামে শহরটির নামকরণ করা হয়। ইয়েমেনের এই শহরটির অবস্থান মারিবের নিকটে। [মুজামুল বুলদান ৩/৪০২, ইয়াকুত হামাভি]—নিরীক্ষক

হিমইয়ারি সাম্রাজ্য (Himyarite Kingdom) [১১৫ খ্রিষ্টপূর্ব-৫২৫ খ্রিষ্টাব্দ][৫৮]

হিমইয়ারি সাম্রাজ্যের ইতিহাসকে দুটি যুগে ভাগ করা যায়। প্রথম যুগের (১১৫ খ্রিষ্টপূর্ব-৩০০ খ্রি.) রাজারা উপাধি ধারণ করত—'সাবা ও জি-রাইদানের সম্রাট।' কিন্তু দ্বিতীয় যুগের (৩০০-৫২৫ খ্রি.) রাজারা উপাধি ধারণ করত—'সাবা, জি-রাইদান ও হাদরামাউতের সম্রাট।' শেষ সাম্রাজ্যটিকে ততদিনে হিমইয়ারি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা হয়।

হিমইয়ার হলো দক্ষিণ আরবের প্রসিদ্ধ একটি গোত্র। তাদের সাম্রাজ্যের অবস্থান ছিল—সাবা ও লোহিত সাগর তীরের মাঝখানে। কাতাবানের অঞ্চলগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারপর তারা জি-রাইদান ও সাবা সাম্রাজ্য দখল করে নেয়। হিমইয়ারিরা তখন রাইদান শহরকে তাদের রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করে—যা পরবর্তী সময়ে জিফার নামে পরিচিতি লাভ করে।

হিমইয়ারিরা ব্যবসা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুইনি ও সাবায়িদের উত্তরাধিকারী ছিল। দেশ বিজয়ের প্রতি তারা বেশ গুরুত্ব দিত। তার পর ষষ্ঠ শতকের শুরুতে হিমইয়ারিরা দুর্বল হতে শুরু করে। দিনে দিনে তারা বহু অঞ্চলের কর্তৃত্ব হারাতে থাকে। বাইজেন্টাইনরা সেসব অঞ্চল দখল করে নেয়। হিমইয়ারিদের পতনের ফলে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, বাইজেন্টাইনরা তা পূরণ করে। পরে পারস্যশক্তি ইয়েমেনে প্রবেশ করলে তারা বাইজেন্টাইনদের থেকে হিমইয়ারের শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। তখন থেকে শুরু হয় বৃহৎ এই দুই সাম্রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। হাবশিদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর থেকে ইসলামের আগমন পর্যন্ত ইয়েমেন পারস্য শক্তির অধীন ছিল।

পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অবস্থা

পৃথিবীকে তখন নেতৃত্ব দিয়েছে দুটি বৃহৎ পরাশক্তি—পারস্য সাম্রাজ্য এবং পূর্ব রোম (বাইজেন্টাইন) সাম্রাজ্য। দীর্ঘকাল থেকে পারস্যের লোকেরা প্রাচ্যসভ্যতাকে আকণ্ঠ পান করে নিয়েছিল। তাদের কবিতা, প্রবাদ-প্রবচন, বাণী চিরন্তনী, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আকিদা তারা গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিল। যার প্রমাণ—পারস্যের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের ওপর এর প্রভাব

---

[৫৮]. হিমইয়ারিদের সম্পর্কে জানতে দেখুন– আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম : খ. ২, পৃ. ৫১০-৫৯৮।

পরিলক্ষিত হয়েছে। পরবর্তীকালেও অনেকেই তাদের আকিদা ও আচার-আনুষ্ঠানিকতা ত্যাগ করতে পারেনি।[৫৯] তাই তারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বহুল ধর্মীয় মতাদর্শ ও ধর্মদর্শনের বিরোধের ফলে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল। যেসব ধর্মীয় মতাদর্শ পারস্যের ইতিহাসে প্রভাব ফেলেছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো, জরথুষ্ট্রবাদ (Zoroastrianism), মনুইজম (Manichaeism) ও মাজদাকিজম (Mazdakism)।

পারস্যরাজ কিসরা কর্তৃক কোনো একটি মতাদর্শের প্রচার সেই মতাদর্শের অনুসারীকে বিরোধীদের সাথে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিত। এই হানাহানি পারস্যের দেশগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। দেশগুলোকে তীব্র সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করেছিল। এই ধর্মীয় মতাদর্শগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কিছু মূলনীতি নিয়ে সংক্ষেপে আমরা আলোকপাত করব।

জরথুষ্ট্র পৌত্তলিকতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অগ্নিপূজারি ধর্মবিশ্বাসকে পবিত্র করার দায়িত্ব নেয় এবং একে নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে ঢেলে সাজায়।[৬০] তার দর্শনের মূলকথা ছিল—পৃথিবীর দুইটি উৎস বা শক্তি আছে। ভালো ও মন্দ। এ দুটি সর্বদা বিরোধে লিপ্ত থাকে। সবশেষে বিজয় হবে ভালোর আত্মার। মন্দের আত্মাকে পরাজিত করার জন্য মানুষ কর্মের পেছনে যত প্রচেষ্টা ব্যয় করে, এর মাধ্যমে আর এই বিজয় অর্জিত হয়। এজন্য জরথুষ্ট্র তার ধর্মের অনুসারীদের কর্মের প্রতি উৎসাহ দিত।[৬১]

ভালো-মন্দ এবং এ দুটিকে একত্রিত করার ব্যাপারে মনু জরথুষ্ট্রের শিক্ষার সাথে মতবিরোধ করে। সে তার অনুসারীদের উপবাস ও সন্ন্যাসব্রতের উপদেশ দেয়। প্রশংসনীয় গুণাবলি অর্জনের দাওয়াত দেয়। যেমন : নামাজ, জাকাত ইত্যাদি পালন। মিথ্যাচার, খুন, চুরি পরিহার করতে বলে। কারণ, সচ্চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষ মন্দ থেকে মুক্তি লাভ করে।[৬২]

জরথুষ্ট্র ও মনু উভয়ের শিক্ষার সঙ্গে মতবিরোধ করে মাজদাক। আলো-আঁধার ও ভালো-মন্দের কথা সেও বলে। তবে তার প্রসিদ্ধ শিক্ষা ছিল—সমাজতন্ত্র। সে নারী ও সম্পদ সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এসব

---

৫৯. *ফজরুল ইসলাম*, আহমাদ আমিন, পৃ. ৯৮।

৬০. *আল্লাহ জাল্লা জালালুহু*, আব্বাস আল-আক্কাদ, পৃ. ১০১; *ইরান ফি আহদিস সাসানিয়্যিন*, আর্থার ক্রিস্টেনসেন, পৃ. ২০।

৬১. *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল*, শাহরাস্তানি, খ. ২, পৃ. ৪২; *ফজরুল ইসলাম*, পৃ. ১০২।

৬২. *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল*, খ. ২, পৃ. ৫২-৫৩।

ভোগ করার ক্ষেত্রে সবাই সমানভাবে অংশীদার হবে। পানি, আগুন, ঘাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেমন হয়।[৬৩]

মাজদাকের এই আহ্বান বেশ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। মানুষজন তার অনুসরণ করতে শুরু করে। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত লোকজন। বৃহৎ অংশের লোকজন এদের নিয়ে বিপাকে পড়ে। তারা দলে শক্তিশালী হয়ে উঠলে অন্যের ঘরবাড়িতে হামলা করত। বাড়ির লোকদের পরাস্ত করে ঘরবাড়ি, নারী ও সম্পদ—সব দখল করে নিত। তাদের ত্রাস থেকে নিরাপদ থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এভাবে কিছুদিন যেতে-না-যেতে অবস্থা দাঁড়াল এই—পিতা তার সন্তানকে চিনতে পারছে না। সন্তান তার পিতাকে চিনতে পারছে না। মানুষ নিজের উপার্জিত কোনো কিছুর মালিক হতে পারছে না।[৬৪]

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। শাসনব্যবস্থা ছিল ব্যক্তিতান্ত্রিক। সম্রাটদের পবিত্র সত্য উপাস্য আছেন—এই দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের ওপর শাসনব্যবস্থা দাঁড়িয়ে ছিল।[৬৫]

এভাবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিভেদের এক গভীর খাদ তৈরি হতে থাকে। তার কারণ, সমাজের উঁচু শ্রেণির লোকেরা নানাবিধ বিশেষ সুবিধা ভোগ করত বলে।[৬৬]

স্বেচ্ছাচারী এই শাসনব্যবস্থার পতনের কারণ হয়েছিল তাদের অন্যায় জুলুম বা আচরণ। পরিস্থিতির এই অধঃপতন আরও বাড়ায় বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তুমুল যুদ্ধগুলো। অপরদিকে সাম্রাজ্যের সার্বিক সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে আঁ-নওশেরোয়া যেসব কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল, সেগুলোও বিশেষ কোনো ফল বয়ে আনেনি।[৬৭]

ফলে পারস্য সাম্রাজ্য আরও দুর্বল হতে থাকে। অক্ষমতা তাদের জেঁকে বসে। ইসলামের বিজয়ের পূর্বপর্যন্ত তাদের অবস্থা এমনই ছিল।

অপরদিকে রোম বাইজেন্টাইনরা পাশ্চাত্য সভ্যতার উত্তরাধিকার লাভ করে—যাতে ঝাঁজালো সভ্যতার উপাদান রয়েছে। কিন্তু তারাও ডুবে ছিল

---

[৬৩]. *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল*, খ. ২, পৃ. ৫৪।
[৬৪]. *তারিখে তাবারি*, খ. ২, পৃ. ৯২-৯৩।
[৬৫]. *মাযা খাসিরাল আলাম বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, আবুল হাসান আলি নদভি, পৃ. ৪০।
[৬৬]. *ইরান ফি আহদিস সাসানিয়্যিন*, পৃ. ৮৬-৮৭, ১০৭।
[৬৭]. *তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৯৯; *ইরান ফি আহদিস সাসানিয়্যিন*, পৃ. ৩৫০-৩৫১।

ধর্মীয় মতাদর্শগত বিবাদে। তাদের প্রসিদ্ধ তিনটি দল হলো : ইয়াকুবিয়া, নাসতুরিয়া, মুলকানিয়া[৬৮]।

এই দলগুলো খ্রিষ্টীয় আকিদার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও পরিপুষ্ট করার জন্য গ্রিক দর্শনের সাহায্য নেয়। আরও সহজ করে বললে—মসিহের প্রকৃতি সম্পর্কে তারা গ্রিক দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করে।[৬৯] মুলকানি মতাদর্শ লালনকারী সাম্রাজ্যটি তাদের মতাদর্শের বাইরে যারা গিয়েছে, তাদের ওপর বিভিন্ন প্রকার চাপ প্রয়োগ করে। তখনই ফেতনা সৃষ্টি হয় এবং সড়কে সড়কে অকারণে রক্তের বন্যা বয়ে যায়। পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তোলে রোমের বাসিন্দাদের জাতিভিন্নতা। সম্রাট হিরাক্লিয়াস হানাহানিতে লিপ্ত এসব মতাদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও ঐক্য তৈরির চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার এসব চেষ্টা রক্তবন্যার মোকাবেলায় বিশেষ কোনো বাঁধ তৈরি করতে সক্ষম হয়নি।

এমন ধর্মীয় বিরোধের পাশাপাশি রোমের শাসনব্যবস্থা ছিল ব্যক্তিতান্ত্রিক। সম্রাট সবগুলো প্রদেশ তার হাতের মুঠোয় করে রেখেছিল। সম্রাট তার প্রজাদের ওপর অসহনীয় কর চাপিয়ে দিয়েছিল। ফলে শাসন-ব্যবস্থাপনা মুখ থুবড়ে পড়েছিল। প্রশাসনে ঘুষের ছড়াছড়ি ছিল। এর ভেতর দিয়েও তারা বিরাট এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল—যার সর্বপ্রকার চাপ কোষাগারকে সহ্য করতে হতো। অন্যদিকে পারস্যের সঙ্গে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ তো অব্যাহত ছিলই।

এই অধঃপতিত পরিস্থিতি জনগণের মনে প্রচণ্ড অসন্তোষের জন্ম দেয়। তারা শাসকদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে মুক্তি কামনা করতে থাকে। বালাজুরি শাম অঞ্চলের জনগণের অবস্থা এভাবে তুলে ধরেছেন যে, তারা বাইজেন্টাইন শাসনকে ছুড়ে ফেলে মুসলিমদের বিজয় ও ন্যায়শাসনকে উদারচিত্তে স্বাগত জানিয়েছিল।[৭০]

---
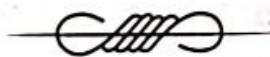
৬৮. **মুলকানিয়া :** রোমে আত্মপ্রকাশকারী খ্রিষ্টান যাজক মুলকার মতাদর্শকে মুলকানিয়া বলা হয়। রোমানদের অধিকাংশই মুলকানিয়া। এরা ত্রিত্ববাদের কথা বলে। মুলকানিয়াদের আকিদা হলো—মাসিহ আগাগোড়া মানুষ। আংশিক মানুষ, আংশিক ঈশ্বর—এমন নয়। তবে তিনি কদিম (অবিনশ্বর), তার আগমনও কদিম জগৎ থেকে। মারইয়াম আলাইহাস সালাম একজন অবিনশ্বর ঈশ্বরকে জন্ম দিয়েছেন। এজন্য তারা আল্লাহ তাআলা ও মাসিহ—উভয়কে একই সাথে পিতা ও পুত্র উভয়টিই বলে থাকে। তবে হত্যা ও শূলে চড়ানো ঈশ্বর ও মানুষ—উভয় সত্তার ওপর হয়েছে। [*আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল*, ২/২৭, শাহরাস্তানি, মুয়াসসাসাতুল হালাবি]—নিরীক্ষক

৬৯. *আল-জাওয়াবুস সাহিহ লিমান বাদ্দালা দিনাল মাসিহ*, তাকিয়ুদ্দিন ইবনু তাইমিয়াহ, খ. ৩, পৃ. ২২-৩৮।

৭০. *ফুতুহুল বল[illegible]* আবুল হাসান বালাযুরি, পৃ. ১৪৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নববি যুগ

মক্কা-পর্ব

নবুওয়তপূর্ব সময়

খ্রিষ্টীয় ৫৭১ সাল জাজিরাতুল আরবে দুটি বিখ্যাত ঘটনার সাক্ষী হয়। একটি হলো ইয়েমেনের শাসকগোষ্ঠী আহবাশ কর্তৃক কাবা ধ্বংসের লক্ষ্যে মক্কায় হামলা। অপরটি হলো নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মলাভ। আবরাহার হামলা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাজিরাতুল আরবের পরিবেশ ও বাসিন্দাদের ওপর একমাত্র প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা হিসেবে রয়ে যায় দ্বিতীয়টি।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ।[৭১] খ্রিষ্টীয় ৫৭১ সনের ২০ এপ্রিল। এ বছরটি 'আমুল ফিল' বা হস্তী ধ্বংসের বছর হিসেবে প্রসিদ্ধ।[৭২]

---

[৭১]. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মতারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের নিকট মতানৈক্য রয়েছে। নিশ্চিতভাবে রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখকে নির্ধারণ করার সুযোগ নেই। নবীজির জন্ম রবিউল আউয়াল মাসের কোনো এক সোমবারে হয়েছে—এটুকু হাদিস ও ইতিহাসের আলোকে প্রমাণিত। ইতিহাসবিদ এবং আলেমগণ সকলে এ বিষয়ে একমত। [*আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ২/২৮২, ইবনে কাসির]

ইতিহাসে নবীজির জন্মতারিখ নিয়ে অনেকগুলো তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায়। ২, ৮, ১০ ও ১২ রবিউল আউয়াল, ইত্যাদি। বিভিন্ন মতের পক্ষে বিভিন্ন ইমামের পক্ষাবলম্বন থাকায় কোনোটাকেই প্রাধান্য দেওয়া যায় না। উপরন্তু, ইসলামে নবীজির জন্মতারিখ সংরক্ষণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বও দেওয়া হয়নি। ফলে, নির্দিষ্ট দিন-তারিখ সংরক্ষিত হয়নি। তবে, বছর ও মাস সংরক্ষিত আছে। বারের বিবরণও পাওয়া যায়।

ইতিহাসবিদ হাফেজ ইবনে কাসির রহ. লেখেন, "ইবনে ইসহাক রহ বলেন, নবীজির জন্ম 'আমুল ফিল' বা হস্তিবর্ষে হয়েছে; সকলের নিকট এটাই প্রসিদ্ধ বক্তব্য। ইবরাহিম ইবনে মুনযির বলেন, নবীজির জন্ম যে হস্তিবর্ষে হয়েছে—এ বিষয়ে কোনো আলেম সন্দেহ পোষণ করেন না।" [*আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ২/২৮৩]

সুতরাং এখানে উল্লিখিত তারিখটিকে সম্ভাব্য তারিখের চেয়ে বেশি কিছু ভাবার সুযোগ নেই। সুনিশ্চিত কেবল এটুকু যে—হস্তিবর্ষের রবিউল আউয়াল মাসের কোনো এক সোমবারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন।—নিরীক্ষক

[৭২]. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ইবনু সাদ, খ. ১, পৃ. ১০০-১০১; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ১, পৃ. ১৮১।

নবীজির পিতা-মাতা আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ না হলেও সম্মান ও বংশমর্যাদায় সমৃদ্ধ ছিলেন। নবীজির পিতা আবদুল্লাহর বংশধারা যুক্ত হয় আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কাবের সাথে। অপরদিকে মা আমিনার বংশলতিকা হলো, আমিনা বিনতে ওয়াহব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কাব।[৭৩]

নবীজি যখন মায়ের গর্ভে, তখন তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। তাঁর লালনপালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন দাদা আবদুল মুত্তালিব। তারপর ছয় বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন নবীজির আম্মাজান। ঠিক দুবছর পর দাদাও চলে যান পরপারে। তখন তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন চাচা আবু তালিব।[৭৪]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের প্রথম দিনগুলো অতিবাহিত করেন হতদরিদ্র অবস্থায়। ছোটবেলায় তাঁকে চাচাতো ভাইদের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে। নবীজি মেষ চরাতেন। যুবক বয়সে অন্যের সম্পদ নিয়ে ব্যাবসায়িক সফর করেছেন। তখন মক্কার সম্ভ্রান্ত নারী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের পণ্য নিয়েও ব্যবসা করেছেন।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব, উত্তম চরিত্র ও শ্রেষ্ঠ বংশমর্যাদা—ইত্যাকার গুণে গুণান্বিত ছিলেন—যার দরুন তিনি ছিলেন তাঁর কওমের কাছে সবার চেয়ে উত্তম প্রতিবেশী, সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ও আমানতদার এবং সকলের চেয়ে সত্যবাদী। একজন পুরুষকে কলুষিত করে এমন সব আবিলতা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। এসব কারণে তাঁর উপাধি পড়ে গিয়েছিল—'আল-আমিন' বা বিশ্বস্ত ও আমানতদার ব্যক্তি।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তপূর্ব জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ঘটনা ছিল খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযি.-কে বিয়ে করা।[৭৫]

এই সম্ভ্রান্ত নারীকে উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল নবীজির আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, নিষ্ঠা ও চরিত্র মাধুর্য। নবীজির সঙ্গে ব্যাবসায়িক লেনদেন করে তিনি এই গুণগুলো অর্জন করতে ও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এরপর নবীজি আর কোনো প্রয়োজনে রিজিকের সন্ধান

---

[৭৩]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ১, পৃ. ১৭৮-১৭৯।

[৭৪]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ১, পৃ. ১৮০-১৮২, ১৯৫, ২০৪।

[৭৫]. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ইবনু সাদ, খ. ১, পৃ. ১৩১।

করেননি। দারিদ্র্যের ভয়ও করেননি। নতুন জীবন তাঁকে কুরাইশদের জীবনব্যবস্থা ও চারপাশের পৃথিবী নিয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে থাকার সুযোগ করে দেয়। নবীজি নীরবতা, স্থৈর্য ও মানুষের কোলাহল পরিহার করার দিকে ঝুঁকতে শুরু করেন। নবীজির জীবনের এই পর্যায়টি কুরাইশ সমাজে প্রচলিত সমস্ত রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে অভিহিত হয়। বেড়ে উঠেছেন শিরকের আঁতুড়ঘরে, কিন্তু শিরক তাঁকে ছুঁতেও পারেনি। তিনি নবুওয়তপ্রাপ্তি-পূর্ব সময়েও মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করেননি। উপরন্তু সারা জীবন একে ঘৃণা করেছেন।

যে-পবিত্র ঘরের প্রতিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছেন, সে-ঘর ও তাঁর চারপাশের বিস্তৃত পৃথিবীর মাঝের খাদটা ছিল গভীর। সেই পবিত্র ঘর ও চারপাশের পৃথিবীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল প্রকট। যে-দ্বন্দ্ব জীবনকে প্রভাবিত করতে চায়। ফলে তিনি নির্জনতা ও ভাবনার পরিবেশ বেছে নেন।

সমাজে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা যাচাইয়ের প্রথম সুযোগ[৭৬] আসে যখন কুরাইশরা কাবা পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়।[৭৭] সেদিন তিনি রক্তপাত থামিয়ে ন্যায়ের ফয়সালা করেন। সকল গোত্রের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাঙ্ক্ষিত মর্যাদার জায়গাটি নিশ্চিত করে নেন। তাঁর কওমের লোকেরা স্বীকার করে নেয় যে, তিনি ইনসাফকারী এবং দয়া ও শান্তির পথের আহ্বানকারী।

---

৭৬. নবীজির বয়স যখন ৩৫ বছর, কুরাইশরা তখন কাবা পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। কাবার দরজা অতি উঁচুতে হওয়া, ছাদবিহীন ঘরে চুরি হওয়া এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া—অনেকগুলো কারণ মিলিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল নিজ নিজ হালাল অর্থ দিয়ে কাবা নির্মাণে শরিক হয়। প্রত্যেক গোত্রকে কাবার বিভিন্ন অংশের নির্মাণ কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়। বিপত্তি বাধে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে। সম্মানজনক এই কাজ নিয়ে যখন হারামের ভেতর যুদ্ধের উপক্রম হয়, তখন আবু উমাইয়া ইবনুল মুগিরা মাখযুমি একটি প্রস্তাব পেশ করেন। পরবর্তী দিন সবার আগে যে কাবার দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে—সে-ই এই বিষয়ে ফয়সালা দেবে। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে আসেন। তাকে দেখে সকলে আস্থা ও স্বস্তি লাভ করে।

নবীজি ফয়সালা করেন এভাবে—একটি চাদরের মাঝখানে পাথরটিকে রাখেন। বিবদমান সকল গোত্রপ্রধানকে সেই চাদরের চতুর্দিকে ধরতে বলেন। সবাই ধরে পাথরটিকে যথাস্থানে নিয়ে যায়। এরপর নবীজি নিজ হাতে স্থাপন করেন। এই ফয়সালায় সকল গোত্রই সন্তুষ্ট হয়; সম্ভাব্য রক্তপাতও থেমে যায়।

[বিস্তারিত জানতে দেখুন, *আর-রাহিকুল মাখতুম*, পৃ. ৬১-৬২]—নিরীক্ষক

৭৭. ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেখুন, *আস-সিরাতু নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ১, পৃ. ২২১-২২৮।

নবুওয়তলাভ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স চল্লিশের কোঠায় পৌঁছলে তাঁর নির্জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পায়। মক্কার নিকটবর্তী হেরা গুহায় তিনি চলে যেতেন ইবাদত ও গভীর ভাবনায় মগ্ন হওয়ার জন্য। যেখানে মক্কার জীবনের কোলাহল ছিল না। এর কারণ ছিল—মানুষের চারিত্রিক অধঃপতন দেখে তিনি মারাত্মক একাকিত্ব বোধ করছিলেন। এর থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ তাআলার ঘনিষ্ঠতা অর্জন এবং হেদায়েত লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে।[৭৮]

অবশেষে আল্লাহ তাআলা নবীজিকে সম্মানিত করতে চাইলেন এবং তাঁর মাধ্যমে বান্দাদের প্রতি দয়া করতে চাইলেন। ইতোমধ্যে আল্লাহ তাআলা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়ত ও ওহি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে নেন। সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে প্রথম ওহির ধারা আরম্ভ হয়। ঐশী কালাম গ্রহণের এটিই ছিল সূচনা পদক্ষেপ। তারপর সরাসরি ওহি অবতীর্ণ হয়।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে প্রথম ঈমান আনেন তাঁর স্ত্রী খাদিজা রাযি.। তারপর ধীরে ধীরে দাওয়াত ছড়াতে থাকে। মক্কার অল্পকিছু সদস্য নতুন ধর্মে প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে একজন হলেন আলি ইবনে আবি তালিব রাযি.। আলি রাযি. তখনো বেশ ছোট ছিলেন। বয়স ১০ পেরোয়নি।[৭৯]

অন্যরা হলেন—আবু বকর সিদ্দিক, নবীজির আজাদকৃত গোলাম যায়েদ ইবনে হারিসা, উসমান ইবনে আফফান, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.।[৮০]

একইভাবে নারীদের মধ্যেও ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো—যারা ঈমান এনেছেন, তারা ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণি ও বয়সের। অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র ও দুর্বল। কারণ, তারা ইসলামের প্রাথমিক বিষয়াদিকে মানবিক ফিতরাতের কাছাকাছি দেখে আগ্রহ নিয়ে দ্বীন গ্রহণে এগিয়ে এসেছেন। এগুলো তাদের অন্তরে আশার সঞ্চার

---

[৭৮]. *তাফসিরুল কুরআনিল হাকিম*, শায়েখ রশিদ রিযা, খ. ১১, পৃ. ১৯৩।

[৭৯]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ১, পৃ. ২৮৪।

[৮০]. প্রথম প্রজন্মের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানতে দেখুন, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ১, পৃ. ২৮৭-২৯৪।

করে। কারণ, ইসলাম সমতার দাওয়াত দেয়। দাসদেরকে স্বাধীনতার অধিকার দিতে বলে। প্রয়োজনগ্রস্তকে সহযোগিতা করতে বলে।

ইসলামি দাওয়াতের শুরুর দিকের বাধাগুলো বোঝার জন্য মুসলিমদের প্রথম প্রজন্মকে সামাজিক অবস্থান হিসেবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

প্রথম দলে আছেন—ধনী পরিবারের তরুণ ও নওজোয়ান সন্তানেরা, যাদের পরিবার মক্কার সমাজে বিশাল সম্মান পেয়ে অভ্যস্ত। এই দলের সর্বোত্তম উদাহরণ হলেন, খালিদ ইবনে সাইদ ইবনুল আস রাযি.। এই পরিবারগুলো তাদের গোষ্ঠীর মর্যাদা নিরূপণের ক্ষেত্রে সমাজে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ছিল। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, যেসব লোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতার নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা সবাই এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দ্বিতীয় দলে আছেন, অন্যান্য পরিবারের সন্তানেরা। যাদের বংশধারা দুর্বল গোষ্ঠীগুলোর দিকে সম্পৃক্ত। যেমন : বনু হারিস ইবনে ফিহর, বনু উমাইর। এই দুই দলের মধ্যে বড় কোনো পার্থক্য পাওয়া যায় না।

তৃতীয় দলে আছেন, ওইসব লোক, যারা মক্কার সমাজের কোনো গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত নন। তারা গোত্রীয় নিয়মের আওতার বাইরে। নামকাওয়াস্তে কোনো কোনো গোষ্ঠীর দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করে থাকেন। এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন 'মুস্তাজআফিন' বা দুর্বল শ্রেণি। যেমন : সুহাইব রুমি, আম্মার ইবনে ইয়াসির, বেলাল হাবশি প্রমুখ রাযি.।

তিন বছর পর্যন্ত দাওয়াতের কাজ গোপন ছিল। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেন। তখন তাঁর কওম শত্রুতে পরিণত হয়। তারা তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর ইসলাম গ্রহণকারী অনুসারীদের নির্যাতন করে। তিনি নিজেও হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হন। সন্দেহ নেই—মক্কায় ইসলামের দাওয়াতের সূচনা কুরাইশদের উদ্‌বিগ্ন করে তুলেছিল। এমনকি তারা সার্বক্ষণিক অস্থিরতায় ভুগত। তারা তাদের বাণিজ্যিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক—সব ধরনের স্বার্থের বিষয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারীদের নির্যাতিত হতে দেখলেন। সে সময় তাঁর পক্ষে অনুসারীদের সহযোগিতা করা সম্ভব ছিল না। তাই ফেতনার আশঙ্কায় তাদের হাবশায় হিজরত করার নির্দেশনা দেওয়া

হয়। নির্দেশনা মোতাবেক ৮৩ জন মুসলিম নবুওয়তের সপ্তম বছর নাজাশির দেশে হিজরত করেন। তাদের সঙ্গে ১৮ জন নারীও ছিলেন।[৮১], [৮২]

এদিকে মক্কায় মুসলিমদের বলয় শক্তিশালী হতে শুরু করে। উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. নতুন ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে মুসলিমরা শক্তি লাভ করে।[৮৩]

উমর ছিলেন দৃঢ়চরিত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটিও ঘটেছিল উপযুক্ত সময়ে। তিনি যে তেজ নিয়ে ইসলামের বিরোধিতা করেছিলেন, সেই তেজ ইসলামের সেবায় প্রকাশ করেন।

বনু হাশিম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিবৃত্ত না করায় কুরাইশরা তাদের ভর্ৎসনা করে। তারপর কুরাইশের গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের আর্থ-সামাজিক বয়কট ও অবরোধের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়। এই অবরোধ দুই বছরের বেশি সময় ধরে বহাল থাকে।[৮৪], [৮৫]

---

[৮১]. হাবশায় প্রথম হিজরত সম্পর্কে জানতে দেখুন, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ২, পৃ. ৬৯-৭৬।

[৮২]. হাবশায় হিজরত মোট দুইবার হয়েছিল। লেখক এখানে শুধু দ্বিতীয় হিজরতের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমবার হিজরত হয় পঞ্চম হিজরিতে। উসমান রাযি.-এর নেতৃত্বে ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী হিজরত করেন। মুসলিম ইতিহাসের প্রথম হিজরতকারী এই দলে নবীকন্যা রুকাইয়া রাযি.-ও ছিলেন। [বিস্তারিত জানতে দেখুন, *আর-রাহিকুল মাখতুম*, পৃ. ৯১-৯২]—নিরীক্ষক

[৮৩]. *তারিখে তাবারি*, খ. ২, পৃ. ৩৩৫।

[৮৪]. বয়কট সম্পর্কে জানতে দেখুন, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ২, পৃ. ১০১-১০৩, ১২২-১২৫।

[৮৫]. অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে বড় বড় কিছু ঘটনা ঘটে। হযরত উমর রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেই প্রকাশ্য ঘোষণা দেন। হযরত হামজা রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেন। অপরদিকে বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের কাফির-মুসলিম সকলে মিলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়—যেকোনো মূল্যে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তা বিধান করবে। পরপর এই ঘটনাগুলো মুশরিকদের চিন্তায় ফেলে দেয়। তখন তারা অন্য গোত্রদের নিয়ে অবরোধনামা তৈরি করে।

সপ্তম থেকে দশম—নবুওয়তের এই তিন বছরব্যাপী মুসলিমদের ওপর অবরোধ জারি থাকে। অবরোধের এই চুক্তিনামার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ—বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের কারও সাথে কেউ কেনাবেচা করতে পারবে না, বিয়েশাদি করাতে পারবে না, ওঠাবসা করতে পারবে না, চলাফেরা করতে পারবে না, তাদের ঘরবাড়িতে যেতে পারবে না; এমনকি কথাবার্তাও বলতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে না দেবে, ততদিন এই অবরোধ চলমান থাকবে।

অবস্থা বেগতিক দেখে আবু তালিব সবাইকে নিয়ে গিরিখাদে চলে যান। রাতের বেলা নিরাপত্তার জন্য নবীজির বিছানায় অন্য কাউকে শুতে বলতেন। এভাবে তিন বছর মানবেতর জীবনযাপন

কিন্তু এই অবরোধ মক্কার ইসলামবিরোধী লোকদের পক্ষে ইতিবাচক কোনো ফলাফল বয়ে আনেনি। অবরোধের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের মৌসুমে মক্কায় আগমনকারী বিভিন্ন গোত্রকে উঁচু মনোবল নিয়ে দাওয়াত দিতেন।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় হিজরত

অবশেষে এলো প্রতীক্ষিত সময়। পাওয়া গেল ইসলামি আকিদা বিকশিত হবার উর্বর পলিমাটি। ইয়াসরিবের সমাজ তখন এক ভঙ্গুর অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। যুদ্ধের আগুন তাদের তছনছ করে দিয়েছে। গোত্রের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অস্থির অবস্থা তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে না। এজন্য প্রয়োজন আকিদা, বোঝাপড়া, গঠনপ্রক্রিয়া ও জীবনধারণ—সবকিছুর মৌলনীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করা। দীর্ঘকাল ইয়াসরিব এই পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় ছিল। অবশেষে তা খুঁজে পায় ইসলামের দাওয়াতের নীতিমালায়। যার দরুন, কোনো সংশয় ছাড়াই ইয়াসরিব সাড়া দেয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে।

আরবের এই সমাজটি আউস ও খাযরাজ দুটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। মূলত তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অপরদিকে ইহুদিরা বড় বড় তিনটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। বনু কাইনুকা, বনু নাযির ও বনু কুরাইযা। আরও কিছু অপ্রধান গোত্র ছিল। সন্দেহ নেই—এই জাতিভিন্নতা ইসলামি আকিদা প্রচারের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে ইহুদি জাতি তাদের মজ্জাগত চরিত্র অনুযায়ী নিজেদের দখল পোক্ত করার জন্য আরবদের মধ্যে বিভক্তি তৈরির রাজনীতি বেছে নিয়েছিল।

ইয়াসরিবে আউস ও খাযরাজের মধ্যে ইসলাম প্রসার লাভ করে দুই বাইআতুল আকাবার পর।[৮৬], [৮৭]

করার পর হিশাম ইবনে আমর, মুতইম ইবনে আদি, আবুল বাখতারি ও যামআ ইবনুল আসওয়াদের উদ্যোগে এই চুক্তিনামা ভঙ্গ করা হয়। [বিস্তারিত জানতে দেখুন, *আর-রাহিকুল মাখতুম*, পৃ. ১০৯-১১২]—নিরীক্ষক

৮৬. প্রাগুক্ত : খ. ২, পৃ. ১৭৬-২১০।

৮৭. 'বাইআতুল আকাবা' বা গিরিপথের বাইআত। মোট দুইবার বাইআতুল আকাবা অনুষ্ঠিত হয়।
প্রথম বাইআতুল আকাবা : নবুওয়তের একাদশ বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার হাজিদের ইসলামের দাওয়াত দেন। তাদের কাছ থেকে মদিনায় ইসলাম প্রচারের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। এর প্রেক্ষিতে দ্বাদশ বছর হজের মৌসুমে আউস ও খাযরাজ গোত্রের

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারীদের সেখানে হিজরতের পরামর্শ দেন। তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে হিজরতের অনুমতি দেন। নবীজি আবু বকর রাযি.-কে সঙ্গে নিয়ে ইয়াসরিবের উদ্দেশে রওনা দেন। সেখানে পৌঁছেন সোমবারে (রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ/৬২২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখ)। মুসলিমদের আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে নবীজি ইয়াসরিবে প্রবেশ করেন।[৮৮] ইয়াসরিবের নাম বদলে নতুন নাম হয়—মদিনাতু রাসুলিল্লাহ বা মদিনা মুনাওয়ারা।

ইয়াসরিবে তাঁর হিজরতের আগের ও পরের দুটি যুগের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করে দিয়েছে। প্রত্যেক যুগের আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে। যুগের সেই বৈশিষ্ট্যের

---

১২ জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে নবীজির সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। মিনার নিকটবর্তী এক গিরিপথে দাঁড়িয়ে নবীজি তাদের সাথে কথা বলেন এবং বাইআত গ্রহণ করেন। এই ১২ জনের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন গত বছরের সাক্ষাৎকারী। নবীজি তাদের কাছ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়ে বাইআত গ্রহণ করেন—তারা শিরক করবে না, চুরি ও জিনা করবে না, সন্তানদের হত্যা করবে না এবং মিথ্যা অপবাদ দেবে না; সর্বোপরি নবীজির কোনো নির্দেশ লঙ্ঘন করবে না।

দ্বিতীয় বাইআতুল আকাবা : প্রথম বাইআতের পর মদিনায় ইসলাম প্রচারের জন্য নবীজি মক্কা থেকে প্রতিনিধি হিসেবে মুসআব ইবনে উমাইর রাযি.-কে পাঠান। হযরত মুসআবের দাওয়াত ও মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতায় মদিনায় ব্যাপকভাবে ইসলামের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়।

ত্রয়োদশ বছর হজের মৌসুমে সত্তরের বেশি মুসলিম নবীজির হাতে বাইআত হতে আসেন। পূর্ব নির্ধারিত আকাবায় তাদের সাথে নবীজি সাক্ষাৎ করেন। ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী—সংখ্যা নিয়ে কিছুটা মতভেদ থাকলেও ৭০ জনের বেশি; এই প্রসঙ্গে সবাই একমত। এই বাইআত মদিনায় হিজরতের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। মদিনাবাসীও নবীজিকে পেতে উন্মুখ হয়ে থাকেন।

নিম্নোক্ত বিষয়ে নবীজি তাদের বাইআত করেন। **ক.** সবসময় নবীজির আনুগত্য করবে। **খ.** সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় দ্বীনের জন্য অর্থ খরচ করবে। **গ.** ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান করবে। **ঘ.** আল্লাহর পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না। **ঙ.** এবং নবীজি মদিনায় গেলে নিজ জান-মালের মতো তাকে নিরাপত্তা প্রদান করবে।

মদিনাবাসী সন্তুষ্টচিত্তে সাগ্রহে উপর্যুক্ত সবগুলো বিষয়ে নবীজির হাতে বাইআত হন। এর মাধ্যমে দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা আউস-খাযরাজের দ্বন্দ্বও ঘুচে যেতে থাকে।

উভয় গোত্র থেকে মোট ১২ জন নকিব বা প্রধান নির্ধারণ করা হয়। যারা নিজ নিজ গোত্রে এই বাইআত বাস্তবায়নের দায়িত্বশীল হবেন। খাযরাজ থেকে নয়জন এবং আউস থেকে তিনজন নির্ধারণ করা হয়।

নকিবগণ হলেন যথাক্রমে, ১. আসআদ ইবনে যুরারা। ২. সাদ ইবনুর রবি। ৩. আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। ৪. রাফে ইবনে মালেক। ৫. বারা ইবনে মারুর। ৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর। ৭. উবাদা ইবনুস সামিত। ৮. সাদ ইবনে উবাদা। ৯. মুনযির ইবনে আমর। ১০. উসাইদ ইবনে হুযাইর। ১১. সাদ ইবনে খাইসামা। ১২. রিফাআ ইবনে আবদুল মুনযির। রাযিয়াল্লাহু আনহুম। [বিস্তারিত জানতে দেখুন, *আর-রাহিকুল মাখতুম*, পৃ ১৪৩-১৫৪]—নিরীক্ষক

৮৮. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ইবনু সাদ, পৃ. ১, পৃ. ২৩৪; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ২, পৃ. ২৩৬; *তারিখে তাবারি*, খ. ২, পৃ. ৩৮৮, ৩৯২; *আর-রাওযুল উনুফ*, সুহাইলি, খ. ২, পৃ. ২৪৫।

সাথে সংগতি রেখে দাওয়াতের পন্থা ও বিধান প্রণীত হয়ে থাকে। মক্কি যুগ শেষ হবার পর হিজরত ছিল ইসলামের এক নতুন যুগের সূচনা। যেখানে কর্মপন্থা, শাসনব্যবস্থা, শরিয়ত বা বিধান প্রবর্তন এবং লক্ষ্য ঠিক রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ—সবকিছু নতুন ধরনের, আলাদা বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত।

মক্কি দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য

কুরআনুল কারিম মক্কি সুরাগুলোতে আকিদাগত বিশৃঙ্খলার প্রতিকার বিধান করেছে। কেননা, আকিদা হলো একটি নতুন ধর্মের প্রধান বিষয়। মৌলিক আকিদা হিসেবে যেগুলো সামনে আসে তা হলো—প্রভুত্ব, দাসত্ব এবং এ দুয়ের মধ্যকার সম্পর্ক। কারণ, পৌত্তলিকতাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেখানে। দিনের পর দিন তা বাড়তেই থাকবে। সুতরাং প্রতিমাপূজা ও বহু উপাস্য-ধারণা ও বিশ্বাসকে শক্তভাবে প্রতিহত করতে হবে। মক্কি সুরার আয়াতগুলো নাজিল হয়ে প্রথমে পৌত্তলিকতা ও তা নির্মূলের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে এবং এর পরপর বহু উপাস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। একই সঙ্গে এই সময়ের আয়াতগুলো খালেক ও কাহহার আল্লাহর জন্য একত্ববাদ সাব্যস্ত করে।

মক্কার দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল আখেরাতের পুনরুত্থান এবং প্রতিদানের আকিদা। পুনরুত্থান হলো পুনরায় পূর্বের জীবন দান। আর প্রতিদান হলো প্রথম জীবনের আবশ্যকীয় ফলাফল। মক্কার কিছু লোক পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করত—যেদিন আল্লাহ তাআলা বান্দাদের নতুন করে জীবন দান করবেন। তখন কুরআন শেষ দিবসের বাস্তবতা প্রমাণ করে—যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মের প্রতিদান লাভ করবে। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে কুরআন কাফিরদের দৃষ্টিভঙ্গি বাতিল প্রতিপন্ন করেছে।

মক্কায় নাজিলকৃত কুরআনের আয়াতগুলো ইবাদতকে চিত্রিত করেছে এভাবে—এমন এক আমল, যা মাখলুককে খালেকের সঙ্গে জুড়ে দেয়। বান্দাকে ভালো কাজের দিকে ফেরায়।

আকিদা সংশোধনের ফাঁকে ফাঁকে মক্কি আয়াতগুলো ভালো আমল ও স্বভাব বলে দিয়েছে, যেগুলো বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য পাইয়ে দেবে। আখলাক, মানুষের সাথে মুয়ামালাত, পারস্পরিক সহমর্মিতা, যথাসম্ভব অন্যকে ক্ষমা করে দেওয়া, নিজে সংশোধিত হওয়া, ধৈর্যধারণ করা এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও

হঠকারিতার মতো জঘন্য কুপ্রবৃত্তিকে পরাজিত করা—অধিকাংশ আয়াত ঘুরে ফিরে এই বিষয়গুলোর কথাই বলেছে।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৩ বছর মক্কায় শ্রম ব্যয় করেছেন দুটি উদ্দেশ্যে। মক্কার উর্বর জমিনে এই আকিদার চাষাবাদ করতে এবং মানুষের সমঝদারি ও বোধবুদ্ধি থেকে ভুল বোঝাপড়া দূরীভূত করতে।

* * *

মদিনা-পর্ব

ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি

মসজিদ নির্মাণ

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে মাদানিপর্ব শুরু হয় মদিনার উদ্যান কুবায় পৌছার মধ্য দিয়ে। হিজরত ছিল ইসলামের প্রথম আপন গৃহনির্মাণের সূচনা। অপরদিকে ইসলামি রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশের ঘোষণা। এজন্য নবীজির ওপর আবশ্যকীয় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়—মদিনার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা; যাতে করে ইসলামি রাষ্ট্রগঠনের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন। মদিনায় পৌছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম কর্মসূচি ছিল—মুসলিমদের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করা, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে অটুট ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দেওয়া এবং রাজনৈতিকভাবে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে শৃঙ্খলা বিধান করা।

শুরু থেকেই মসজিদটি বিস্তৃত ভূমির ওপর নির্মিত হয়েছিল। নবীজি যে-ঘরে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তার পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত একটি প্রাঙ্গণে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। কেবলা ছিল বাইতুল মাকদিসের দিকে। মুসলিমরা তীব্র রোদে পুড়ছেন দেখে নবীজি তাদের জন্য খেজুর ডাল দিয়ে ছাউনি তৈরি করে দেন।[৮৯]

নবীজি মদিনায় হিজরত করার পর থেকে ছয় বা সাত মাস পর্যন্ত মুসলিমরা বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামাজ পড়ত। তারপর বদর যুদ্ধের দুই মাস পূর্বে কেবলা কাবার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।[৯০]

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলার দিকে আরেকটি ছাউনি তৈরি করেন। ফলে মসজিদটির ছাউনিসংখ্যা দাঁড়ায় দুইয়ে। এ কারণে মসজিদটিকে 'মসজিদুল কিবলাতাইন' বা দুই কেবলার মসজিদ বলা হয়।[৯১]

---

[৮৯]. *ওয়াফাউল ওয়াফা বিআখবারিল মুস্তফা*, সামহুদি, খ. ১, পৃ. ২৩২-২৩৯।

[৯০]. সুরা বাকারা : আয়াত ১৪৪।

[৯১]. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ইবনু সাদ, খ. ১, পৃ. ২৪২; *ওয়াফাউল ওয়াফা বিআখবারিল মুস্তাফা*, সামহুদি, খ. ১, পৃ. ২৫৮।

ইসলামি সমাজগঠন ও মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে নবীজির মসজিদ প্রতিষ্ঠাকে গণ্য করা হয় প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে। মসজিদের অবস্থান ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক দফতরের।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি

মদিনায় আগমনের সময় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু শক্তিশালী অনুসারী তৈরি হয়। পাশাপাশি অনুসারীদের মধ্যে তাঁর একটি রাজনৈতিক অবস্থান তৈরি হয়। নবীজির মক্কার অনুসারীদের বলা হয় মুহাজির এবং মদিনাবাসী অনুসারীদের বলা হয় আনসার। ইসলামের বন্ধনের ভিত্তিতে নবীজি তাদের ঐক্যবদ্ধ করার পদক্ষেপ নেন।

প্রথমে আউস ও খাযরাজের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করেন। তাদের মনের ভেতর পুষে রাখা পুরোনো সব শত্রুতা দূর করেন। তারপর আনসার নামের অধীনে তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলেন। যারা নবীজিকে সাহায্য করেছে, ইসলামের দাওয়াতকে শক্তিশালী করেছে—তারাই আনসার। মুহাজিরদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করার জন্য মুহাজির-আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করার প্রতি মনোযোগ দেন। তারপর সকল মুসলিমের মধ্যে অধিকার, সমতা ও মৃত্যুর পর একে অপরের মিরাস পাবে—এই মর্মে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দেন। এই বন্ধন এতটাই দৃঢ় ছিল যে, ইসলামি ভ্রাতৃত্বের প্রভাব এ ক্ষেত্রে রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়ের চেয়ে বেশি ছিল।[৯২]

ইসলামি সমাজগঠন ও ইসলামি রাষ্ট্রনির্মাণের ক্ষেত্রে এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল দ্বিতীয় মৌলিক পদক্ষেপ, যার ওপর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ভর করেছিলেন। কারণ, যেকোনো রাষ্ট্রের উত্থান ও গঠন জাতির ঐক্যের ভিত ছাড়া সম্ভব হয় না।[৯৩]

সাংবিধানিক চুক্তিপত্র

যে-সকল অমুসলিমকে নিয়ে মাদানিসমাজ গঠিত হবে, তাদের ও মুসলিমদের মধ্যে একটি চুক্তিনামা লেখা হয়। নতুন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক মূল্য বিচারে এটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে

---

[৯২]. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ২৩৮; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবনু কাছির, খ. ৩, পৃ. ২২৬-২২৯।

[৯৩]. *ফিকহুস সিরাতিন নাবাবিয়্যাহ*, মুহাম্মাদ সাইদ রামাদান আল-বুতি, পৃ. ২১৯।

গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মদিনায় আগমনের পর প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে নবীজি একটি নতুন শৃঙ্খলাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতি মনোযোগ দেন। যা মদিনায় অবস্থানকারী মুসলিম, ইহুদি, মুশরিক—সকলকে ঐক্যের ছায়াতলে একত্র করবে। নবীজি তাঁর কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র ও মদিনাবাসীদের মধ্যকার সম্পর্কের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন। সেই রূপরেখাটিকে মৌল নীতিমালার মর্যাদা দেন; যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে সাংগঠনিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নীতিমালা-সহ ইসলামি রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তো, নবীজি মদিনাবাসীকে এক দৃঢ় ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেন। যে-বন্ধন নির্দিষ্ট সীমারেখার আওতায় প্রত্যেক নাগরিকের আকিদা ও আমলের স্বাধীনতা প্রদান করবে। সিরাতবিদ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এই চুক্তিপত্রের মূলভাষ্য উল্লেখ করেছেন। তবে কোন সূত্রে তিনি পেয়েছেন, তা উল্লেখ করেননি।[১৪]

চুক্তিপত্রের ভাষ্যটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

এক. মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী হবে—তা নির্ধারণ করে দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাতি ও গোত্রের ভেদাভেদ সত্ত্বেও সকল মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হন। তিনি ইসলামের বন্ধনের ভিত্তিতে তাদের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ গঠন করেন।

দুই. মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্কের ধরন কী হবে—তা নির্ধারণ করে দেন। বাস্তবতা হলো, উক্ত চুক্তিনামা সংখ্যালঘুতার দিকে লক্ষ করে তাদের অধিকারগুলো বিস্তারিত আকারে ব্যাখ্যা করে দেয়নি। অন্যান্য দলকে যেমন নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বহাল রাখার অনুমতি দিয়েছে, তাদেরও তা-ই দিয়েছে।

তিন. ইহুদিদের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে—তাও নির্ধারণ করে দেন। ইহুদিদের সাথে চুক্তিনামায় ছিল—সন্ধি ও শান্তিস্থাপন করতে হবে। জনস্বার্থের সীমারেখার মধ্যে থেকে স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম পালন করতে পারবে। পাশাপাশি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে। কুরাইশদের বিরুদ্ধবাদিতার মোকাবেলা করে মদিনাকে রক্ষা করতে হবে। মদিনায় আক্রমণকারী

---

১৪. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ২, পৃ. ২৪০-২৪২।

কোনো গোষ্ঠী ও শক্তিকে সহযোগিতা করা যাবে না। অথবা নবীজির অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধবাজ মুশরিকদের সাথে মিত্রচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যাবে না। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে।

চুক্তিনামা লেখা শেষ হওয়ার পর সকলে এর বিষয়বস্তুর ব্যাপারে একমত হয়। সব দল এতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিনামার বিষয় বাস্তবায়নে কাজ করবে—এই মর্মে মদিনাবাসীরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এর মাধ্যমে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধর্মীয় ও বিচার-বিভাগীয় কর্তৃত্ব নিজ অধিকারে সংরক্ষিত রাখেন। রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্ব মদিনাবাসী সকলের হাতে ন্যস্ত করেন। চুক্তিনামার ধারাগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেকে বিচারক এবং কেন্দ্রস্থল মনোনীত করেন। এইভাবে অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো সমাধা করার পরে তিনি বাইরের বিষয়ের দিকে পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ পান।

প্রথম দিকের গাযওয়া-সারিয়্যা[৯৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় হিজরত ছিল কুরাইশদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। মক্কার ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য শ্রেণি আশঙ্কা করছিল—মদিনার বাঁক পেরোবার সময় কুরাইশদের বাণিজ্য-কাফেলাকে ধাওয়া করতে তিনি তাঁর অনুসারী বাহিনী পাঠাতে পারেন। তারা নিজেদের লুণ্ঠিত সম্পদ এবং হিজরতের সময় ফেলে আসা সম্পদের বদলা চাইবে। এই তৎপরতা বাস্তবায়ন হলে কুরাইশদের বাণিজ্যিক খাতে এক বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসবে। এজন্য তারা মদিনার বড় বড় ইহুদি ব্যবসায়ী ও ধনীদের কাছে নিরাপত্তা-সহযোগিতা প্রার্থনা করে। শামে যাওয়া-আসা করে এমন কাফেলাগুলো মদিনার মরুপথ অতিক্রমকালে যেন তারা তাদের নিরাপত্তা বিধান করে।

এদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লোকদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছেন। কারণ, ইতোমধ্যেই আল্লাহ তাআলা আকিদা ও প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন।[৯৬]

---

৯৫. **গাযওয়া :** যে-অভিযানে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদদের সাথে রওনা হয়েছেন। **সারিয়্যা :** যে-অভিযানে স্বশরীরে নবীজি অংশগ্রহণ করেননি। অবশ্য কখনো কখনো সারিয়্যাকেও গাযওয়া বলা হয়। যেমন : গাযওয়া মুতা এবং গাযওয়া জাতুস সালাসিল।

৯৬. সুরা হজের ৩৯-৪০ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

প্রশিক্ষণ এবং মনোবল চাঙ্গা করার মাধ্যমে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হবার জন্য তাদের প্রস্তুত করছেন—যাতে করে সম্মুখ সমরে তারা পরাজিত না হন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের বাগডোর হাতে তুলে নেন। ব্যাবসায়িক কাফেলাকে ধাওয়া করার মাধ্যমে কুরাইশদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। কারণ, ব্যবসা ছিল কুরাইশদের জীবনধারণের প্রধান উপায় এবং তাদের শক্তির মূল উৎস। পাশাপাশি এই তৎপরতার আরেকটি লক্ষ্য ছিল—কুরাইশ ব্যতীত উদীয়মান রাষ্ট্রটির অন্য শত্রুদের সতর্ক করা। এই বার্তা দেওয়া— মুসলিমরা প্রতিরোধ করতে সক্ষম এবং তারা যেকোনো শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত।

হিজরতের পর প্রথম ১৮ মাসের ভেতরে মুসলিমরা চারটি গাযওয়া এবং তিনটি সারিয়্যা সম্পন্ন করেন।[৯৭]

এর মধ্যে ছয়টি অভিযান প্রেরণ করা হয় বাণিজ্যিক কাফেলা আক্রমণ করার জন্য। তুলনামূলকভাবে এগুলোর ফলাফল ছিল সীমিত। এই অভিযানগুলো মদিনার প্রতিবেশী বেদুইন গোত্রগুলোকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। তারা মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধি করতে উৎসাহিত হয়। অপরদিকে মুসলিমদের এই ধরনের সামরিক অভিযানগুলো সফল হবার জন্য এই বেদুইনদের সহযোগিতা জরুরি ছিল।

প্রথমে সশস্ত্র মোকাবেলা হয় আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ রাযি.-এর নেতৃত্বে প্রেরিত নয় সদস্যের মুসলিম বাহিনী এবং মক্কার এক ব্যবসায়ী কাফেলার মধ্যে। আমর ইবনুল হাজরামির নেতৃত্বে চলা সেই কাফেলাটিতে লোকসংখ্যা ছিল চারজন। লড়াই সংঘটিত হয় নাখলায়। এই লড়াইয়ের ফলাফল দাঁড়ায়—কাফেলা প্রধান নিহত হয়, দুইজন বন্দি হয় এবং আরেকজন পালিয়ে যায়।[৯৮]

মূল ঘটনা হলো, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ রাযি.-কে পাঠান বাণিজ্যিক কাফেলার খোঁজখবর নিতে। তিনি লড়াই চাননি। কেননা, তিনি বেরিয়েছিলেন রজব মাসে, যেটি হারাম মাস। কিন্তু ইবনে জাহশ ইজতেহাদ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কাফেলার ওপর

---

৯৭. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৩, পৃ. ১৮-২৫।

৯৮. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৩, পৃ. ২২-২৫; নাখলা : নাখলা হলো মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি জায়গা।

হামলা করেন। মদিনায় ফিরে এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অভিযানে প্রাপ্ত গনিমত বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তিনি তাঁর ভাগের পঞ্চমাংশও গ্রহণ করেননি। অবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের সিদ্ধান্তকে নির্দোষ ঘোষণা করে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়। মুসলিমদের প্রতি মক্কাবাসীর সীমালঙ্ঘনের যুক্তিতে এই ধরনের তৎপরতাকে বৈধতা দেওয়া হয়।[৯৯]

বদর যুদ্ধ

প্রথম দিককার গাযওয়া ও সারিয়্যাগুলো কুরাইশদের চোখ-কানের সামনে ঘটে। কিন্তু সেগুলোকে কোনো সংজ্ঞায় তারা ফেলতে পারছিল না। হারাম মাসে সংঘটিত নাখলার ঘটনাকে তারা সুযোগ হিসেবে কাজে লাগায়। মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরবদের উত্তেজিত করতে এবং মদিনার প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোতে হামলা করতে সুযোগটি লুফে নেয়। এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

মক্কাবাসী তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার প্রহরাব্যবস্থা আরও জোরদার করতে শুরু করে। হিজরতের দ্বিতীয় বছরের মাঝামাঝি নবীজি জানতে পারেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের নেতৃত্বে শাম থেকে মক্কা কুরাইশদের একটি বড় বাণিজ্যিক কাফেলা আসছে। সিদ্ধান্ত নেন—কাফেলাটি হস্তগত করবেন। তাঁর সঙ্গীরাও এই ডাকে সাড়া দেন। নবীজি ৩১৪ জনের একটি বাহিনী গঠন করতে সক্ষম হন। তারা এতটাই সংকটাপন্ন ছিলেন যে, হামলায় ব্যবহারের জন্য সবমিলিয়ে ৭০টির বেশি উট এবং দুটির বেশি ঘোড়া ব্যবস্থা করতে পারেননি। রমজানের আট তারিখ নবীজি মদিনা থেকে রওনা দেন।[১০০], [১০১]

---

৯৯. দেখুন, সুরা বাকারা : আয়াত ২১৭।

১০০. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৩, পৃ. ৩২।

১০১. নজদের মুশরিক বনু আমের গোত্রের আবুল বারা আমির ইবনে মালিক নবীজির কাছে কোনো একটি কাজে এসেছিল। নবীজি তার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। আমির ইবনে মালিক তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি। আবার করবে না এমনও বোঝা যাচ্ছে না। সে নবীজির কাছে প্রস্তাব দেয়, এক কাজ করুন, পুরো নজদে ইসলাম প্রচারের জন্য আপনার সাহাবিদের একটি দল পাঠান আমার সাথে। তাঁরা সেখানে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেবে। আশা করি নজদবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে নেবে। সবার সাথে আমিও ইসলাম গ্রহণ করব। আমির ইবনে মালিকের প্রস্তাবে নবীজি প্রথমে আশঙ্কা ব্যক্ত করলেও তার অভয়দানের কারণে সাহাবিদের একটি দল পাঠান। (*সিরাতে ইবনে ইসহাক*, ২/৩৭৮ [ধারাবাহিক নাম্বার],

স্পষ্টত জানা যায়, মুসলিম বাহিনীর রওনা হবার খবর আবু সুফিয়ান খুব দ্রুত জেনে যান। তখন তিনি দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

এক. সহযোগিতা ও যোদ্ধা চেয়ে মক্কায় দূত পাঠান।

দুই. পথ পরিবর্তন করে ভিন্নপথ গ্রহণ করেন।

কুরাইশরা আবু সুফিয়ানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আবু জাহলের নেতৃত্বে ৯৫০ জন যোদ্ধার এক সামরিক শক্তি পাঠায়। এই শক্তির গুরুত্ব প্রমাণ করে—আবু জাহল মুসলিমদের অন্তরে ভীতি ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিল। মুসলিমদের ভবিষ্যতে কুরাইশের বাণিজ্যকাফেলা ধাওয়া করতে বাধা দিতে চেয়েছিল।

উভয় বাহিনী বদর উপত্যকায় একে অপরের মুখোমুখি হয়। বদর উপত্যকার অবস্থান মদিনার দক্ষিণ দিকে ২০ মাইল দূরে। যুদ্ধ সংঘটিত হয় দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমজান মোতাবেক খ্রিষ্টীয় ৬২৪ সনের মার্চ মাসে। এই যুদ্ধে মুসলিমরা বিরাট বিজয় লাভ করেন। কুরাইশদের ৭০ জন যোদ্ধা নিহত হয়, যাদের মধ্যে আবু জাহলও ছিল। এ ছাড়া তাদের ৭০ জন যোদ্ধা বন্দি হয়।[১০২]

দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪ হিজরি; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ১/৪৪৯-৪৫০, যাহাবি, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ)

এই দলের বিবরণ এসেছে *সহিহ মুসলিম*-এর বর্ণনায়। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. বলেন, "নবীজির কাছে এক লোক এসে আবেদন জানায়, আপনি আমাদের সাথে এমন কিছু মানুষ পাঠান, যারা আমাদের কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দিতে পারবে। নবীজি তখন তাদের সাথে ৭০ জন আনসার সাহাবির একটি দল পাঠান। যাদের বলা হতো 'কুররা'।" (*সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৬৭৭)

এই দলের লোকসংখ্যা ছিল ৭০ জন। বিরে মাউনায় পৌছে হারাম ইবনে মিলহান রাযি. মুনযির ইবনে আমর রা.-কে দিয়ে নবীজির পত্র পাঠান আমের ইবনে তুফাইলের কাছে। আমের পত্র তো দেখেইনি; বরং মুনযির রাযি.-কে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে। এরপর বনু আমেরকে সাহাবিদের বিরুদ্ধে উসকানি দেয়। তারা রাজি না হলে অপরাপর গোত্রগুলোকে উসকানি দেয়। আমের ইবনে তুফাইলের উসকানি ও নির্দেশে বনু সুলাইমের অন্তর্ভুক্ত উসাইয়া, রি'ল ও যাকওয়ান গোত্র অবশিষ্ট সাহাবিদের ওপর হামলা করে। বিরে মাউনার নিকটে পৌছে তারা সাহাবিদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। অপ্রস্তুত সাহাবিরা তৎক্ষণাৎ তরবারি নিয়ে মোকাবেলা শুরু করেন। লড়াই করতে করতে একদম শেষ ব্যক্তিটিও শাহাদাত লাভ করেন। একমাত্র কাব ইবনে যায়দ রা. বেঁচে ফেরেন। মারা গেছেন ভেবে হামলাকারীরা তাকে ফেলে রেখে যায়। [*আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫/৫২৯, দার হিজর]

বিরে মাউনায় শাহাদাত বরণ করা সাহাবিরা ছিলেন বিশিষ্ট। অন্যদের চেয়ে কুরআন-সুন্নাহর ইলমে তারা এতটাই প্রাজ্ঞ ছিলেন যে, তাদের কুররা বলে আলাদা নামে ডাকা হতো।—নিরীক্ষক

[১০২]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৩, পৃ. ৩৩-৪৩।

এই বিজয় ইসলামের সূচনাকালীন ইতিহাসে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল। এই যুদ্ধটি ছিল কুরাইশ ও মুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত প্রথম কোনো সশস্ত্র জোরালো সংঘাত। যেখানে সেনাসংখ্যা ও সরঞ্জাম অল্প হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমরা নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেছিল। যুদ্ধশেষে মুসলিমরা বন্দি ও গনিমত নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। মক্কায় মুসলিমদের তীব্র কষ্ট দিত এমন কয়েকজন বন্দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যা করেন। একই সময়ে অন্য বন্দিদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেন। আবু সুফিয়ান বেঁচে যান। মক্কায় ফিরে মুসলিমদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দেন।[১০৩]

বদর যুদ্ধের পরিশিষ্ট

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর ওপর কুরাইশদের বিরুদ্ধে এক সামগ্রিক যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে। তাই তিনি নিজের অধিকাংশ সময় মুসলিমদের সবল করার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

কুরাইশরা তাদের বেশিরভাগ নেতৃস্থানীয় লোক হারিয়ে প্রচুর উদ্‌বিগ্ন হয়। আবু সুফিয়ান মক্কার সার্বিক নেতৃত্বের লাগাম নিজ হাতে তুলে নেয়। দায়িত্ব নিয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সামান্য সময়ও শোক করা যাবে না। মুসলিমরা যেন বিজয়ের ফল ভোগ করতে না পারে। সে এ কথাও জানিয়ে দেয়, মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার আগ পর্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ গ্রহণ করবে না।[১০৪]

মুসলিমদের বিজয় তাদের অর্থনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়ন করেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল—শত্রুদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে তাদের দুর্বল করে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করা। তাদের লক্ষ্য যে বাস্তবায়ন হয়েছে, তার প্রমাণ হলো—বদর যুদ্ধের পর থেকে কুরাইশরা শামে যাওয়ার বাণিজ্যিক পথ পালটে ফেলে। উত্তর দিকের পথ মাড়াবার ঝুঁকি তারা ফের নেয়নি। বনু সুলাইমের বসতি-সংলগ্ন একটি পথ তারা বেছে নেয়। কুরাইশদের সহযোগিতা যেন করা না হয়—এই মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু সুলাইমকে সতর্ক করে দেন। মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান শক্তির তোয়াক্কা না করে, নিজেদের প্রভাব ও যুদ্ধখ্যাতির ওপর ভরসা করে তারা নবীজির বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে। তখন নবী কারিম

---

[১০৩]. প্রাগুক্ত : খ. ৩, পৃ. ৫৬-৬১।

[১০৪]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৩, পৃ. ১৩৬।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জনপদ অভিমুখে গাযওয়া পরিচালনা করতে বাধ্য হন। গাতফান গোত্রেও অভিযান চালান।[১০৫]

কয়েক সপ্তাহ পর কুরাইশরা ব্যথা ভুলে সংবিৎ ফিরে পায়। কুরাইশদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং নিজের কসম পূরণ করতে আবু সুফিয়ান ২০০ যোদ্ধার একটি সামরিক শক্তি নিয়ে মদিনা অভিমুখে রওনা হয়। মদিনার উপকণ্ঠে পৌঁছলে বনু নাযির গোত্রের সর্দার তাকে আতিথেয়তা দেয়। তারা মক্কার পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরবরাহ করে।[১০৬]
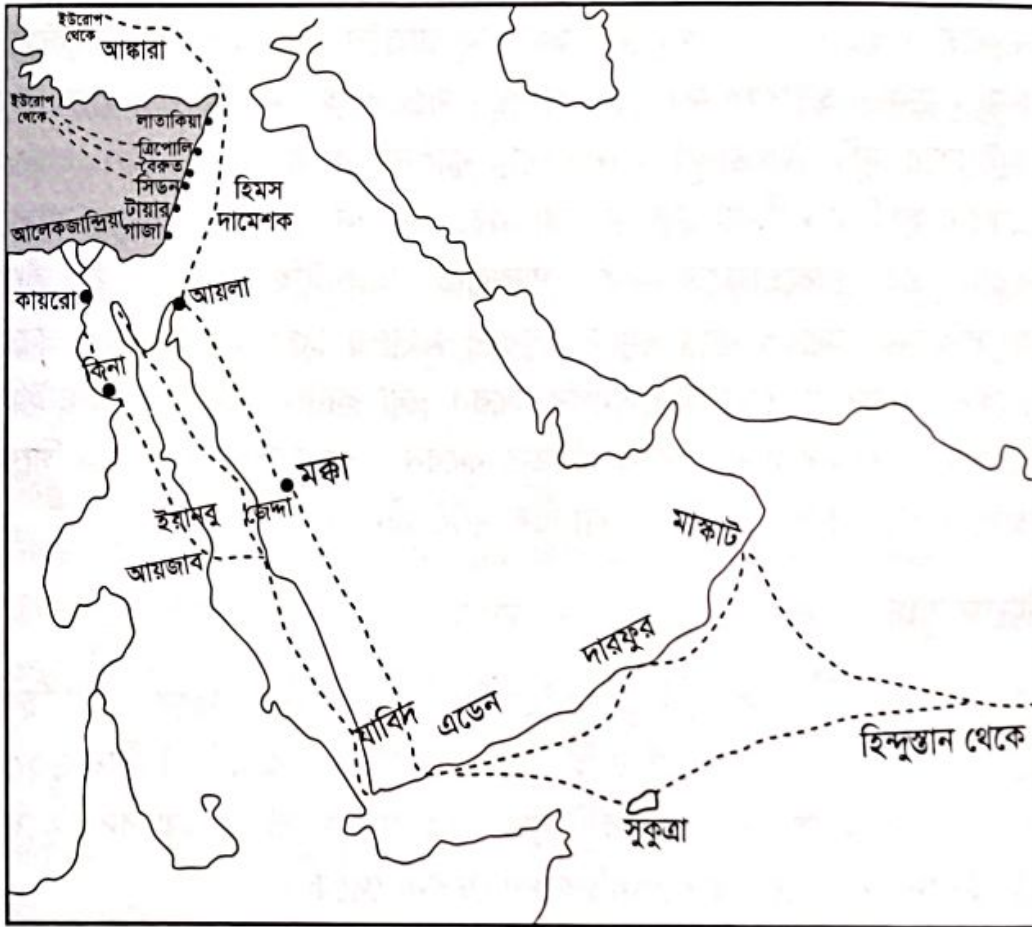
পূর্ব-দক্ষিণ দিকের বাণিজ্যপথ

স্পষ্টভাবে জানা যায়, যৌথ স্বার্থ বিবেচনা করে আবু সুফিয়ান এর মধ্যে বনু কাইনুকার ইহুদিদের সাথে একটি সন্ধিচুক্তিতে উপনীত হয়। বনু কাইনুকা তখন তাদের ও মুসলিমদের মধ্যে হওয়া সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে। এখানে

---

[১০৫]. প্রাগুক্ত : খ. ৩, পৃ. ১৩৫-১৩৬।

[১০৬]. প্রাগুক্ত : খ. ৩, পৃ. ১৩৬।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, এই ইহুদিরা মুসলিমদের বিজয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে সময় কোনো সামরিক মোকাবেলা করার সাধ্য তাদের ছিল না। তাই তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। তার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। নবীজি এতদিন তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করেছিলেন। তবে, ধৈর্যেরও একটা সীমা থাকে।

বাস্তবতা হলো, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচ্ছিলেন ইহুদিদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নিতে। তাদের ঘৃণাবোধকে না আবার ক্ষেপিয়ে তোলেন। তা হলে তাঁর অবস্থান সংকটময় হয়ে পড়বে। অপরদিকে তাদের শত্রুতামূলক পদক্ষেপ ও চুক্তিভঙ্গের সামনে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারছিলেন না। দুদলের মধ্যকার রাজনৈতিক পরিবেশ সংকটময় হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে তা যুদ্ধে গড়ায়। যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয় বনু কাইনুকার দুটি ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঘটনা; বনু কাইনুকার বাজারে ইহুদি কর্তৃক একজন মুসলিম নারীকে উত্যক্ত করা এবং একজন মুসলিম পুরুষকে হত্যা করা। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারীদের সমবেত করে বনু কাইনুকার মহল্লায় ১৫ দিন অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে তারা আত্মসমর্পণ করে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মদিনা থেকে বহিষ্কার করেন। তখন তারা খায়বারে গিয়ে আবাসন গ্রহণ করে। তাদের সংখ্যা ছিল ৭০০ জন।[১০৭]

উহুদ যুদ্ধ

উৎসগ্রন্থগুলো আমাদের উহুদ যুদ্ধের বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করে। এটি ছিল উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে তৃতীয় হিজরির শাওয়ালের মাঝামাঝি খ্রিষ্টীয় ৬২৫ সনের এপ্রিল মাসে সংঘটিত একটি যুদ্ধ। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের চেতনা থেকে।

কুরাইশ, আহবাশ এবং কিনানা ও তিহামার আরবদের সমন্বয়ে গঠিত ৩ হাজার যোদ্ধার বাহিনীকে নেতৃত্ব দেয় আবু সুফিয়ান। যোদ্ধাদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য মদিনার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সময় সাথে করে নারী নিয়ে নেয়। উহুদে পৌছার আগে তাদের ফিরতে মানা করে। উহুদ হলো মদিনার নিকটবর্তী একটি জায়গা। মদিনার বিপরীতে সুবিশাল উপত্যকায় আবু সুফিয়ান শিবির স্থাপন করে। সম্ভাব্য সব পদ্ধতি ব্যবহার করে

---

[১০৭]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৩, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

ক্রমবর্ধমান মুসলিমশক্তিকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য মজবুত এক সামরিক রূপরেখা প্রস্তুত করে। এদিকে মদিনায় নবীজির বিরোধীদের সাথে তাদের গোপন যোগাযোগ বহাল থাকে। পাশাপাশি লড়াইয়ের জন্য যোদ্ধাদের উদ্‌বুদ্ধ করতে আবু সুফিয়ান উসকানিমূলক কবিতার আশ্রয় নেয়।[১০৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকারী তাঁর চাচা আব্বাসের পক্ষ থেকে একটি পত্র পান। পত্রে তিনি কুরাইশ বাহিনীর রওনা সম্পর্কে সংবাদ জানান। পত্র পেয়ে নবীজি তাৎক্ষণিক তাঁর সকল সাহাবিকে নিয়ে পরামর্শ সভা ডাকেন। উপস্থিত সাহাবিরা দুদলে বিভক্ত হয়ে যান। একদলের মত হলো, শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য মদিনা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া। এই দলে ছিলেন লড়াই-উন্মুখ যুবক এবং বদরে অংশগ্রহণ করেননি—এমন সাহাবিরা। আরেকদল মদিনায় অবস্থান গ্রহণের মতকে প্রাধান্য দেন। এতে করে মদিনার প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা জোরদার করা যাবে। নারী ও শিশুদের সহযোগিতা করা যাবে। এই মত ছিল প্রবীণ সাহাবিদের। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতও এটিই ছিল। মদিনার প্রসিদ্ধ সর্দার এবং মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলও এই মতের পক্ষে ছিল।[১০৯]

কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে গ্রহণ করেন। নিজে যুদ্ধের পোশাক পরে নেন এবং মুসলিমদের ধৈর্যশীল ও অবিচল থাকতে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল তার ৩০০ জন অনুসারী-সহ সরে যাওয়ার পর সর্বসাকুল্যে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৯০০ জন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এই সরে যাওয়া ছিল মুসলিম বাহিনীকে দুর্বল করার এক নিখুঁত পরিকল্পনামাফিক পদক্ষেপ। উপত্যকার একদম শেষপ্রান্তে উহুদ পাহাড়কে আশ্রয় বানিয়ে মুসলিম বাহিনী শিবির স্থাপন করে।[১১০]

এই কৌশলী তৎপরতার মাধ্যমে নবীজি তাঁর বাহিনীকে মদিনার দিক থেকে আলাদা করে ফেলেন।

---

[১০৮]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৩, পৃ. ১৪৮।

[১০৯]. প্রাগুক্ত : খ. ৩, পৃ. ১৪৮-১৪৯।

[১১০]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৩, পৃ. ১৫০।

কুরাইশের অশ্বারোহী বাহিনী ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশ্চিন্তার মূল কারণ। এর জন্য সতর্কতাস্বরূপ পাহাড়ের বিভিন্ন পয়েন্টে ৫০ জন লোক নিযুক্ত করেন। তাদের নির্দেশ দেন—তারা যেন কুরাইশের অশ্বারোহী বাহিনী কর্তৃক মুসলিমদের ঘেরাও করে ফেলাকে প্রতিরোধ করে। এবং যুদ্ধের ফলাফল যা-ই হোক, তারা যেন স্থান ত্যাগ না করে।[১১১]

উভয় দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। হুট করে যুদ্ধের মোড় ঘুরে না গেলে মুসলিমদের বিজয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ের ওপর অবস্থান গ্রহণকারী ইসলামি বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য স্থান ত্যাগ করে চলে আসেন গনিমত সংগ্রহে অংশগ্রহণ করার জন্য। এর মাধ্যমে তারা নবীজির নির্দেশ অমান্য করেন। কুরাইশ বাহিনীর ডানবাহুর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ এই দায়িত্বহীন পদক্ষেপের সুযোগ কাজে লাগায়। মুসলিমরা তখন গনিমত সংগ্রহে ব্যস্ত। খালিদ বিন ওয়ালিদ তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের পশ্চাদ্‌ভাগ থেকে ঘেরাও করে ফেলে। এই তাৎক্ষণিক আক্রমণে মুসলিমরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। তাদের শৃঙ্খলা ভেঙে যায়। তাকিয়ে দেখে, কুরাইশরা পুনরায় আক্রমণ করেছে। যুদ্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে ঘুরে গেছে। মুসলিমরা নিজেদের আবিষ্কার করে কুরাইশদের তরবারির আঘাতের নিচে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হামযা রাযি. ওয়াহশির হাতে শহিদ হন। ঝান্ডা বহনকারী মুসআব ইবনে উমাইর রাযি. শহিদ হন। স্বয়ং নবীজিও আক্রান্ত হন।

এ কথা স্পষ্ট যে, কুরাইশরা এই ফলাফল নিয়েই যুদ্ধ থেকে ফিরে যায়। অথচ তখনো পরিপূর্ণ বিজয় হয়নি। আবু সুফিয়ান বিজয় লাভ করার পূর্বেই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ শেষে মুসলিম বাহিনীর লাশগুলোকে একত্রিত করার নির্দেশ দেন। দেখা গেল, ৭০ জন মুজাহিদ শহিদ হয়েছেন। নবীজি তাদের জানাযা পড়ে দাফন করেন। তারপর মদিনায় ফিরে আসেন।[১১২]

বাস্তবতা হলো, এই খেসারত মুসলিমদের শক্তির কোনো ক্ষতি করেনি। সাহাবিদের উঁচু মনোবল তৈরি করার ক্ষেত্রে নবীজির বিশেষ অবদান ছিল। এই যুদ্ধ ছিল তাঁদের দ্বীন আঁকড়ে থাকা এবং অবিচলতার এক পরীক্ষা। সুরা

---

১১১. প্রাগুক্ত।

১১২. সম্মুখ সমরে উভয় বাহিনীর লড়াইয়ের বিস্তারিত দেখুন, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৩, পৃ. ১৫০-১৫৮।

আলে ইমরানের ১২১ থেকে ১৮০ নং আয়াতের আলোচ্য বিষয় হলো উহুদ যুদ্ধ। আয়াতগুলো উহুদের পর নাজিল হয়। এই আয়াতগুলো সংকটময় পরিস্থিতিতে সতর্কীকরণ, প্রেরণা প্রদান এবং দিকনির্দেশনার কাজ করেছে। আয়াতগুলোতে সেসব ভুল পদক্ষেপ ও অস্থির অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। এর আলোকে তা মুসলিমদের সময়ের পালাবদলে শিক্ষা ও আত্মগঠনের সবক দেয়। এটি ছিল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের শিক্ষা।

উহুদ যুদ্ধের পরিশিষ্ট

মক্কায় পৌছার পূর্বে আবু সুফিয়ান ও মক্কার নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারল—তারা এক জটিল পরিস্থিতিতে আছে। এত পরিশ্রম করেও তারা আসলে কিছুই লাভ করেনি। যদি তারা পূর্বের চেয়ে ভালো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে বিপর্যয় তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের দৃষ্টিতে এর একমাত্র সম্ভাবনা ছিল, পূর্বের চেয়ে শক্তিশালী একটি বাহিনী গঠন করে মুসলিমদের শক্তির মোকাবেলা করা। আর তা মদিনার পার্শ্ববর্তী বড় কিছু গোত্রের সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়। উহুদ যুদ্ধের পর তারা এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক শ্রম ব্যয় করে।

উহুদ যুদ্ধের পর কোনো কোনো গোত্র মুসলিমদের শক্তি হালকা করে দেখতে শুরু করে। তাদের ওপর আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখায়। যেমন, আযল ও আল-কারা গোত্র (Al Qarah) রজি' (رجيع) সারিয়্যার দিন মুসলিমদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে।[১১৩]

বনু সুলাইম বিরে মাউনার দিন মুসলিমদের হত্যা করে।[১১৪] রজির দিনের ঘটনাগুলো এক ঘনঘোর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। নবীজি কয়েক দিন এই পরিস্থিতি অবলোকন করেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাগাতার যেসব কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছিলেন, বিরে মাউনার ঘটনা ছিল সেসবের একটি। তবে সকল বিরোধী তৎপরতার ওপর তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মুসলিমদের দুর্বল করে দেখার বিষয়টি এতদূর গড়ায় যে, বনু নাযির নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য

---

[১১৩]. ইয়াউমুর রাজি'র বিস্তারিত বিবরণ জানতে দেখুন, প্রাগুক্ত : খ. ৩, পৃ. ২২৪-২৩০।

[১১৪]. বিরে মাউনার বিস্তারিত বিবরণ জানতে দেখুন, প্রাগুক্ত : খ. ৩, পৃ. ২৩০-২৩৩।

চক্রান্ত শুরু করে। এ কথা জানতে পেরে নবীজি তাদের মদিনা থেকে নির্বাসন দেন। তারা এই নির্বাসন প্রত্যাখ্যান করলে ছয় রাত তাদের অবরোধ করে রাখেন। অন্য বর্ণনামতে, ১৫ দিন অবরোধ করে রাখেন। অবরোধের পর তারা ঘোষণা দেয়, নবীজির শর্তের সামনে আত্মসমর্পণ করতে তারা প্রস্তুত। নবীজি তাদের অস্ত্রসমর্পণ করে মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। প্রস্তাব মেনে তারা মদিনা ছেড়ে খায়বারে চলে যায়। কিছু লোক চলে যায় শামে।[১১৫]

খন্দকের যুদ্ধ (গাযওয়াতুল আহযাব)

বনু নাযিরকে নির্বাসন দেওয়াই মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যকার সংঘাতের সমাপ্তি ছিল না। তারা খায়বারে থেকে নিয়মিত চক্রান্ত করে যায়। কুরাইশদের সাথে হাত মেলায়। পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মোতাবেক খ্রিষ্টীয় ৬২৭ সনের মার্চ মাসে মদিনা অবরোধ উপলক্ষ্যে যে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয়, তার পেছনে ইহুদিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা গাতফান গোত্রকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।[১১৬]

আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনা অভিমুখে রওনা হওয়ার জন্য বাহিনীগুলো প্রস্তুত হয়। তারা সংখ্যায় ছিল ১০ হাজার। এক অভিন্ন স্বার্থ তাদের এক ছায়াতলে সমবেত করেছিল; মুহাম্মাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি নিঃশেষ করা এবং তাঁর অনুসারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া। লড়াইয়ের জন্য মুসলিম বাহিনীর আগমনের অপেক্ষায় তারা মদিনার বাইরে সেনাছাউনি স্থাপন করে।[১১৭]

কিন্তু নবীজি অন্যবারের চেয়ে ভিন্ন এক সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কারণ, তিনি বুঝতে পারেন, ৩ হাজারের বেশি সেনা তিনি তৎক্ষণাৎ সংগ্রহ করতে পারবেন না। এ ছাড়া কুরাইশদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া উহুদের শোকাবহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে। তাই মদিনার ভেতরে থেকে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। উত্তর দিকের এলাকা এবং যেসব জায়গা দিয়ে অশ্বারোহী বাহিনীর হামলার সম্ভাবনা আছে, সেসব জায়গায় পরিখা খনন করেন। ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ বলছে, নবীজিকে এই

---

[১১৫]. প্রাগুক্ত : খ. ৩, পৃ. ২৪০-২৪২; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবনু কাছির, খ. ৪, পৃ. ৭৫।

[১১৬]. *তারিখে তাবারি*, খ. ২, পৃ. ৫৬৪।

[১১৭]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৩, পৃ. ২২৫৯; *তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলক*, তাবারি, পৃ. ৫৭০।

অভিনব পরামর্শ দিয়েছিলেন সালমান ফারসি রাযি.। আরবরা ইতঃপূর্বে এই কৌশলের সাথে পরিচিত ছিল না।[১১৮]

এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, মদিনার অন্য জায়গাগুলো পাহাড়, খেজুরবাগান এবং ঘরবাড়ি দিয়ে সুরক্ষিত ছিল।

মিত্রশক্তি প্রায় ৪০ দিন মদিনা অবরোধ করে রাখে। কিন্তু কোনো ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। আবু সুফিয়ান তখন বনু কুরাইযার অঞ্চল দিয়ে মদিনায় প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ইহুদিদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। প্রত্যেকের ভূমিকা নির্ধারণ করে উভয় দলের মাঝে সমঝোতা হয়।[১১৯] ফলে বনু কুরাইযা মুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে।

এই চুক্তি ভঙ্গের কথা জানতে পেরে মুসলিমরা শঙ্কিত হন। তখন নবীজি তাঁদের মন থেকে এই শঙ্কা দূর করার জন্য সচেষ্ট হন। মদিনার তিন ভাগের এক ভাগ ফসলের বিনিময়ে গাতফান গোত্রের সাথে চুক্তি থেকে সরে আসার ব্যাপারে আলোচনা জারি রাখেন। কিন্তু মুসলিমদের খাযরাজ গোত্রের সর্দার সাদ ইবনে উবাদা এবং আউস গোত্রের সর্দার সা'দ ইবনে মুআয উভয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তারা যুদ্ধের পক্ষে সংকল্প ব্যক্ত করেন।[১২০]

এই সময় বনু কুরাইযার সাথে কুরাইশ মিত্রশক্তির চুক্তি ব্যর্থ করার পেছনে বড় অবদান রাখেন নুআইম ইবনে মাসউদ আল-আশজায়ি রাযি.। তিনি তার কওমের কাছে ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। ঠিক এমন সময় মিত্রশক্তি প্রাকৃতিক কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি হয়, যা তাদের সর্বপ্রকার রসদ ধ্বংস ও মনোবল দুর্বল করে দেয়। ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে মাঠ ত্যাগ করে চলে যায়।[১২১]

খন্দক যুদ্ধের পরিশিষ্ট

কুরাইশরা নবীজি ও মুসলিমদের খতম করতে ব্যর্থ হয়। এত শক্তি ব্যয় করার পরও তাদের ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে পড়ে যায়। এদিকে মদিনায় নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শক্তি মজবুত হতে থাকে।

---

[১১৮]. *তারিখে তাবারি*, খ. ২, পৃ. ৫৬৬, ৫৭০।

[১১৯]. প্রাগুক্ত : খ. ২, পৃ. ৫৭০-৫৭১।

[১২০]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৩, পৃ. ২৬২।

[১২১]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৩, পৃ. ২৬৬।

হিজরতের পঞ্চম বছরজুড়ে নবীজি একের পর এক কুরাইশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক কাফেলার ওপর অভিযান প্রেরণের কৌশল গ্রহণ করেন। তাঁর অভিযান উত্তর থেকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে বিস্তার পায়। এর মধ্যে তিনি শাম অভিমুখে মক্কার বাণিজ্যিক কাফেলা-রুট বন্ধ করতে সক্ষম হন। পাশাপাশি মক্কার বাণিজ্য-ব্যবস্থার ওপর আরোপিত অবরোধ শক্তিশালী করতে উত্তর দিকের গোত্রগুলোর সঙ্গে কৃত সন্ধিচুক্তিকে কাজে লাগান।

শামের সাথে মক্কার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় এবং কুরাইশরা তাদের অবস্থান হারায়। কুরাইশের নেতৃবৃন্দ ও বেঁচে যাওয়া লোকজন তাদের সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে চরম দুর্ভাবনার শিকার হয়।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাব যুদ্ধ সম্পন্ন করার পর বনু কুরাইযার প্রতি মনোযোগী হন। তাদের ষড়যন্ত্র ও মুসলিমদের হক নষ্ট করার শাস্তি দিতে হবে। নবীজি ২৫ দিন বনু কুরাইযাকে অবরোধ করে রাখেন। বাধ্য হয়ে তারা আত্মসমর্পণ করে। বনু কুরাইযার সাবেক মিত্র সাদ ইবনে মুয়াযের বিচারিক ফয়সালা মেনে নিতে তারা রাজি হয়। সাদ ইবনে মুয়ায রাযি. ফয়সালা দেন—তাদের পুরুষদের হত্যা করা হবে। সম্পদ মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। নারী ও শিশুদের বন্দি করা হবে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ফয়সালা মেনে নিয়ে কার্যকর করার নির্দেশ দেন।[১২২]

মদিনার অবরোধপরবর্তী যুদ্ধসমূহ

মদিনা অবরোধ থেকে হুদায়বিয়ার সন্ধি—এর মধ্যবর্তী সময়টির তাৎপর্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নতুন নতুন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রকাশ পায়। এর পূর্বে তাঁর সব প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিলেন কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে; মক্কার শক্তিকে নিঃশেষ করার জন্য। কিন্তু মদিনা অবরোধের পর স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর লক্ষ্য আরও বিস্তৃত এবং তা উল্লেখ করার মতো। এইসব ঘটনায় ধর্মীয় দিকটি ছিল তুলনামূলক প্রধান, যা একই সময়ে সমগ্র আরবকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়েছে এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলোকেও সফলভাবে এগিয়ে নিয়েছে।

বাস্তবতা হলো, এই সময়ের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তার একটা অংশ মদিনা অবরোধ ও তার ক্ষতিসাধনে কুরাইশদের ব্যর্থতার ফলাফল হিসেবে

---

১২২. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৩, পৃ. ২৬৭-২৭৬।

এসেছে। প্রথমে বনু কুরাইযাকে শাস্তিদানের ঘটনা ঘটেছে। এরপর মুসলিমরা গাতফান গোত্রে আক্রমণ করেছে। কুরাইশদের সাথে মৈত্রীতে আবদ্ধ এমন আরও অনেক গোত্রে ছোট ছোট একাধিক অভিযান প্রেরিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে আসাদ, সালাবা, বনু বকর, বনু কিলাব এবং বনু লিহইয়ান উল্লেখযোগ্য। এই অভিযানগুলোর উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত তাদের সতর্ক করা। যেন তারা মদিনা আক্রমণ করার চিন্তাও না করে। অথবা যেন তাদের মক্কার সাথে পুনরায় মৈত্রীচুক্তি নবায়ন করার সুযোগ না ঘটে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন, দক্ষিণে কুরাইশ এবং উত্তরে খায়বারের ইহুদিদের মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। উদ্দেশ্য, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টির সুযোগ করে দেওয়া, যেন উদীয়মান ইসলামি রাষ্ট্রকে সাঁড়াশির দুই দাঁতের মতো করে মাঝখানে ফেলে চেপে ধরতে পারে। তখন এই চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের সামরিকভাবে পরাজিত করা নবীজির পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি সবচেয়ে কাছের শত্রুকে বোঝাপড়ার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে বশীভূত করার কথা ভাবেন। সন্দেহ নেই, কাছের শত্রু ছিল কুরাইশ। ষষ্ঠ হিজরির শেষে নবীজি ঘোষণা দেন—তিনি উমরাহ করতে চান। নিয়ত অনুযায়ী উমরাহর জন্য মক্কার উদ্দেশে রওনা দেন। সাথে হাদি[১২৩] নিয়ে যান। এ কথা সুবিদিত যে, কুরাইশরা নবীজির এই শান্তিপূর্ণ ইচ্ছা মেনে নেয়নি। তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। নবীজি হুদায়বিয়া প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। হুদায়বিয়ার অবস্থান মক্কার হারাম অঞ্চলের ভেতরে। পশ্চিম দিকে হাঁটাপথে এক দিনের দূরত্ব।

দুই পক্ষের মধ্যে সংলাপ শুরু হয়। এই ফাঁকে নবীজি প্রস্তাব পেশ করেন যে, তারা যদি উমরাহ পালন করার সুযোগ দেয়, তাহলে আর তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে ধাওয়া করা হবে না। কুরাইশরা এই প্রস্তাবে সম্মত হয়, তবে তা এক বছর পর কার্যকর হবার শর্তে। তবুও নবীজি এই শর্ত মেনে নেন।

নিম্নযুক্ত কতগুলো ধারা ও শর্তের ভিত্তিতে এই সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয় :

- উভয় পক্ষ ১০ বছরের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ত্যাগ করবে।

---

[১২৩]. হজ পালনকারী ব্যক্তি কুরবানি করার জন্য সাথে করে যে পশু নিয়ে যায়, তাকে হাদি বলে।

➤ এই বছর মুসলিমরা উমরাহ আদায় না করে মক্কা থেকে ফিরে যাবে। পরবর্তী বছর এসে উমরাহ পালন করবে।

➤ ইসলাম গ্রহণকারী কুরাইশের কেউ যদি মদিনায় চলে যায়, তা হলে নবীজি তাকে ফিরিয়ে দেবেন।

➤ মুসলিমদের কেউ মক্কায় ফিরে এলে কুরাইশরা তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য নয়।

➤ অন্য গোত্রগুলোর সন্ধির যেকোনো পক্ষে যাওয়ার স্বাধীনতা থাকবে।[১২৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপ শর্তে সন্ধিচুক্তি করতে দেখে অনেক সাহাবি তাজ্জব বনে যান। কেউ কেউ হতাশ হয়ে পড়েন। তাঁদের একজন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.। তবে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিচক্ষণতা ও সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই সমস্যারও সমাধান করেন। তিনি উমর রাযি.-এর প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল। কিছুতেই আমি তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধে যাব না। তিনিও আমাকে ধ্বংস করবেন না।[১২৫]

বাস্তবতা হলো, এই সন্ধি ছিল মুসলিমদের মঙ্গলের পক্ষে। পক্ষান্তরে এই সন্ধির মাঝে কুরাইশদের দুর্বলতা ও পতন লুকিয়ে আছে। একইভাবে এই চুক্তির মানে হচ্ছে, কুরাইশদের চিৎকার করে মুসলিমদের শক্তি স্বীকার করে নেওয়া। এটা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ এক সন্ধি—যা অন্যান্য গোত্রকে মক্কার সঙ্গে মৈত্রিচুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিমদের কাতারে শামিল হবার সুযোগ করে দেয়। যেমনটা খুযাআ গোত্র করেছিল। গোত্রগুলোকে দাওয়াত দেওয়ার স্বাধীনতা দিলে নবীজি কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

এই চুক্তি ব্যাপকভাবে নবীজির সুদূরপ্রসারী রাজনীতির কাজে এসেছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই সন্ধিকে ইসলামের মহান বিজয় বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১২৬]

---

[১২৪]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৪, পৃ. ২৪-৩৩।
[১২৫]. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ২৮।
[১২৬]. *তারিখে তাবারি*, খ. ২, পৃ. ৬৩৮।

বিভিন্ন রাজা-বাদশার নিকট নবীজির পত্র প্রেরণ

হুদায়বিয়ার সন্ধি নবীজিকে আরও অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণে স্বাধীনতা এনে দেয়। ইসলামের দাওয়াত যেহেতু সর্বজনীন, তাই নবীজি পার্শ্ববর্তী রাজা-বাদশাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে পত্র লেখেন। তারা হলেন—রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস (Heraclius), হারিস ইবনে আবি শামর আল-গাসসানি, হাবশার বাদশাহ নাজাশি (Najashi), পারস্যের কিসরা, মিসরের মুকাওকিস (Al-Muqawqis), ইয়ামামার আমির হাউজা আল-হানাফি (Hawdha Al-Hanafi), বাহরাইনের বাদশাহ মুনযির, ওমানের রাজা জাইফার ইবনুল জুলান্দি (Jayfar Ibn Al-Julandi) ও আব্বাদ ইবনুল জুলান্দি। তারা উভয়ে ছিলেন আদ অধিবাসী ওমানের বাদশাহ।

একেকজনের উত্তর একেক রকম ছিল। কেউ কেউ সুন্দর জবাব দিয়েছেন। যেমন, নাজাশি ও মুকাওকিস। কেউ কেউ অভব্যভাবে জবাব দিয়েছেন। যেমন, গাসসানের রাজা ও পারস্যের কিসরা।[১২৭]

খায়বার যুদ্ধ

বিশেষভাবে মদিনার ইহুদিদের পরিণতি এবং সাধারণভাবে সমগ্র জাজিরাতুল আরবের ইহুদি—তারা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর দাওয়াতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। তা উপলব্ধি করে খায়বারের ইহুদিরা প্রতিশোধস্পৃহায় জ্বলে ওঠে। তারা বনু নাজিরের নেতাদের উসকে দেয়। অবশেষে তারা মদিনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত স্থির করে। খায়বারে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিযান চালানোর কারণ হিসেবে এই বিষয়ই যথেষ্ট ছিল। মদিনা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ছয়দিনের দূরত্বে খায়বারের অবস্থান। তাদের ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়ে নবীজি দ্রুত গোপনে রওনা হন। ইহুদিরা টের পাওয়ার আগেই সপ্তম হিজরির মহররম মাস মোতাবেক ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে নবীজি খায়বার পৌঁছে যান। মুসলিমদের আকস্মিক উপস্থিতি ও অবরোধ করতে দেখে ইহুদিরা হতভম্ব হয়ে পড়ে।

খায়বার ছিল কয়েকটি দুর্গ নিয়ে গঠিত যার অধিকাংশই পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। মুসলিমরা এক এক করে দুর্গে আক্রমণ করতে থাকে। খায়বারবাসীর জোরালো প্রতিরোধের মুখেও মুসলিমরা খায়বার দখল করে নেয়। এরপর নবীজি

---

[১২৭]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৪, পৃ. ২৩২-২৩৩।

খায়বারবাসীর সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। বার্ষিক উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক মুসলিমদের করস্বরূপ প্রদান করতে হবে—এই শর্তে চুক্তি করেন।[১২৮]

মুতার যুদ্ধ

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিকের বাণিজ্যিক রুটটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিশেষ করে কুরাইশের সাথে সংঘাত তৈরি হবার পর থেকে। কুরাইশদের ব্যবসাকে এর মাধ্যমে সংকুচিত করে দিয়েছিলেন। তিনি এই রুটের পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোকে বশীভূত করে নিয়েছিলেন। কারণ, একদিক থেকে রাজনৈতিক বিবেচনায় এই রুটটির গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ অপরদিকে তার লক্ষ্য হলো, আরবীয়দের একসারিতে ঐক্যবদ্ধ করা এবং জাজিরাতুল আরবের বাইরে উত্তর দিকে ক্ষমতা-বলয়ের বিস্তৃতি সাধন করা।

মুতার যুদ্ধ এই মনোভাবের প্রমাণ বহন করে। এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল—শুরাহবিল ইবনে আমর আল-গাসসানি কর্তৃক নবীজির পত্রবাহী দূতকে হত্যা করা। তখন নবীজি যায়েদ ইবনে হারিসা রাযি.-এর নেতৃত্বে ৩ হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী প্রস্তুত করে দেন। উত্তর দিকে বাহিনী যাত্রা করে অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা মোতাবেক সেপ্টেম্বর ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে। বাহিনীর সদস্যরা মুতা জনপদের নিকট আরব গোত্রদের দ্বারা গঠিত একটি বাইজেন্টাইন সেনাদলের মুখোমুখি হয়। মুতা হলো বালকার (Balqa) একটি জনপদ।

মুসলিম বাহিনী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিসহ আক্রমণ করতে পারেনি। সংখ্যায় অধিক বাইজেন্টাইন বাহিনীর মোকাবেলায় মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়। তিন তিনজন সেনাপতি শহিদ হলে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. বাহিনী নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। শহিদ সেনাপতিগণ হলেন, যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আবি তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.।[১২৯]

এতৎসত্ত্বেও এই পরাজয় মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কোনো প্রভাব ফেলেনি। ইসলামের দাওয়াত প্রসারিত হয়েই চলে। গোত্রগুলো একের পর এক মদিনায় প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে চলে।[১৩০]

---

[১২৮]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৪, পৃ. ৩৯-৪৪।

[১২৯]. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ৭০-৭৪।

[১৩০]. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ২০৩-২২০।

মক্কা বিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মক্কাবাসী অনুভব করে, তাদের শহর পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা রাজনৈতিক মতের দিক থেকে স্পষ্ট দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল মক্কার বয়স্ক ও স্বার্থবাজদের সাথে যোগ দেয়। তারা মুসলিমদের সাথে লাগাতার বিরোধ চায়। আরেকদল যুবকদের সাথে যোগ দেয়। যারা বুঝতে পারে, মুসলিমদের শক্তিবৃদ্ধি ও মক্কার শক্তি ক্ষয়ে গেলে মক্কায় তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

অষ্টম হিজরিতে কুরাইশ কর্তৃক সন্ধির শর্ত লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। তারা তাদের মিত্রগোত্র বনু বকরকে নবীজির মিত্রগোত্র বনু খুযাআর বিরুদ্ধে অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করে। এই ঘটনা নতুন করে যুদ্ধের পথ খুলে দেয়। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ হাজার যোদ্ধা নিয়ে অষ্টম হিজরির রমজান মাস মোতাবেক ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মক্কা অভিমুখে রওনা হন। নবীজি তাঁর বাহিনী নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে চারটি প্রবেশপথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে সক্ষম হন। তবে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর দলটি বাধার মুখোমুখি হয়েছিল। খুব দ্রুত তিনি তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হন।

নবীজি মক্কায় প্রবেশ করে সাতবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং মূর্তিগুলো সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। তারপর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। বড় ধরনের অপরাধের কারণে কয়েকজনকে সাধারণ ক্ষমার আওতামুক্ত ঘোষণা দেন। মক্কায় নবীজি ১০ কিংবা ২০ দিন অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি সেখানকার প্রশাসনিক বিষয়-আশয় গুছিয়ে নেন। বিশেষ করে হারাম অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ এবং কুরাইশরা পূর্বে যেসব বিশেষ সুবিধা ভোগ করত, সেসব বাতিল করেন।[১৩১]

হুনাইনের যুদ্ধ

হাওয়াযিন গোত্র মক্কায় কুরাইশ শক্তির দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগায়। তারা কুরাইশদের এই শূন্যস্থান পূরণ করে। মক্কায় মুসলিমদের শাসনে তারা প্রত্যক্ষ হুমকি দেখতে পায়। তাই তারা সৈন্য সমাবেশ করে মক্কা অভিমুখে রওনা হয়। তাদের সাহায্য করে বনু সাকিফ। কুরাইশদের থেকে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাদের এই কাজে প্ররোচিত করে। এদিকে নবী কারিম

---

[১৩১]. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৪, পৃ. ৮৪-৯৫।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাহিনীর আগমনের কথা শুনতে পেয়ে মক্কা থেকে ১০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে রওনা হন। হুনাইনের উপত্যকায় উভয় বাহিনী তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সময়টা ছিল অষ্টম হিজরির শাওয়াল মোতাবেক ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। যুদ্ধের শুরুর দিকে মনে হয় বিজয় এবার হাওয়াযিনের বরাতে। কিন্তু যুদ্ধের একপর্যায়ে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহিনীর সারিগুলোকে পুনরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। এবং পরিশেষে চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করতে সফল হন। এদিকে সাকিফ গোত্র নিজেদের শহর রক্ষা করতে তায়েফ ফিরে যায়।[১৩২]

তায়েফের যুদ্ধ

নবীজি হুনাইনে বিজয় লাভ করার পর তায়েফের দিকে রওনা হন। ১৫ দিন তায়েফ শহর অবরোধ করে রাখেন। তারপর হারাম মাস চলে এলে অবরোধ তুলে নেন। তবে পুনরায় অবরোধের ব্যাপারে নবীজি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু সাকিফ গোত্রের লোকেরা দেখতে পেল—মুসলিমদের সম্মুখে দাঁড়াতে বা মোকাবেলা করতে তারা অক্ষম। বিশেষ করে জাজিরাতুল আরবের গরিষ্ঠসংখ্যক গোত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে। তাই তারা নবীজির কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে তাদের ইসলামে প্রবেশের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করে।[১৩৩]

তাবুক যুদ্ধ

এই যুদ্ধ ছিল মুতার যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয় ফিরিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ এবং উত্তর দিকে বাইজেন্টাইন সীমান্তে অবস্থিত গোত্রগুলোকে ইসলামে প্রবেশের দাওয়াত প্রদান। ইতোমধ্যে নবীজি মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ফিলিস্তিন সীমান্তে রোমক বাহিনী জমা করার সংবাদ জানতে পারেন। তখন নবীজি একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন; যার নাম দেন 'জাইশুল উসরাহ' অর্থাৎ অনটনগ্রস্ত সেনাবাহিনী। কারণ, এই যুদ্ধের প্রস্তুতি ও রওনা—উভয়টি হয় লোকদের অনটন, তীব্র গরম ও দুর্ভিক্ষের সময়। সামর্থ্যবান সাহাবিরা প্রচুর দান করেন। তা দিয়ে দরিদ্র সাহাবিরা প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন।

---

১৩২. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ১২১-১৩৮।

১৩৩. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ১৪৮-১৫১।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে মদিনা থেকে রওনা হন নবম হিজরির রজব মাসে। খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডারে তখন ৬৩০ সনের অক্টোবর মাস। তারপর তিনি তাবুক পৌছেন।[১৩৪] সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করে তাবুকবাসীর সঙ্গে সন্ধি করেন। নবীজি সেখানে আইলা (Ayla), আযরুহ (Udhruh)[১৩৫] এবং জারবা[১৩৬] অঞ্চলের কয়েকটি গোত্রের প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-কে দুমাতুল জান্দালের (Dumah Al-Jandal)[১৩৭] সর্দার উকাইদিরের কাছে পাঠান। খালিদ বিন ওয়ালিদ তাকে বন্দি করেন এবং দুমাতুল জান্দাল জয় করে ফিরে আসেন।

এটা স্পষ্ট যে, রোমক বাহিনী মুসলিমদের তাবুক পর্যন্ত পৌছে যাওয়ার খবর জানতে পেরেছিল; তাই তারা নিজেদের সীমান্তের ভেতর সরে আসাকে শ্রেয় মনে করে। আরবদের সামরিক তৎপরতার পরীক্ষিত বিজয়ক্ষেত্র মরুভূমি থেকে দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদের ঘাঁটির কাছাকাছি থেকে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে তারা প্রাধান্য দেয়।

নবীজি রোমকদের সরে যাওয়ার কথা জানতে পেরে মদিনায় ফিরে আসেন। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের আমিরদের ওপর তাঁর নামমাত্র কর্তৃত্ব যথেষ্ট মনে করেন। এটি ছিল নবীজির স্বশরীরে অংশগ্রহণ করা শেষ যুদ্ধ।[১৩৮]

ওফাত

দশম হিজরিতে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১ লক্ষ সাহাবির এক বিশাল কাফেলা নিয়ে হজ আদায়ের লক্ষ্যে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন। খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডারে তখন ৬৩১ সন। আরাফার পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে নবীজি তাঁর ঐতিহাসিক বিদায়ী ভাষণ প্রদান করেন। যেটিকে ইসলামি সংবিধানের অংশ গণ্য করা হয়। এই ভাষণে তিনি ইসলামের মূলভিত্তি,

---

১৩৪. **তাবুক :** ওয়াদিল কুরা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি জায়গা।—মুজামুল বুলদান, খ. ২, পৃ. ১৪।

১৩৫. **আযরুহ :** সিরিয়ার দিকে শারাত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, অপরদিকে বালকার নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ২, পৃ. ১২৯।

১৩৬. **জারবা :** হিজাজের দিকে সারাওয়াত পর্বতমালার নিকটস্থ শামের বালকায় অবস্থিত। ওমান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। জারবা আজরুহের একটি জনপদ।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ২, পৃ. ১১৮।

১৩৭. **দুমাতুল জান্দাল :** দামেশক থেকে সাত মনজিল দূরে; মদিনা ও দামেশকের মাঝামাঝি অবস্থিত একটি জায়গা।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ২, পৃ. ৪৮৭, ইয়াকুত হামাবি।

১৩৮. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ৪, পৃ. ১৭৩-১৭৯।

মূলনীতি ও নিয়মনীতি নির্ধারণ করে দেন। মানুষের মাঝে সমতা বিধানের আহ্বান জানান। তারপর হজ শেষ করে মদিনায় ফিরে যান।

বিদায় হজের তিন মাস পার হয়েছে মাত্র। একদিন নবীজি জ্বরে আক্রান্ত হন। ৬৩ বছর বয়সে একাদশ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল নবীজি ওফাত লাভ করেন। খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডারে সময়টা তখন ৬৩২ সনের জুন মাসের সাত তারিখ। মৃত্যুর পূর্বে নবীজি তাঁর ওপর অর্পিত রিসালাত ও আমানত যথাযথভাবে পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে দেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাযি.-এর ঘরে ওফাত লাভ করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১৩৯]

ওফাতের সময় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে যান দৃঢ়, সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ একটি উম্মাহ। লাগাম পরিয়ে যান জাতিবাদী-অন্ধত্ব ও কুসংস্কারের মুখে। প্রতিষ্ঠিত করে যান এক সরল সুস্পষ্ট মজবুত ধর্ম—যা আজও টিকে আছে। রেখে যান চারিত্রিক উৎকর্ষ; যার ভিত্তি হলো নির্ভীকতা ও সম্মানবোধ। এক প্রজন্মে তিনি বহু যুদ্ধে বিজয় লাভ করতে সক্ষম হন। প্রতিষ্ঠা করেন একটি বিশাল রাষ্ট্র।
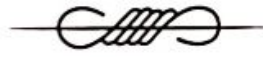
[১৩৯]. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ২৩০-২৩২, ২৪৬-২৪৭, ২৫৮-২৫৯; আরও দ্রষ্টব্য : *আর-রাওযুল উনুফ*-এর টীকা : খ. ৪, পৃ. ২৭০; *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ২০০।

তৃতীয় অধ্যায়

খেলাফতে রাশেদার যুগ

(১১-৪০ হি. ◆ ৬৩২-৬৬১ খ্রি.)

I

খোলাফায়ে রাশেদিন

আবু বকর সিদ্দিক রাযি.	১১-১৩ হি./৬৩২-৬৩৪ খ্রি.
উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.	১৩-২৩ হি./৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.
উসমান বিন আফফান রাযি.	২৪-৩৫ হি./৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.
আলি বিন আবু তালেব রাযি.	৩৬-৪০ হি./৬৫৬-৬৬১ খ্রি.

|

আবু বকর সিদ্দিক রাযি.

(১১-১৩ হি./৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)

খেলাফত প্রসঙ্গ

নবীজির ওফাত-পরবর্তী মদিনার রাজনৈতিক পরিস্থিতি
আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-কে নির্বাচিতকরণ

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত সকল মুসলিমের হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। এদিকে ধর্ম ও রাজনীতিতে তাঁর সাফল্যগাথার সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। সেই সঙ্গে ওফাতের খবর প্রচারের পরক্ষণেই খলিফা নিয়োগের বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। কারণ, কুরআন মাজিদে রাসুলুল্লাহর খলিফা নির্বাচনের নীতিমালা নির্ধারণে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য প্রদান না করে পরামর্শ, নিরপেক্ষতা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু রাসুলুল্লাহর কর্মপন্থা ও জীবনাচার ছিল কুরআনুল কারিমের সম্পূর্ণ অনুকূল, এ কারণে তিনিও এ সকল তাৎপর্যকে সামনে রেখে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ প্রদান করেননি। যেন তিনি এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, মুসলিমরা আরবদের প্রবর্তিত গোত্রীয় রীতি অনুযায়ী পরামর্শের ভিত্তিতে খলিফার পদের উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করে নেবে। অধিকন্তু তিনি কোনো পুত্রসন্তান রেখে যাননি, যে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

আনসার সাহাবিগণ বনু সায়িদার বৈঠকঘরে[১৪০] খেলাফতের বিষয়ে আলোচনার জন্য সমবেত হন। এ আলোচনা সভার আহ্বায়ক কে ছিলেন এবং কীভাবে লোকজনের কাছে দাওয়াত পৌছানো হয়, সে-সম্পর্কে ইতিহাসের উৎসগ্রন্থসমূহে সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। বরং এতটুকু বর্ণিত

---

[১৪০]. বনু সায়িদা হলো মদিনার আনসারদের একটি গোত্র, আর বৈঠকখানাটি ছিল মূলত একটি চালাঘর। এর নিচে বসে তারা সভা করত। এটিকেই সাকিফায়ে বনু সায়িদা বলে।

হয়েছে যে, সেই বৈঠকঘরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আনসারগণ মুসলিমদের দায়িত্বশীল হিসেবে খাযরাজ গোত্রের সর্দার সাদ বিন উবাদাহর নাম প্রস্তাব করেন।[১৪১] কারণ, ইতোমধ্যেই তারা মদিনার হেফাজত এবং মুসলিমদের যাবতীয় বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন খলিফা নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তা ছাড়া বেদুইন ও আশপাশে বসবাসরত গোত্রগুলোর কারণে তাদের শহরটি ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। এদিকে মুহাজিরদের একটি দল রাসুলুল্লাহর কাফন ও দাফন সমাধার কাজে নিমগ্ন ছিল। অপর একটি দল দুঃখভারাক্রান্ত ছিল। তৃতীয় আরেকটি দল ছিল, যারা রাসুলুল্লাহর দাফনকার্য শেষ হওয়ার পূর্বে খলিফা নির্বাচনের কথা চিন্তাই করেনি।[১৪২]

যখন বনু সায়িদার বৈঠকখানায় আনসারদের সমবেত হওয়ার সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন আবু বকর রাযি. ও উমর রাযি. বিষয়টির গুরুত্ব, সংবেদনশীলতা এবং সিদ্ধান্তের জটিলতা অনুভব করে দ্রুত সেদিকে রওনা করেন। পথিমধ্যে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যান। সভাস্থলে পৌঁছামাত্রই আবু বকর উপস্থিত লোকদের অন্তরে জায়গা করে নেন এবং রাসুলুল্লাহর খলিফা নির্বাচনের বিষয়ে শ্রদ্ধা ও শালীনতার সঙ্গে মুহাজিরদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করে বক্তব্য প্রদান করেন।[১৪৩]

রাসুলুল্লাহর খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা হয়। বিভিন্নজনের নাম প্রস্তাব করা হয়। পরিশেষে সকল মুসলিম একবাক্যে এ কথা মেনে নেয় যে, আবু বকরই হবেন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম খলিফা। কারণ, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনিই তাঁর পরিবর্তে নামাজ পড়িয়েছেন এবং তিনিই ছিলেন হিজরতের সহযাত্রী ও গুহার একমাত্র সঙ্গী। এ ছাড়াও মজবুত ঈমান ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া এবং আল্লাহর রাস্তায় ত্যাগ স্বীকারে তিনি ছিলেন অনন্য।[১৪৪]

---

১৪১. *তারিখে তাবারি*, খ. ২, পৃ. ২০০।

১৪২. *আত-তারিখুল ইসলামি*, *আল-খুলাফাউর রাশিদুন*, পৃ. ৪৯-৫১।

১৪৩. বক্তব্যের কথাগুলো ইমাম তাবারি তাঁর *তারিখ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, খ. ৩, পৃ. ২১৯-২২০।

১৪৪. প্রাগুক্ত : খ. ৩, পৃ. ২০১-২১১ ও ২১৮-২২৩।

আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর গুরুত্বপূর্ণ কীর্তিসমূহ

উসামা বিন যায়দের বাহিনী প্রেরণ

রাসুলুল্লাহ তাঁর ওফাতের পূর্বে সিরিয়ার উপকণ্ঠে অভিযান প্রেরণের জন্য উসামা বিন যায়দের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, মুতা যুদ্ধে নিহতদের পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ ও গাসসানিদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু উসামার কাছে নবীজির অসুস্থতার সংবাদ পৌঁছলে তিনি মদিনার নিকটবর্তী 'যুখাশাব' নামক জায়গায় সেনাছাউনি স্থাপন করে যাত্রাবিরতি করেন।

আবু বকরের হাতে বাইআত গ্রহণের পর কয়েক দিন যেতে না যেতে তিনি সেই সেনাবাহিনীকে তার লক্ষ্যপানে যাত্রার নির্দেশ প্রদান করেন। অধিকাংশের মত ছিল, বিভিন্ন গোত্রের লোকদের মধ্যে ধর্মত্যাগের আলামত প্রকাশ পাওয়ার কারণে এ মুহূর্তে বাহিনী প্রেরণ মুলতুবি করা। অথবা অল্পবয়সী হওয়ার কারণে সেনাপতি পরিবর্তন করা উচিত। কিন্তু আবু বকর রাযি. এসব মত গ্রহণ না করে যথারীতি বাহিনী প্রেরণ করেন। এমনকি তিনি নিজে গিয়ে সেই বাহিনীকে বিদায় জানান এবং তাদের দিকনির্দেশনা ও উপদেশ প্রদান করেন। সেই উপদেশগুলো ছিল এমন, যা যুদ্ধকালীন পারস্পরিক আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে অবশ্যপালনীয় ও মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা হয়।[১৪৫]

(রিদ্দাহ) ধর্মত্যাগের যুদ্ধ

ধর্মত্যাগের কারণসমূহ

আবু বকরের খেলাফতের সংক্ষিপ্ত সময়ে দুটি বিষয় নতুন করে সামনে আসে। একটি হলো ধর্মত্যাগ, অপরটি হলো জাজিরাতুল আরবের সীমানার বাইরে ইসলামের বিজয়ের সূচনা। ইসলামের প্রচার-প্রসার ও আরবের ভবিষ্যতের ওপর দুটিরই বিশেষ প্রভাব ছিল। সমস্ত উৎসগ্রন্থ থেকে প্রতীয়মান

---

[১৪৫]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ২২৩-২২৭।

হয় যে, রাসুলুল্লাহর ইন্তেকালের পর জাজিরাতুল আরবের আশপাশে ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় এবং ধর্মত্যাগের আন্দোলন বা ইসলাম থেকে ধর্মান্তরের কারণে বিভিন্ন গোত্রে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।[১৪৬] সেই সঙ্গে একটি কুচক্রী মহল জাজিরাতুল আরব অঞ্চলে ইসলামের প্রভাব-বলয় সীমিত করার প্রচেষ্টায় রত থাকে। এ সবকিছু উদীয়মান ইসলামি রাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষায় বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

নবীজির সাধারণ নীতি ছিল, আরব জাতিকে ইসলামের পতাকাতলে এমন এক আদর্শে একতাবদ্ধ করা—যা হবে তাদের গোত্রীয় ব্যবস্থাপনার চেয়ে অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ। মহান আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহ এবং তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যের মাধ্যমে তিনি এমন একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দল গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন—যা একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের অবকাঠামো দাঁড় করিয়েছে। এর ফলে আরবরা দলে দলে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে এর পতাকাতলে সমবেত হতে শুরু করে এবং রাসুলুল্লাহকে তাঁদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু (রিদ্দাহ) ধর্মত্যাগের আন্দোলনের লোকেরা চারিদিকে এর রাজনৈতিক অবকাঠামোর দুর্বলতা ও ইসলামে প্রবেশের ক্ষেত্রে হেঁয়ালিপনা প্রকাশ করতে থাকে! সেই সঙ্গে তাদের আচরণ এ কথাও প্রমাণ করে যে, তখনো পর্যন্ত তাদের অন্তরে ধর্মের বন্ধনের চেয়ে গোত্রীয় রীতিপ্রথার শিকড় বেশি শক্তিশালী ছিল।

বাস্তবতা হলো, নবীজির জীবদ্দশায় মক্কা, মদিনা, তায়েফ ও তার আশপাশের গোত্রগুলো ছাড়া অন্যদের মধ্যে তাওহিদ বা একত্ববাদের নীতি পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং তাদের অন্তরে দ্বীনি চেতনা বদ্ধমূলও হয়নি। বরং জাজিরাতুল আরবের অনেক এলাকার লোক রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে নামেমাত্র মুসলিম শাসকের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। অর্থাৎ তারা ইসলামকে আলিঙ্গন করেছেন ঠিকই; কিন্তু তাদের অন্তরে ব্যাধি কিংবা কিঞ্চিৎ কপটতা বিরাজমান ছিল।

রাসুলুল্লাহর ইন্তেকালের কারণে মদিনার ভেতর ও বাইরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর কিছুটা বিরূপ প্রভাব পড়ে। তখন কোনো কোনো গোত্র কিছু কিছু বিষয়ে স্বাধীনতা অর্জনের কথা চিন্তা করতে শুরু করে। কারণ, তাদের ধারণা ছিল—কুরাইশ তাদের স্বাধীনতা হরণ করে ধর্মের নামে

---

[১৪৬]. প্রাগুক্ত : খ. ৩, পৃ. ২২৫, ২৪২।

তাদের শাসনাধীন করেছে। ফলে তারা বৈষয়িক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার সংকল্প করে। ইসলাম মুসলিমদের ওপর যে জাকাতের বিধান দিয়েছে, এটাকে তারা নিজেদের জন্য আর্থিক জরিমানা ও অসম্মানজনক মনে করে, তাদেও জীবনে যার সাথে কখনো তারা অভ্যস্ত ছিল না। অথচ পরাজিত পক্ষ বিজয়ীকে জিযয়াস্বরূপ যে কর প্রদান করে, ইসলাম জাকাতকে সেরকম গণ্য করেনি। ফলে তারা আবু বকর রাযি.-এর কাছে জাকাত দিতে অস্বীকার করে।

নবীজির ইন্তেকালের পর কোনো কোনো গোত্রের মাঝে সাম্প্রদায়িকতার বিস্ফোরণ ঘটে। তারা আপত্তি তোলে—কুরাইশরা কেন সকল মুসলিমের নেতৃত্ব দেবে! অবশেষে তারা কুরাইশের শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্ব মেনে নিতে না পেরে তাদের বিপক্ষে রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে। তারা মনে করেছিল, নবীজির ইন্তেকালের পর এর নেতৃত্ব উত্তরাধিকার হিসেবে বহাল থাকবে, যে নীতিতে আরবরা বিশ্বাসী ছিল না। অনুরূপ তাদের মতামত গ্রহণ না করার কারণে আবু বকর রাযি.-এর নির্বাচন প্রক্রিয়াও তাদের মনঃপূত হচ্ছিল না। এ কারণে কিছু গোত্র এমনও ছিল, যারা আবু বকর রাযি.-এর হাতে সবার সঙ্গে বাইআত গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল।

সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি গোত্রগুলোর মাঝে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও হিংসা-বিদ্বেষ তো ছিলই। সেই সঙ্গে জাজিরাতুল আরবের বিভিন্ন প্রান্তে নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদাররা আত্মপ্রকাশ করেছিল। মূলত মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ যে বিশাল সফলতা অর্জন করেন এবং মক্কা ও মদিনা একীভূত হয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের যে বিশাল বিস্তৃতি ঘটে, এ বিষয়গুলো তাদের নবুওয়তের মিথ্যা দাবি করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

তা ছাড়া জাজিরাতুল আরবের বৈচিত্র্যময় জীবনধারা ছিল বিশৃঙ্খলার একটি অন্যতম কারণ। কেননা, তখন শহুরে ও গ্রাম্য লোকেরা তাদের জীবনাচারে বৈপরীত্য সত্ত্বেও পাশাপাশি বসবাস করত। যে কারণে জাতীয় ঐক্যের বিষয়টি একেবারে সহজ ছিল না। স্বভাবত বেদুইন ও গ্রাম্য লোকেরা শহুরে লোকদের মতো শাসকের আনুগত্য করত না। বেদুইন ও গ্রাম্য লোকেরা ছিল স্বাধীনচেতা। যে কারণে তাদের স্বাধীনতা খর্ব হয় বা তাদের জীবনাচারে বিধিনিষেধ আরোপ করে—এমন যেকোনো কিছুকে প্রতিহত করতে তারা সচেষ্ট ছিল। যখন আরবে একত্ববাদের দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম বিকশিত হতে শুরু করে, তখন তারা আশঙ্কা করে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঐক্য

পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক ঐক্যের রূপ পরিগ্রহ করবে এবং বেদুইন লোকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে।[১৪৭]
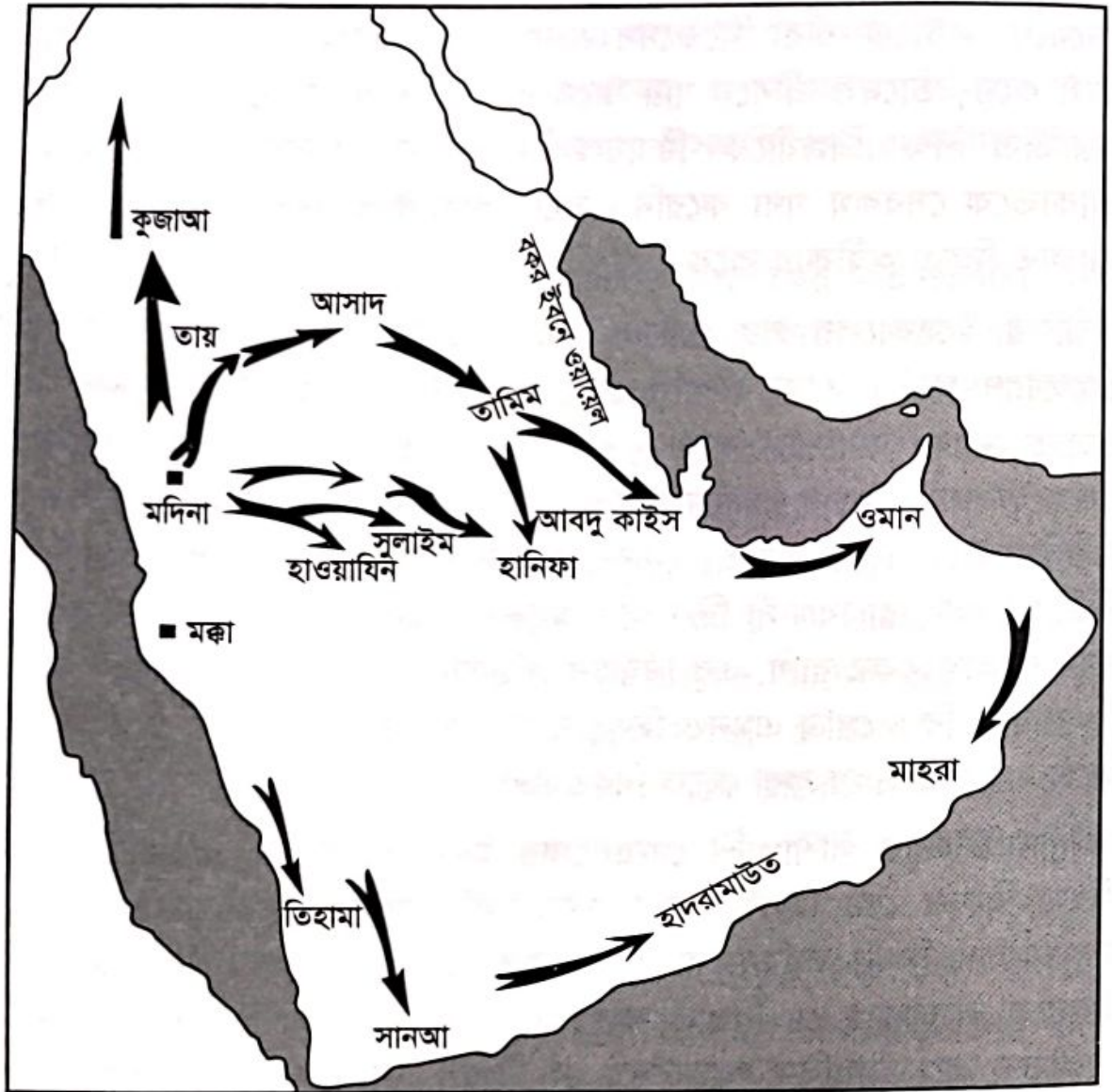
রিদ্দাহর যুদ্ধে প্রেরিত সেনাদল

আরবের অবস্থা অস্থিতিশীল করা ও বিভিন্ন গোত্রকে ধর্মত্যাগে প্ররোচিত করার ক্ষেত্রে বৈদেশিক চক্রান্তেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। কারণ, তারা এ কথা খুব ভালো করে রপ্ত করেছিল, আরবদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এতই বেশি যে, নতুন ধর্ম ছাড়া তাদের মাঝে ঐক্যের বিকল্প কোনো উপায় নেই। তাই নবীজি তাঁর জীবদ্দশায় পার্শ্ববর্তী যেসব দেশের রাজা-বাদশা ও শাসকবর্গের কাছে—যাদের মাঝে পারস্য ও রোমের সম্রাটও ছিলেন—ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন, নবীজির ইন্তেকালের পর তারাই আরব

---

১৪৭. *আস-সিদ্দিক আবু বকর*, মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল, পৃ. ৯৯-১০০।

ভূখণ্ডের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টির দুরভিসন্ধি আঁটে।[১৪৮]

এভাবে নবীজির ইন্তেকালের ফলে দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট মুসলিম, মুনাফিক ও কুরাইশের প্রতিপক্ষরা তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা ও স্বাধীনতার আগ্রহ প্রকাশের সুযোগ পেয়ে যায়। তো উদীয়মান ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য ধর্মত্যাগের ফিতনাটি ছিল প্রথম আঘাত এবং আবু বকর রাযি.-এর জন্য প্রথম অগ্নিপরীক্ষা।

এ থেকে বোঝা যায়, ধর্মত্যাগের আন্দোলনের পটভূমিতে একাধিক কারণ জড়িত ছিল। যদিও সেই কারণগুলো বাহ্যত একজাতীয় নয় এবং কোনোটিই এককভাবে পরিস্থিতি বিনষ্টকারীও নয়; তবে সবগুলো একত্রে মিলে সম্মিলিত রূপ ধারণ করে বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

মুরতাদদের মোকাবেলা

আবু বকর রাযি. তাঁর দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে মুরতাদ, নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদার ও জাকাত অস্বীকারকারীদের মোকাবেলা করেন এবং এ চ্যালেঞ্জের সামনে নিজেকে রাষ্ট্রের একজন অকুতোভয় বীরসেনানী ও নীতিনির্ধারক হিসেবে প্রমাণ করেন। যখন তিনি দেখলেন—কিছু গোত্র উদীয়মান ইসলামি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ও ইসলাম ধর্মের আকিদা-বিশ্বাসের ওপর আঘাত হানতে চলেছে, তখনই তিনি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে মুরতাদদের মূলোৎপাটনের জন্য প্রেরণ করেন এবং গোত্রগুলোর কাছে পত্র প্রেরণ করেন। এর পূর্বে তাদের দ্বীনের দুর্গে ফিরে আসার আহ্বান জানান। এভাবেই তিনি নবীজির ইন্তেকালের পর সৃষ্ট সংশয়-সন্দেহ দূর করেন। সেই সঙ্গে তাদের হত্যা, পুড়িয়ে মারা ও তাদের স্ত্রী-সন্তানদের বন্দি করার হুমকি প্রদান করেন।[১৪৯] আবু বকর তাঁর শাসনকালের প্রথম বছরেই ধর্মত্যাগের ফিতনার অবসান ঘটিয়ে সামরিক সফলতা অর্জন করেন। এর মাধ্যমে সমস্ত অঞ্চলে মদিনার কেন্দ্রীয় শাসন ও প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। এভাবে তিনি ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত করেন এবং উদীয়মান ইসলামি রাষ্ট্রের কেন্দ্র সুরক্ষার মাধ্যমে স্বীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে সমর্থ হন।

---

[১৪৮]. প্রাগুক্ত।

[১৪৯]. সেই পত্রের ভাষ্য জানতে দেখুন, ইমাম তাবারি রচিত *তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ২৪৯-২৫২।

জাজিরাতুল আরবের সীমানার বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তার

বিজয়াভিযানের কার্যকারণসমূহ

জাজিরাতুল আরবের সীমানার বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তারকে তাঁর খেলাফতকালের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তিনি ধর্মত্যাগের আন্দোলনের মূলোৎপাটন করে আশপাশের দেশগুলোতে ইসলাম প্রচারের প্রতি মনোনিবেশ করেন। একই সঙ্গে পারস্য ও রোমান বাইজেন্টানদের সাথে যুদ্ধের সংকল্প করেন। কারণ, পারস্যরা দাওয়াতের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত, ইসলামের শত্রুদের সাহায্য করত এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুরতাদদের প্ররোচিত করত। এদিকে বাইজেন্টাইনরাও দাওয়াত প্রচারকারীদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হতো, প্রতিপক্ষকে সহযোগিতা করত এবং খ্রিষ্টান গোত্রসমূহকে তাদের বিরুদ্ধে উসকে দিত। যে-কারণে উভয় দলের সঙ্গে যুদ্ধ করা জরুরি হয়ে পড়ে।[১৫০] এরপর তিনি পারস্য ও সিরিয়া বিজয়ের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত বাহিনী প্রেরণ করতে থাকেন।

মুসলিমদের বিজয়াভিযান প্রেরণের কারণ সম্পর্কে দুই ধরনের বিশ্লেষণ প্রচলিত আছে। একটি হলো প্রাচীন বিশ্লেষণ; অপরটি আধুনিক বিশ্লেষণ। প্রাচীন বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই—মুসলমানদের জাজিরাতুল আরবের বাইরে বিজয়াভিযানের জন্য বের হওয়ার মূলে একটিমাত্র কারণ পাওয়া যায়। আর তা হলো, মৃত্যু-পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি মজবুত ঈমান ও দৃঢ়বিশ্বাস।

মূলত এ কারণেই যখন আবু বকর রাযি. জিহাদের ডাক দেন, তখন মুসলিমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনতিবিলম্বে এর পক্ষে সাড়া প্রদান করে। তিনি মক্কা, তায়েফ, ইয়েমেন এবং নজদ ও ইয়েমেনের সকল আরবদের প্রতি জিহাদের আহ্বান জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে রোমের গনিমতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেন। ফলে মানুষ সওয়াবের আশা ও সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মদিনার প্রতি ধাবিত হয়।[১৫১]

তবে বালাজুরির বর্ণনা বিজয়াভিযানের সময়কাল ও প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে অন্য একটি কারণের দিকে ইঙ্গিত করে। কেননা আমরা জানি—

---

১৫০. *আত-তারিখুল ইসলামি* : তৃতীয় খণ্ড, আল-খুলাফাউর রাশিদুন : মাহমুদ শাকির, পৃ. ৮১।

১৫১. *ফুতুহুল বুলদান*, বালাযুরি, পৃ. ১১৫।

যুদ্ধাভিযানের শুরুর দিকে যে-সকল গোত্র অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সকলের মনে তখনো পর্যন্ত ইসলাম এত বেশি বদ্ধমূল হয়নি, যা তাদেরকে যুদ্ধের মতো একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিজেদের জড়াতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। বরং বিজিত অঞ্চলগুলোতে ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠা ছাড়াও তাদের ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য ছিল।

বালাজুরি বিজয়াভিযানের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তার কারণসমূহ থেকে এ দিকটিকে বের করে এনেছেন এবং তিনি ইসলামের আবশ্যিক বিধান হিসেবে জিহাদে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু গোত্রের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন। উপরন্তু ইরাকে পারস্য বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত 'ওয়ালাজা'[১৫২] যুদ্ধ-পরবর্তী খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর বক্তব্য বিজয়াভিযানের কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের বিষয়টিকেও স্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তোলে। এ সময় তিনি সৈন্যদেরকে জিহাদের ফজিলত অর্জন ও শত্রুপক্ষ থেকে গনিমত লাভে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সাহসিকতাপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর খেলাফত আমলের আগ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর জন্য কোনো ভাতা বরাদ্দ ছিল না। বরং স্বয়ং নবীজি ও আবু বকর রাযি.-এর যুগে তাদেরকে শুধু গনিমত থেকে অংশ দেওয়া হতো। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. তার সেই বক্তব্যে বলেন, আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহর পথে জিহাদ এবং তাঁর দিকে আহ্বান করা আমাদের ওপর ফরজ না হতো; বরং জীবিকা উপার্জন করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হতো, তাহলে আমি তোমাদের এ পরামর্শই দিতাম যে, তোমরা এ উর্বর ভূমির জন্য যুদ্ধ করো এবং এর কর্তৃত্ব করো। আর ক্ষুধা-মন্দা ও দারিদ্র্য ওই সকল লোকদের জন্য বাকি থাক, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পিছপা হয়েছে।[১৫৩]

তাঁর এ বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালীন যুগে জাজিরাতুল আরবের অধিক জনসংখ্যা ও খাদ্যের অপর্যাপ্ততার কারণে সেখানে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল এবং তারা দুঃসহ জীবনযাপন করছিল। তাদের এ দুঃসহ অবস্থার দাবি ছিল—পার্শ্ববর্তী উন্নয়নশীল ও সমৃদ্ধশালী দেশসমূহ থেকে সমৃদ্ধি আনয়নের চেষ্টা করা। এটিও ছিল অন্যতম কারণ, যা

---

১৫২. **ওয়ালাজা :** কাসকার শহরের অন্তর্গত স্থলভূমির নিকটবর্তী একটি স্থান।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ৪, পৃ. ৩৮৩।

১৫৩. *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ৩৫৪।

তাদেরকে অর্থনৈতিক যাতনা থেকে মুক্তির আশায় দুঃসাহসিক উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।[১৫৪]

অবশ্য আরবদের জাজিরাতুল আরবের বাইরে গিয়ে অভিযান পরিচালনার পেছনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। তৎকালীন বৃহৎ দুটি সাম্রাজ্য পারস্য ও বাইজেন্টাইনের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ শুরু হয়। আবার এ দুটি সাম্রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের কারণে তাদের শক্তি বিনষ্ট হয় এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার খালি হয়ে যায়। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক অঙ্গনে চরম অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সাম্রাজ্য দুটি দেওলিয়াত্বের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এ ঘাটতি পূরণের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলরা জনগণের ওপর নতুন করে করের বোঝা চাপিয়ে দেয়। যা সাধারণ জনগণকে তাদের প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। এদিকে প্রশাসন রাষ্ট্রপরিচালনা ও জনগণের নিরাপত্তা প্রদানে অক্ষমতা প্রকাশ করে। এসব কারণে উভয় রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসনের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের স্থলে তৃতীয় একটি রাজনৈতিক শক্তির আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

---

[১৫৪]. ড. সুহাইল তাক্কুশের এই বিবরণ পড়লে পাঠকের মনে মুসলিম অভিযানের যে-চিত্রটি ভেসে উঠবে তা হলো—উপনিবেশবাদ। পশ্চিমা 'গবেষক'রা মুসলিম অভিযানগুলোকে এভাবে দেখাতেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এতে করে জিহাদের মহান উদ্দেশ্যটিকে আড়াল করে মুসলিমদের অর্থলিপ্সু এক বর্বর জাতি হিসেবে উপস্থাপন করা সহজ হয়।

পরবর্তী সময়ের যুদ্ধগুলোর ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণ ক্ষেত্রবিশেষে মানা গেলেও খেলাফতে রাশেদার অভিযানগুলোর ক্ষেত্রে এই অভিযোগ নিছকই অজ্ঞতা ও শঠ প্রবণতা। ইসলামের মূল লক্ষ্য হলো—পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার কালিমাকে বুলন্দ করা। আল্লাহ তাআলার জমিনে তার আইন বাস্তবায়ন করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে শুরু হওয়া সেই সিলসিলাকে খুলাফায়ে রাশেদিন এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসেবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এলেও ইসলামের যুদ্ধগুলো অর্থনৈতিক অভিযান ছিল না; ছিল শরিয়তসম্মত জিহাদ। জিহাদের ময়দানে সেনাবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বৈষয়িক প্রণোদনার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে—জিহাদের এটাই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। খোদ নবীজিও যুদ্ধক্ষেত্রে বলেছেন, "কেউ যদি কোনো কাফেরকে হত্যা করে, তাহলে তার যুদ্ধলব্ধ অস্ত্র ও সম্পদ হত্যাকারী পাবে।" [*সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩১৪২] অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিছক অর্থনৈতিক কারণে যুদ্ধ করেননি; বরং দ্বীনি উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছেন। প্রেক্ষাপট অনুসারে কখনো-বা মুশরিকদের দুর্বল করতে অর্থনৈতিক অবরোধ ও অভিযান চালিয়েছেন। তবে উদ্দেশ্য অর্থসম্পদ ছিল না; বরং ইসলামকে বিজয়ী করাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য।

সুতরাং হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযি.-এর ভাষণ থেকে যে-সিদ্ধান্তে লেখক পৌঁছেছেন, জিহাদকে এতটা সরলীকরণ করা যায় না এবং ইতিহাসও তাকে সমর্থন করে না।—নিরীক্ষক

আবার আরব মুসলমান ও বিভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাসরত আরবদের মধ্যকার সুসম্পর্ক মুসলমানদের জাজিরাতুল আরবের বাইরে গিয়ে অভিযান পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন, সিরিয়া ও ইরাকে পূর্ব থেকেই কিছু আরব গোত্রের বসবাস ছিল, যারা বিনা দ্বিধায় জাজিরাতুল আরব হতে আগত মুসলমানদের হাতে ইসলামি শাসন গ্রহণ করে।

এসব রাষ্ট্রে ইসলামের বিস্তারে ধর্মীয় নিপীড়নেরও অন্যতম ভূমিকা ছিল। যেমন, রোমান বাইজেন্টাইনরা ইয়াকুবিয়্যা ও নাসতুরিয়্যার মতো অন্যান্য খ্রিষ্টান শাখাদলের ওপর মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে নিপীড়ন চালাত।

এ সকল প্রেক্ষাপটের কারণে আধুনিক ইতিহাসবিদদের অনেকে ইসলামি বিজয়াভিযানসমূহের পর্যালোচনায় অন্য কার্যকারণকে উপেক্ষা করে কেবল একটি দিককে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে বাস্তবতা হলো, শুধু একদিক বিবেচনায় বিষয়টিকে মূল্যায়ন করলে পাঠকদের সামনে এর প্রকৃত রূপটি অস্পষ্ট থেকে যাবে। তা ছাড়া বিশ্বাস ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এ সকল বিজয়ের মূল্যায়ন ব্যাহত হবে।[১৫৫]

প্রকৃত কথা হচ্ছে—এ সকল বিজয়াভিযানের কারণ হিসেবে এককভাবে কোনো একটি বিষয়কে দায়ী করা যথার্থ নয়। বরং ইসলামি বিজয়সমূহ ছিল দীর্ঘ গবেষণার ফসল। চিন্তাশীল ও নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টিতে যার পেছনে একাধিক কারণ ছিল। সেই সমস্যাগুলো সাধারণ মুসলমানদেরও সামনে ছিল। এ সবকিছুর ভিত্তিতে যুদ্ধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ইসলামি আকিদায় বিশ্বাসী বীরসেনারা তার সফল বাস্তবায়ন ঘটায়। এভাবেই তারা বিজিত অঞ্চলগুলোতে ইসলামের শিক্ষা ও জ্যোতির্ময় আলো ছড়িয়ে দেয়।

* * *

[১৫৫]. Camb. Med History : J. B. Bury. vol 2 p 331; *আল-আরব ফিত তারিখ*, লুইস বার্নার্ড, পৃ. ২৮, ৭৫; *আদ-দাওয়াতু ইলাল ইসলাম*, আরনল্ড, পৃ. ৪৭।

ইরাক বিজয়ের সূচনা

জাতুস সালাসিলের যুদ্ধ

ইসলামের বিজয়ের ধারাবাহিকতায় প্রথমে ইরাকে সামরিক অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ কারণে রিদ্দাহ যুদ্ধ সমাপ্তির পর থেকেই এখানকার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে মুসলিমদের একটি বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল। মুসান্না বিন হারিসা শায়বানি ছিলেন এ বাহিনীর সেনাপতি। তিনি দ্বাদশ হিজরির শুরু ভাগে ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হযরত আবু বকর রাযি.-এর অনুমতিক্রমে সামরিক তৎপরতা শুরু করেন। প্রকাশ থাকে যে, তাঁর দায়িত্ব ছিল কেবল তথ্য অনুসন্ধান ও খণ্ডযুদ্ধ পরিচালনা করে ক্ষান্ত থাকা। যে-কারণে এ বাহিনীটি আবু বকর রাযি. কর্তৃক খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ইয়াজ বিন গনমকে পারস্য বিজয়ের জন্য প্রেরণের পূর্বে গুরুতর কোনো সামরিক অভিযান শুরু করেনি।

এ সময় পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে নিযুক্ত হিরা প্রদেশের গভর্নর হুরমুজ মুসলিম সৈন্যদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে চেষ্টা করে। ফলে তার সাথে (মহররম ১২ হি./এপ্রিল ৬৩৩ খ্রি.) জাতুস সালাসিল নামক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. ও সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর কাছে সে পরাজিত হয়। ইতিহাসে এ যুদ্ধকে জাতুস সালাসিল বলে নামকরণ করা হয়, তার কারণ হলো, সালাসিল অর্থ জিঞ্জির বা শিকল। পারস্যের সৈন্যরা সেই যুদ্ধে রণাঙ্গন হতে পালানোর ভয়ে পায়ে শিকল বেঁধে নেমেছিল।[১৫৬]

প্রাথমিক বিজয়সমূহ

জাতুস সালাসিলে মুসলিমদের বিজয় তাদের ইরাক ও পারস্যের অঞ্চলগুলোতে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। সেখানে প্রবেশ করে তারা পারস্য বাহিনীর সঙ্গে—যাদের খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করে মুসলিমদের মোকাবেলা করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল—যুদ্ধ করতে থাকে। মুসলিমরা

---

১৫৬. *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯।

মুযার[১৫৭], ওয়ালাজাহ ও উলাইয়াসের যুদ্ধে[১৫৮] বিজয়ী হয় এবং হিরা, আনবার[১৫৯], আইনুত তামার[১৬০] ও দুমাতুল জানদাল[১৬১] জয় করে।

নিম্নে এ সকল বিজয়ের গুরুত্বের কিছু দিক তুলে ধরা হলো :

- মুসলিমদের সামনে ইরাক ভূখণ্ডে শক্ত অবস্থান তৈরির পথ উন্মোচিত হয়;
- পারস্যের অঞ্চলগুলোর গভীরে পৌঁছার সুযোগ তৈরি হয়;
- জাজিরাতুল আরবের বাইরে গিয়ে এই প্রথম সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ হয়।

উল্লেখ্য যে, যখন আবু বকর রাযি. খালিদ বিন ওয়ালিদকে ইরাক থেকে স্থানান্তর করে সিরিয়ার বাহিনীতে প্রধান সেনাপতি করে পাঠানোর মাধ্যমে সিরিয়ায় সামরিক তৎপরতা জোরদার করেন, সেই সঙ্গে মুসান্না বিন হারিসা ফিরে এসে সেনাপতি হিসেবে ইরাকি বাহিনীতে যোগদান করেন, তখন ইরাকি বাহিনীর সামরিক তৎপরতায় ভাটা পড়ে।

* * *

---

[১৫৭]. **মুযার :** ওয়াসিত ও বসরার মধ্যবর্তী মায়সানের অন্তর্গত একটি ছোট শহর। মুযার থেকে বসরার দূরত্ব চার দিনের পথ।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ৫, পৃ. ৮৮।

[১৫৮]. **উলাইয়াস :** মরুভূমির দিক থেকে ইরাকের প্রথম জনপদ। এটি আনবারের অন্তর্গত একটি গ্রাম।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ২৪৮।

[১৫৯]. **আনবার :** বাগদাদের পশ্চিমে ফোরাত নদীর তীরবর্তী একটি শহর। এর থেকে বাগদাদের দূরত্ব ১০ ফারসাখ বা ৩০ মাইল। পারস্যের লোকেরা এর নামকরণ করেছিল—'ফায়রুয সাবুর'।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ২৫৭।

[১৬০]. **আইনুত তামার :** কুফার পশ্চিম দিকে আনবারের নিকটবর্তী একটি শহর। শহরটি মরুভূমির প্রান্তে অবস্থিত।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ৪, পৃ. ১৭৬।

[১৬১]. *ফুতুহুল বুলদান*, বালাযুরি, পৃ. ২৪৬-২৪৮; *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ৩৫১-৩৫৮, ৩৭৮-৩৮০।

সিরিয়া বিজয়ের সূচনা

প্রাথমিক সংঘাতসমূহ

ইরাক বিজয়ের পর দ্বাদশ হিজরির শেষদিকে ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে সিরিয়া বিজয়ের লক্ষ্যে ইসলামি অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা শুরু হয়। ইতঃপূর্বে রোমের উত্তরাঞ্চলে উসামা বাহিনী যে-সফল অভিযান পরিচালনা করে, তাতে আবু বকর রাযি.-এর মনোবল বেড়ে যায়। তখন তিনি দুটি পতাকা প্রস্তুত করেন। খালিদ বিন সাইদ বিন আস রাযি.-কে একটি পতাকা দিয়ে সিরিয়ার উঁচু অঞ্চল অভিমুখে প্রেরণ করেন। আমর ইবনুল আস রাযি.-কে অপর একটি পতাকা দিয়ে কুজাআ অভিমুখে প্রেরণ করেন। খালিদ বিন সাইদের পতাকাটিকেই ইসলামের ইতিহাসে সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণকারী প্রথম পতাকা হিসেবে গণ্য করা হয়। পরবর্তী সময়ে খলিফা খালিদ বিন সাইদকে সেনাপতির পদ থেকে সরিয়ে ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ান রাযি.-কে তার স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তাকে মুসলিমদের অতিরিক্ত সহযোগী দল হিসেবে তায়মায়[১৬২] প্রেরণ করেন। তাকে আদেশ করেন—তিনি যেন তায়মাতেই অবস্থান করেন এবং খলিফার অনুমতি ছাড়া কোনো অবস্থায়ই সেই স্থান ত্যাগ না করেন।

এদিকে মুসলিমদের কর্মতৎপরতার সংবাদ বাইজেন্টাইনদের কানে পৌঁছে যায়। ফলে তারা সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী খ্রিষ্টান আরবদের নিয়ে বিশাল সৈন্যসমাবেশ করে। তখন আবু বকর রাযি. খালিদ বিন সাইদকে সংঘাতে না জড়িয়ে শুধু সামনে অগ্রসর হওয়ার আদেশ করেন। যখন তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে রোমানদের নিকটবর্তী হন, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। বাইজেন্টাইনদের এক সেনাপতি 'বাহান'-এর সঙ্গে তার লড়াই হলে তিনি বাহান ও তার বাহিনীকে পরাস্ত করেন।

খালিদ বিন সাইদ আবু বকর রাযি.-এর কাছে সার্বিক অবস্থার বিবরণ জানিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেন এবং তাঁর কাছে আশু সাহায্য কামনা করেন। তখন আবু বকর রাযি. জুলকালা হিমইয়ারি ও ইকরিমা বিন আবি জাহলকে তার

---

১৬২. তায়মা : সিরিয়া ও ওয়াদিল কুরার মধ্যবর্তী একটি ছোট্ট শহর। সিরিয়া ও দামেশকের হাজিরা এর পাশ দিয়ে হজে গমন করে।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ২, পৃ. ৬৭।

সাহায্যে প্রেরণ করেন। অতঃপর মৃত সাগরের (Dead Sea) দক্ষিণ উপকূলে বাহান বাহিনী আবার খালিদ বিন সাইদের মুখোমুখি হয়। বাহান তাকে দামেশকের উপকণ্ঠে সাফরার চারণভূমির দিকে গমনের সুযোগ দেয়। সেখানে পৌঁছতেই তাঁকে ঘেরাও করে বন্দি করে ফেলে এবং পেছনে ফিরে যেতে বাধ্য করে। ১৩ হিজরির ৪ মহররম, ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মার্চ এ ঘটনা ঘটে।[১৬৩] তখন থেকে আবু বকর রাযি. সিরিয়ার বিষয়ে উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি মুসলিমদের প্রত্যেক গোত্র থেকে যুদ্ধের জন্য সৈন্য তলব করেন এবং সিরিয়া অভিমুখে একাধিক বাহিনী প্রেরণ করেন।

আজনাদাইন[১৬৪] বা ইয়ারমুকের যুদ্ধ

আবু বকর রাযি. বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে চারটি বাহিনী গঠন করেন, যাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ২৪ হাজার। বাহিনী চতুষ্টয়ের প্রত্যেককে একটি করে পতাকা প্রদান করেন এবং তাদের জন্য চারজন সেনাপতি নির্বাচন করেন। তারা হলেন, ১. খালিদ বিন সাইদ বিন আস, পরে ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ানকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। এ বাহিনীর গন্তব্য ছিল দামেশক। ২. শুরাহবিল বিন হাসানাহ, তাকে বসরা অভিমুখে প্রেরণ করেন। ৩. আবু উবায়দা আমের ইবনুল জাররাহ, তার গন্তব্য ছিল হিম্‌স। ৪. আমর ইবনুল আস, তাকে ফিলিস্তিন অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ বাহিনীগুলোর সাথে বাইজেন্টাইনদের বেশ কয়েক জায়গায় সংঘর্ষ হয়। প্রথম সংঘর্ষটি ছিল গাজার অন্তর্গত 'দাছিন' নামক গ্রামে। ফিলিস্তিনের শাসক সারজিয়ুসের নেতৃত্বে বাইজেন্টাইনদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এ সংঘর্ষের সমাপ্তি হয়।[১৬৫]

এদিকে মুসলিম সেনাবাহিনীর তৎপরতা সম্পর্কে হিরাক্লিয়াসের কাছে সংবাদ পৌঁছে যায়। মুসলিমদের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিচ্ছিন্নভাবে আগমনের সুযোগ নিয়ে হিরাক্লিয়াস তাদের আলাদা আলাদা করে শেষ করে দিতে চায়। এ উদ্দেশ্যে সে হিমসে চলে যায়। সেখান থেকে ওয়ারদান ও তাজারুকের নেতৃত্বে দক্ষিণাঞ্চলের দিকে দেড় লাখের অধিক সৈন্যবিশিষ্ট দুটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করে।[১৬৬]

---

[১৬৩]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ৩৮৭-৩৯২।

[১৬৪]. আজনাদাইন হলো ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী সিরিয়ার একটি অঞ্চল।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ১০৩।

[১৬৫]. *ফুতুহুল বুলদান*, বালাযুরি, পৃ. ১১৬।

[১৬৬]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ৩৯২।

সিরিয়ার বিজয়সমূহ
সিরিয়া অভিমুখে প্রেরিত প্রথম যুগের ইসলামি বাহিনীসমূহ
১। ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ানের বাহিনী
২। শুরাহবিল ইবনে হাসানার বাহিনী
৩। আবু উবায়দা আমের ইবনুল জাররাহ-এর বাহিনী
৪। আমর ইবনুল আস-এর বাহিনী
রোম সাগর
বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য
সিরিয়া মরুভূমি
আদানা
মারাসিস
ইস্কানদারুনা
সুয়াইদিয়া
রা'সুল বাসিত
ওগারিত
লাতাকিয়া
জাবালা
বানিয়াস
তারতুস
আরওয়াদ
আরিদাহ
সাফিতা
সাইপ্রাস
আলেপ্পো
কিননাসরিন
খানা সিরাহ
মাআররাতুন নুমান
হাররান
তেলআবিব
আল-জাজিরা
রাক্কা
ফোরাত নদী
সাজুর নদী
বুশরা পাহাড়
সুখনা
তাদমোর
আইনুল বাইদা
ফারকাস
কাসরুল হিয়ার আল-গারবি
আল-কারয়াতাইন
আল-কুতাইনা
দামেশক
জাবালুশ শাইখ
বৈরুত
কুনাইতারা
নাওয়া
শাহবা
বুশরাস শাম
মাফরাক
যারকা
কাইসারিয়া
নাবলুস
আরসুফ
রামলা
কুদস
ওমান
মা'দাবা
জিবান
কারাক
মুতা
আল-কাতরানা
আইন হাসব
আন-নাকব
ওয়াদি মুসা
পেট্রা
মিয়ান
গারানদাল
জারম
আইলা
মিশর
সিনা

মুসলিমরাও হিরাক্লিয়াসের পরিকল্পনা সম্পর্কে জেনে যায়। তখন তারা পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সকলে বুসরার উপকণ্ঠে সমবেত হবে; কিন্তু সংখ্যাগত বিশাল ব্যবধানের কারণে এ মুহূর্তে সংঘাতে জড়াবে না। সেই সঙ্গে তারা নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে আবু বকর রাযি.-এর কাছে একটি পত্র প্রেরণপূর্বক তাঁর সম্মতি কামনা করে। আবু বকর রাযি. সেনাপতিদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলেন এবং বিপুল পরিমাণ সৈন্য প্রেরণ এবং বিচক্ষণ ও বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন অনুভব করলেন, যা কেবল খালিদ বিন ওয়ালিদের মধ্যেই রয়েছে। তখন তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদকে পত্র মারফত আদেশ করে, যেন তিনি মুসলিমদের সাহায্যে ইরাক থেকে সিরিয়ায় গিয়ে আবু উবায়দার স্থলে সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ খলিফার নির্দেশ পালনার্থে ৯ হাজার সৈন্য সঙ্গে নিয়ে ইরাক থেকে রওনা করেন। বুসরার প্রণালিতে পৌঁছে শুরাহবিল বিন হাসানাহ, ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ান, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ প্রমুখ সেনাপতির সঙ্গে মিলিত হন এবং এ মুহূর্তে অবশ্য করণীয় সামরিক পরিকল্পনার বিষয়ে পরামর্শ করেন। ২৫ রবিউল আউয়াল ১৩ হি./৩০ মে ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বুসরা বিজয়ের পর তারা সিদ্ধান্ত নেন—এখন আমর ইবনুল আসের বাহিনীকে বাঁচাতে হবে। থিউডোরাসের নেতৃত্বে বাইজেন্টাইন সৈন্যরা তার পিছু ধাওয়া করছিল এবং তিনি জর্ডান নদীর তীরবর্তী অঞ্চল দিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

অবশেষে রামলা ও জাবরিনের মধ্যবর্তী আজনাদাইন নামক এলাকায় বাইজেন্টাইনদের দুটি বাহিনী একত্র হয়। মুসলিম সৈন্যরাও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। জুমাদাল উলা/জুলাই মাসে দুপক্ষের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। মুসলমান ও বাইজেন্টাইনদের মধ্যে এটিই ছিল প্রথম বৃহৎ ও রক্তক্ষয়ী কোনো যুদ্ধ।[১৬৭]

আবু বকর রাযি.-এর মৃত্যু

খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে যখন একের পর এক অঞ্চল বিজিত হচ্ছিল, তখন মদিনা থেকে তাঁর কাছে পত্র এলো—আবু বকর রাযি. মৃত্যুবরণ

---

১৬৭. *তারিখু ফুতুহিশ শাম*, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-আযদি, পৃ. ৮৪-৯৬; *ফুতুহুল বুলদান*, বালাযুরি, পৃ. ১২০-১২১।

করেছেন এবং তিনি উমর রাযি.-কে মুসলিমদের খলিফা নিযুক্ত করেছেন। সেই পত্রে উমর রাযি. কর্তৃক খালিদ বিন ওয়ালিদের বিকল্প সেনাপতির পদে আবু উবায়দাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার আদেশও ছিল।[১৬৮]

আবু বকর রাযি. জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ২২ জুমাদাল উখরা ১৩ হি./২৩ আগস্ট ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে সোমবার সন্ধ্যায় মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। আয়েশা রাযি.-এর ঘরে নবীজির পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১৬৯]

---
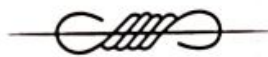
১৬৮. *ফুতুহুল বুলদান*, বালাযুরি, পৃ. ১২২; তারিখে তাবারিতে (খ. ৩, পৃ. ৩৯৮, ৪৩৪) বলা হয়েছে—১৩ হিজরিতে ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলাকালীন আবু উবায়দাকে সেনাপতির পদে পুনর্বহাল করা হয়।

১৬৯. *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ৪১৯-৪২৩।

|

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.

(১৩-২৩ হি./৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর কাছে বাইআত

যখন আবু বকর রাযি.-এর অসুস্থতা বেড়ে গেল এবং তিনি অনুভব করলেন যে, তিনি জীবনসায়াহ্নে উপানীত হয়েছেন, তখন তিনি পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি চূড়ান্ত করার ইচ্ছা করলেন; যেন এ নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে কোনো প্রকার বিভেদ সৃষ্টি না হয়। এ লক্ষ্যে তিনি শীর্ষস্থানীয় সাহাবি ও সাধারণ মুসলিমদের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে উমর রাযি.-কে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করেন। এরপর সকলে আবু বকর রাযি.-এর সঙ্গে সম্মতি পোষণ করে এবং উমর রাযি.-এর কাছে বাইআত গ্রহণ করে।[১৭০]

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম আবু বকর রাযি.-ই জীবদ্দশায় পরবর্তী উত্তরসূরি তথা খলিফা নির্দিষ্ট করে গেছেন। তাঁর পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খলিফা নিযুক্ত করা হয়।

* * *

---

[১৭০] তারিখুল ইয়াকুবি : খ. ২, পৃ. ২৪-২৬।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর যুগে ইসলামের বিজয়ের পূর্ণতা

পারস্য অভিযান

সেতুর যুদ্ধ[১৭১]

খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. ইরাক থেকে রোমে যাত্রার কারণে যখন এ দিকটার সামরিক শক্তিতে ঘাটতি দেখা দেয়, তখন উমর রাযি. ইরাকের সেনাবাহিনীর সামরিক সামর্থ্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ, মুসান্না বিন হারিসা সাওয়াদুল ইরাক (ইরাকের শ্যামলভূমি) থেকে অর্জিত গনিমতসমূহের যথাযথ হেফাজত করতে পারছিলেন না। তাই তিনি হিরায় প্রত্যাগমন করে সেখানকার সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন এবং খলিফার কাছে এ মর্মে পত্র প্রেরণ করেন। উমর রাযি. আবু উবাইদ বিন মাসউদ সাকাফিকে ৫ হাজার সৈন্য দিয়ে পারস্য বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ইরাক গমনের নির্দেশ প্রদান করেন। একই সময়ে মুসান্না বিন হারিসাকে পত্র মারফত আদেশ করেন, তিনি যেন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আবু উবাইদের সাথে মিলে যুদ্ধ করেন।

বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষের পর আবু উবাইদ তাঁর বাহিনী নিয়ে 'কিসসুন নাতিফ' নামক এলাকায় পৌছেন। এটি হিরার অদূরে ফোরাত নদীর তীরবর্তী একটি জায়গা। এটি আবার মারুহা নামেও পরিচিত। মুসান্না বিন হারিসাও তাঁর বাহিনী নিয়ে এখানে এসে আবু উবাইদের সঙ্গে মিলিত হন। পারস্য সম্রাট বাহমান জাদাওয়াইহ—যার উপাধি ছিল যুল হাজিব—এর নেতৃত্বে ৪ হাজার যোদ্ধার এক বাহিনী প্রেরণ করেন। বাহমান তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফোরাত নদীর অপর প্রান্তে তাঁবু গাড়েন। অতঃপর আবু উবাইদ নদী পার হয়ে পারস্য সেনাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। উভয় পক্ষের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে আবু উবাইদ শহিদ হন (এবং ৪ হাজার মুসলিম সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন)। আক্রমণের চাপ সইতে না পেরে মুসলিম সৈন্যরা নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে; কিন্তু তাতে বিপত্তি ঘটে।

---

১৭১. এটিকে কিসসুন নাতিফ, মারুহা ও কারকাসের যুদ্ধও বলা হয়।

কারণ, কোনো এক মুসলিম সেনা সেতুর তক্তা উঠিয়ে তার রশি কেটে দিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল—মুসলিমরা যাতে বিজয় ছিনিয়ে আনার পূর্বে পেছনে ফিরে না যায়। মূলত এটি ছিল একটি নির্বুদ্ধিতামূলক কাজ। এ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মুসলিমদের মনোবল ভেঙে পড়ে। বহু মুসলিম পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন। তখন মুসান্না বিন হারিসা দ্রুত সেতু মেরামতের ব্যবস্থা করে অবশিষ্ট সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নদী পার হয়ে হিরায় এবং সেখান থেকে উলাইয়াস গমন করেন। এ কারণে বাহমান বিজয়ের পূর্ণ স্বাদ উপভোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ১৩ হিজরির শাবান মাস মোতাবেক ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[১৭২]

বুওয়াইব যুদ্ধ[১৭৩]

সেতুর যুদ্ধে পরাজয় মুসলিমদের পূর্বের অর্জনগুলো নষ্ট করে দেয় এবং যুদ্ধে উভয় পক্ষের মধ্যে সমতাভিত্তিক প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করে। এদিকে মুসান্না বিন হারিসার অবস্থান শোচনীয় হয়ে পড়ে। রণাঙ্গনে নতুন সামরিক সহায়তা আসার পূর্বে বিজয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই মুসান্না বিন হারিসা উমর রাযি.-এর কাছে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির সাহায্যের আবেদন জানিয়ে পত্র পাঠান। পত্র পেয়ে খলিফা এ বিষয়ে তৎপর হয়ে ওঠেন। ত্বরিত একটি বাহিনী প্রস্তুত করে জারির বিন আবদুল্লাহ বাজালির নেতৃত্বে ইরাক অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং মুসান্না বিন হারিসার বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এদিকে পারস্য সম্রাটও মুসলিমদের মোকাবেলার জন্য মেহরান বিন বাজান হামাদানির নেতৃত্বে ১২ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। রমজান/নভেম্বর মাসে বুওয়াইব নামক এলাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিমরা সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করে। ইরানিদের যে-সকল সৈন্য পলায়ন করেছিল, মুসলিমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। এভাবে তারা সাওয়াদুল ইরাক থেকে মাদায়েনের অদূরে 'সাবাত' পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সমগ্র এলাকা মুসলিমদের অধিকারে চলে আসে।[১৭৪]

---

১৭২. *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ৪৫৪-৪৬০।

১৭৩. **বুওয়াইব** : এটি ইরাকের কুফায় অবস্থিত একটি নদী। ফোরাত নদীর অববাহিকা থেকে এ নদীর উৎপত্তি।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ৫১২।

১৭৪. *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ৪৬০-৪৭২। মাদায়েন হলো পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী। এ নগরের স্থপতি হলেন আনোশেরওয়াঁ বিন কাবাজ। দজলা ও ফোরাত নদীর মোহনা বরাবর তিনি এ শহর নির্মাণ করেন।

কাদিসিয়্যার যুদ্ধ[১৭৫]

মুসলিমদের সামনে অনবরত পরাজয়ের কারণে পারসিকদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হয়। তখন তারা রানি বুরান বিনতে খসরু পারভেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তার পরিবর্তে ইয়াজদেগির্দ বিন শাহরিয়ার বিন খসরুকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। সেই সঙ্গে তারা নিজেদের মধ্যকার সকল কলহ-বিবাদ ভুলে গিয়ে একযোগে কাজ করে সাওয়াদ (শ্যামলভূমি) পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শুরু করে। এ লক্ষ্যে তারা পারস্যের বিখ্যাত সেনাপতি রুস্তম বিন হুরমুজের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী গঠন করে।

মুসান্না বিন হারিসার কাছে এ সংবাদ পৌঁছামাত্র তিনি উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যু-কার[১৭৬] গমন করে উমর রাযি.-এর কাছে পারসিকদের সামরিক প্রস্তুতির বিবরণ এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির আবেদন করে পত্র প্রেরণ করেন। উমর রাযি. পত্র হাতে পাওয়ামাত্র কালবিলম্ব না করে মুসলিমদের যুদ্ধের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য ২০ হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী প্রস্তুত করে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ইরাক অভিমুখে প্রেরণ করেন।

সাদ রাযি. তাঁর বাহিনী নিয়ে ইরাকের পানে যাত্রা করেন এবং কাদিসিয়্যা নামক এলাকায় সেনাশিবির স্থাপন করেন। ইরাকে অবস্থানকারী মুসলিম সেনারা ইতঃপূর্বেই কাদিসিয়্যার ময়দানে অবস্থান নিয়েছিল। ইতোমধ্যে মুসান্না বিন হারিসা শায়বানি ইন্তেকাল করেন। এদিকে পারস্য সেনাপতি রুস্তম ১ লাখ ২০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। ১৫ হিজরির শাবান মোতাবেক ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং কয়েক দিন যাবৎ এ যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। যুদ্ধে রুস্তম নিহত হয় এবং মুসলিমদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে।[১৭৭]

মাদায়েনকে ফারসিতে বলা হয় 'তায়সাফুন'। এটি মূলত সাতটি শহরের সমষ্টি। প্রত্যেকটি শহরের সাথে অপর শহরের কম-বেশি দূরত্ব রয়েছে।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ৫, পৃ. ৭৪-৭৫।

১৭৫. **কাদিসিয়্যা :** কুফা থেকে কাদিসিয়্যার দূরত্ব ১৫ ক্রোশ। আবার কাদিসিয়্যা ও উযাইবের মধ্যকার দূরত্ব চার মাইল।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ৪, পৃ. ২৯১।

১৭৬. **যু-কার :** কুফার অদূরে বিক্র বিন ওয়ায়েলের একটি জলাশয়। এটি কুফা ও ওয়াসিতের মাঝামাঝি অবস্থিত।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ৪, পৃ. ২৯৩।

১৭৭. *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ. ২৫৫-২৬২; *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ৪৮০-৫৭৯।

পারস্য বাহিনীকে ধরাশায়ী করার ক্ষেত্রে কাদিসিয়্যার যুদ্ধকে মুসলিমদের জন্য অন্যতম সহায়ক হিসেবে গণ্য করা হয়। এর মাধ্যমে ইরাকে পারসিক শাসনের সলিলসমাধি রচিত হয়। তাদের সামরিক শক্তি এমনভাবে চূর্ণ হয় যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আর কোনো সুযোগ বাকি থাকে না। বিশেষত রুস্তম নিহত হওয়ায় তাদের হতাশা ও নিরাশার কোনো অন্ত ছিল না। এ যুদ্ধের পর উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত আরব গোত্রগুলো পুনরায় মুসলিমদের অধীনে চলে আসে এবং তাদের মধ্যে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে।

মাদায়েন বিজয়

যুদ্ধের পর মুসলিমরা পারস্যের রাজধানী ও ইয়াজদেগির্দ (Yazdegerd)-এর আবাসস্থল মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হয় এবং এর উপকণ্ঠে 'বাহুরাসের' নামক শহরটি অবরোধ করে। মুসলিমরা রাজধানীর ফটকে এসে উপস্থিত হয়েছে দেখে পারস্য সম্রাট সন্ধির প্রস্তাব করে। সন্ধির শর্ত ছিল—'সে মাদায়েন ত্যাগ করে দজলা (Tigris) নদীর পশ্চিম তীরে চলে যাবে এবং এ অঞ্চল মুসলিমদের জন্য ছেড়ে যাবে। তবে দজলা নদীর অধিকার তাদের হাতে থাকবে।' সাদ রাযি. তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বাহুরাসের অবরোধ অব্যাহত রেখে অবশেষে তা জয় করেন। অতঃপর মুসলিম সৈন্যরা দজলা নদী সাঁতরে পার হয়ে মাদায়েনে প্রবেশ করে। মাদায়েন জয় করে তারা বিপুল পরিমাণ গনিমত লাভ করে।[১৭৮]

জালুলা ও হুলওয়ান বিজয়

ইয়াজদেগির্দ রাজধানী হাতছাড়া হওয়ার পরও আশাহত হয়নি। বরং সে জালুলার দিকে, যেখান থেকে আজারবাইজান (Azerbaijan)[১৭৯], আল-বাব (Al-Bab)[১৮০], জিবাল[১৮১] ও পারস্যের দিকে বিভাজক সড়ক তৈরি

---

[১৭৮]. *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ. ২৬২-২৬৩।

[১৭৯]. **আজারবাইজান :** একটি বৃহৎ অঞ্চল (বর্তমানে একটি স্বাধীন দেশ)। এর সীমানা পূর্বে বারদা (Barda), পশ্চিমে আরযানজান এবং উত্তরে দায়লাম, জাবাল ও তাররামের সাথে মিলিত হয়েছে। আজারবাইজানের একটি শহরের নাম হলো তাবরিজ।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ১২৮।

[১৮০]. **বাব :** এটিকে বাবুল আবওয়াবও বলা হয়। এটি সমুদ্র উপকূলীয় একটি শহর। যে-কারণে অনেক সময় এর প্রাচীরে সমুদ্রের পানি আছড়ে পড়তে দেখা যায়। এর মাঝখানে নৌকা ও জাহাজের নোঙর ফেলা হয়। বাবুল আবওয়াব শহরটি কাস্পিয়ান সাগরের কোল ঘেঁষে অবস্থিত। প্রাগুক্ত : খ. ১, পৃ. ৩০৩।

[১৮১]. **জিবাল :** কয়েকটি অঞ্চলের সামষ্টিক নাম, অনারবদের কাছে এ অঞ্চলগুলো ইরাক নামে পরিচিত। এটি ইসফাহান ও যানজান এবং কাজভিন ও হামাদানের মাঝে অবস্থিত। প্রাগুক্ত : খ. ২, পৃ. ৯৯।

হয়েছে, সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। তখন সাদ রাযি., হাশিম বিন উতবার নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হলে মুসলিমরা পারসিকদের পরাজিত করে এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে। ইয়াজদেগির্দের কাছে যখন পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে, তখন সে হুলওয়ানে (Helwan)[১৮২] অবস্থান করছিল। এরপর সে উত্তর পারস্যের 'রায়' নামক এলাকায় চলে যায়। সাদ রাযি. তিকরিত (Tikrit), মসুল (Mosul), মাসাবজান, করকিসিয়া (Circesium), হিত (Hit) ও দস্তমায়সান (Maysan)-সহ ইরাকের অবশিষ্ট শহরগুলো জয় করে নেন।[১৮৩]

আহওয়াজ বিজয়[১৮৪]

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. ইরাক ভূখণ্ডে বিজয়াভিযান আপাতত স্থগিত করতে মনস্থ করছিলেন। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতি তাঁকে অভিযান অব্যাহত রাখতে বাধ্য করে। কারণ, পারসিকরা পরাজয় স্বীকার না করে ইরাকের দক্ষিণ-পূর্বে আহওয়াজ নামক এলাকায় সেনাঘাঁটি স্থাপন করে। সেখান থেকে মুসলিমদের ওপর অতর্কিত হামলার নীলনকশা আঁকে। তখন মুসলিমরা পারসিকদের আক্রমণ থেকে নিজেদের ঘাঁটি ও অঞ্চলগুলো বাঁচাতে বাধ্য হয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং আহওয়াজ, রামাহুরমুয, সুস (Shush) ও তুসতার জয় করে নেয়।[১৮৫]

নাহাওয়ান্দ (Nahavand) যুদ্ধ

ইয়াজদেগির্দ ফায়রুজানের নেতৃত্বে একটি নতুন বাহিনী প্রস্তুত করে। এ বাহিনী নুমান বিন মুকরিন মুযানির নেতৃত্বাধীন মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মহররম ১৯ হি. মোতাবেক জানুয়ারি ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে হামাদানের দক্ষিণে পাহাড়বেষ্টিত নাহাওয়ান্দ এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়। এ যুদ্ধেও মুসলিমদের বিজয় হয়। তবে মুসলিম ও পারসিক উভয় বাহিনী তাদের সেনাপতিকে হারায়। পরাজিত বাহিনীর অবশিষ্ট অংশ নাহাওয়ান্দের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলিমরা হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামানের নেতৃত্বে তাদের

---

[১৮২]. **হুলওয়ান** : সাওয়াদুল ইরাকের শেষ প্রান্তে বাগদাদের পর্বতমালার সাথে অবস্থিত একটি শহর। প্রাগুক্ত : খ, ২, পৃ. ২৯০।

[১৮৩]. *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ. ২৬৪-২৬৫, ২৯৯।

[১৮৪]. **আহওয়াজ** : ইরাক ও ইরানের মধ্যবর্তী সাতটি গুচ্ছগ্রামের সমষ্টি।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ২৮৪।

[১৮৫]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ৮৩-৯৩।

অবরোধ করে। অবশেষে দুর্গবাসীরা আত্মসমর্পণ করে নিরাপত্তাদানের শর্তে সন্ধি করে। এ সময় মুসলিমরা হামাদানও জয় করে নেয়।[১৮৬]

পারস্যের ইসলামি বিজয়ের ইতিহাসে নাহাওয়ান্দ যুদ্ধকে সর্বশেষ বৃহৎ যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হয়। মুসলিমরা এ যুদ্ধকে ফাতহুল ফুতুহ (বিজয় সূচনাকারী)[১৮৭] বলেও নামকরণ করে। কেননা, তা মুসলিমদের সামনে পারস্য সম্রাট ও রাজন্যবর্গের দম্ভ চূর্ণ করার রাস্তা উন্মোচিত করে—যার ফলে ক্রমাগত আক্রমণের মধ্য দিয়ে ইসফাহান, রায়, আজারবাইজান, বাব, খোরাসান এবং অন্যান্য এলাকা মুসলিমদের করতলগত হয়।[১৮৮]

ইয়াজদেগির্দ মুসলিমদের বিজয় ও তাদের দেশে প্রবেশের সংবাদ শোনামাত্র কালবিলম্ব না করে জায়হুন নদী পার হয়ে সমরকন্দে তুর্কি সম্রাটের কাছে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তার এ পলায়নের মাধ্যমে সাসান বংশীয় পারস্য সাম্রাজ্যের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে যায়।[১৮৯]

সিরিয়া অভিযান

ফাহল, দামেশক ও হিমস বিজয়

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. সিরিয়া বিজয়ের পূর্ণতা সাধনের নিমিত্তে সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং আবু উবায়দার নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সেই সঙ্গে দামেশক, ফাহল ও হিমস বিজয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আবু উবায়দা খলিফার নির্দেশ মোতাবেক সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ২৮ জিলকদ ১৩ হি. মোতাবেক ২৩ জানুয়ারি ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ফাহল[১৯০], ১৫ রজব ১৪ হি. মোতাবেক ৩ সেপ্টেম্বর ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে দামেশক[১৯১], ২৫ রবিউল আউয়াল ১৫ হি. মোতাবেক ৬ মে ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে

---

[১৮৬]. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ১১৪-১৩৯; *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ. ৩০০-৩০৬; *আল-কামেল ফিত-তারিখ*, খ. ২, পৃ. ৩৯০। হামাদানও পাহাড়বেষ্টিত একটি অঞ্চল।

[১৮৭]. আল-কামেল ফিত তারিখ, খ. ২, পৃ. ৩৯৯।

[১৮৮]. *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ. ৩০৮-৩১৬।

[১৮৯]. *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ. ৩১১-৩১২।

[১৯০]. প্রাগুক্ত : পৃ. ১২২; *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ৪৩৪-৪৪১।

[১৯১]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ৪৪১।

বা'লাবাক্ক[১৯২] এবং একই বছর ২১ রবিউল আউয়াল (জুন) মাসের শুরুতে হিমস[১৯৩] জয় করেন।

ইয়ারমুক যুদ্ধ

মুসলিমদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে হিরাক্লিয়াস দক্ষিণাঞ্চলের দিকে যুদ্ধের জন্য ১ লাখ সৈন্যের বিরাট এক বাইজেন্টাইন বাহিনী প্রেরণ করেছে। রোম, আর্মেনিয়া, আরবীয় খ্রিষ্টান, রাশিয়া, সাকালিবাহ ও ইউরোপীয়দের নিয়ে এ বাহিনী গঠন করে। বাহান আর্মেনিকে যুদ্ধের ময়দানে তার সাহসিকতা, বীরত্ব ও রণকৌশলের কারণে এ বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব প্রদান করে। হিরাক্লিয়াসের নির্দেশনা মোতাবেক এ বাহিনী ইয়ারমুকে সেনাঘাঁটি স্থাপন করে। সৈন্যরা ইয়ারমুক ও রাকাদ উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নেয়। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা রাকাদ উপত্যকার পশ্চিম দিকে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

বাইজেন্টাইন সৈন্যদের এ তৎপরতার কারণে মুসলিমরা তাদের উত্তরাঞ্চল থেকে বিতাড়িত করতে বাধ্য হয়। এ বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায় তারা দক্ষিণ দিকে গমন করে ইয়ারমুক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪৬ হাজার। অপর এক বর্ণনা মতে, ৩৬ হাজার। তারা বাইজেন্টাইনদের মোকাবেলায় হারির উপত্যকার পশ্চিমে আযরুআতকে[১৯৪] পেছনে রেখে ঘাঁটি স্থাপন করে। উভয় পক্ষের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কয়েক দিন যাবৎ তা অব্যাহত থাকে। এ যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদের রণকৌশলে সকলে মুগ্ধ হন এবং মুসলিমদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। হিরাক্লিয়াসের ভাই তায়ুরদুর যুদ্ধে নিহত হয়। ১৫ হিজরির রজব মাস মোতাবেক ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[১৯৫]

সিরিয়ার অবশিষ্ট অঞ্চল বিজয়

ইয়ারমুক যুদ্ধের পর বাইজেন্টাইন সম্রাটের পতন হয়। সেই সঙ্গে মুসলিমদের সামনে সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলের পাশাপাশি উত্তরে

---

১৯২. *তারিখু ফুতুহিশ শাম*, আযদি, পৃ. ১৪৪।

১৯৩. *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ. ১৩৬-১৩৭; *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ৫৯৯-৬০১।

১৯৪. আযরুআত : সিরিয়ার একটু প্রত্যন্ত অঞ্চল। এটি বালকা ও ওমানের পাশাপাশি অবস্থিত।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ১৩০।

১৯৫. *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ৩৯৪-৪০৫; *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ. ১৪০-১৪৩।

দূরদূরান্তের এলাকাগুলোয় পুনঃপ্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হয়। এ সময় তারা হামাত (Hama), শায়জার (Shaizar), মাআররাতুন নুমান (Marrat al-Numan), কিননাসরিন (Qinnasrin), হালব (Aleppo), এন্তাকিয়া (Antakia), মানবিজ (Manbij), দালুক, রাবান প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন। এরপর মুসলিম সৈন্যরা এন্তাকিয়ার প্রদেশ বাগরাস (Bagras)-এর ফটক দিয়ে বাইজেন্টাইনদের এলাকায় প্রবেশ করেন। এ সময় মুসলিম সেনাপতি ছিলেন মায়সারা বিন মাসরুক আবসি। তিনিই প্রথমে ফটক দিয়ে প্রবেশ করেন। এ সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ মারআশ (Kahraman Maras) জয় করেন। সেই সঙ্গে মুসলিমরা (রবিউল আউয়াল ১৬ হি./মে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে) জেরুজালেম জয়ের মাধ্যমে তাদের বিজয়ধারা মহিমান্বিত করেন। উমর রাযি. স্বয়ং গির্জাপ্রধান সাফরুনিয়ুস (Patriarch Sophronius) থেকে বাইতুল মাকদিসের দায়িত্ব বুঝে নেন। তখন জেরুজালেমের গভর্নর আরতাবুন (Tribune) পালিয়ে মিসরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১৯৬]

মুসলিমদের দামেশক বিজয় শেষ হতে না হতে ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ান সিরিয়ার উপকূলীয় শহরগুলো বিজয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ সময় তার সহোদর মুআবিয়া তাকে সহযোগিতা করেন। ফলে তিনি সিডন (Sidon), আরকাহ (Arqa), জাবিল (Byblos), বৈরুত (Beirut), আক্কা (Acre) ও কায়সারিয়্যা (Caesarea) জয় করেন।[১৯৭]

এদিকে হিরাক্লিয়াস সিরিয়াকে বিদায় জানিয়ে কনস্টান্টিনোপল চলে যান। বিদায়কালে সিরিয়ার প্রতি তার শেষ কথা ছিল—'হে সিরিয়া, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এটি এমন এক ব্যক্তির বিদায়, তোমার কাছে যার প্রয়োজন শেষ হয়নি এবং সে আবার তোমার কাছে ফিরে আসবে।'[১৯৮]

আমওয়াসের প্লেগ

১৮ হিজরি মোতাবেক ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্লেগ রোগ ভয়াল রূপ ধারণ করে। ইতিহাসে এ প্লেগ 'আমওয়াসের প্লেগ' নামে পরিচিত। আমওয়াস হলো ফিলিস্তিনের একটি গ্রামের নাম। এ মহামারিতে

---

[১৯৬]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ৬০৭-৬১৩; *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ. ১৫০-১৫৭, ১৬৮-১৬৯।

[১৯৭]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ৬০৩-৬০৪ ও খ. ৪, পৃ. ১০২, ১৪৪-১৪৫।

[১৯৮]. প্রাগুক্ত : খ. ৩, পৃ. ৬০৩।

২৫ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। যাদের মধ্যে আবু উবায়দা, মুআজ বিন জাবাল, ফজল বিন আব্বাস, শুরাহবিল বিন হাসানাহ, সুহাইল বিন আমর, ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ান ও আমের বিন গায়লান ছাকাফির মতো শীর্ষস্থানীয় সাহাবিগণও ছিলেন।[১৯৯]

মেসোপটেমিয়া বিজয়

সিরিয়া বিজয়ের অর্জনসমূহের নিরাপত্তার স্বার্থে মেসোপটেমিয়া (Mesopotamia) জয় করা সামরিক প্রয়োজন হিসেবে দেখা দেয়। আবু উবাইদার মৃত্যুর পর উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. ইয়াজ বিন গনমকে হিম্‌স, কিননাসরিন ও জাজিরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তার নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনী সবশেষে রাক্কাহ (Raqqah), রাহা (Edessa/Osroene), হাররান (Harran), সামিসাত (Samsat), নুসায়বিন (Nusaybin), কারকিসিয়া (Circesium), সিনজার (Sinjar), মাইয়াফারিকিন (Silvan), আমেদ, কাফারতোছা, মারদিন (Mardin), দারা (Dara), আরজান প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন। এমনকি মুসলিম সেনাবাহিনী বিদলিস (Bitlis) জয় করে খালাত (Ahlat) পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং সেখানকার শাসক সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এভাবে (১৮-১৯ হি. মোতাবেক ৬৩৯-৬৪০ খ্রি.) দুবছরের মাঝে মেসোপটেমিয়া বিজয় সম্পন্ন হয়।[২০০]

মিসর অভিযান

মিসর বিজয়ের কারণসমূহ

সিরিয়া বিজয়ের পর ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ান সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হন। সম্ভবত এ বিষয়টি আমর ইবনুল আসকে মিসর বিজয় করে তার গভর্নর হতে উদ্বুদ্ধ করে। ব্যাবসায়িক কাজের সুবাদে মিসরে যাতায়াতের কারণে দেশটি তার কাছে পরিচিত ছিল এবং মিসরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কেও তিনি অবগত ছিলেন।

সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐক্যের পাশাপাশি কিছু ভিন্নতাও ছিল। কেননা দুদেশেই বাইজেন্টাইনদের কেন্দ্রীয় শাসন কার্যকর ছিল। মূলত আরবদের কাছে মুকাওকিস নামে পরিচিত বাইজেন্টাইন

---

[১৯৯]. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ৬০-৬৬।
[২০০]. *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ. ১৭৬-১৮২।

শাসকের মাধ্যমে বাইজেন্টাইন ও মিসরের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাইজেন্টাইনরা খ্রিষ্টধর্মের মালকানি (Melkite) মতাদর্শের অনুসরণ করত, আবার মিসরীয়রা ইয়াকুবি (Jacobite) মতাদর্শের অনুসরণ করত; যে-কারণে বাইজেন্টাইনদের তরফ থেকে মিসরীয়দের বহু নির্দয় আচরণ ও ধর্মীয় অনাচার সহ্য করতে হতো। বিপরীতে মুসলিমরা মিসরে আগমন করলে মিসরীয়রা তাদের উদারতা, সম্প্রীতি ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাদের কাজে সহযোগিতা করতে লাগল। কারণ, তারা বুঝেছিল যে, বাইজেন্টাইনরা শুধু তাদের শাসনক্ষমতার স্বার্থে মিসরের ভূমি ব্যবহার করছে। অধিকন্তু ব্যাবসায়িক মন্দা মিসরীয়দের বাইজেন্টাইন শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল।

প্রকাশ থাকে যে, জেরুজালেমের শাসক আরতাবুনের কর্মকাণ্ডের সাথে মিসর আক্রমণের পরিকল্পনার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। কারণ, উমর রাযি. জেরুজালেমের শাসনভার গ্রহণ করার পূর্বেই সে তার সেনাবাহিনী নিয়ে মিসর পালিয়ে যায় এবং সেখানে ঘাঁটি গেড়ে মুসলিমদের ওপর আক্রমণের ছক তৈরি করে। আমর ইবনুল আস রাযি. খলিফার কাছে মিসরের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা তুলে ধরে মিসর আক্রমণের আবেদন করেন। মিসর ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। সেই সঙ্গে তার ভৌগোলিক গুরুত্বও ছিল অত্যধিক। কেননা সিরিয়ায় মুসলিমদের অর্জনগুলোর সুরক্ষার জন্য মিসরের শাসনক্ষমতা মুসলিমদের অধীনে থাকা একান্ত জরুরি ছিল। এসব কিছু হযরত উমরকে মিসর অভিযানের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করে।[২০১]

উমর রাযি. প্রথমে মিসর অভিযানে আগ্রহী ছিলেন না। কারণ, তিনি আশঙ্কা করতেন যে, নতুন করে অভিযান পরিচালনার ঝুঁকি নিতে গেলে এর পরিণাম শুভ না-ও হতে পারে। তখন মুসলিমদের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু আমর ইবনুল আস উমর রাযি.-এর কাছে মিসর বিজয়ের গুরুত্ব ও এর সহজতা বর্ণনা করতে করতে একসময় তাকে আশ্বস্ত করতে সক্ষম হন। অবশেষে খলিফা তার জন্য সাড়ে ৩ হাজার (অপর এক বর্ণনা মতে ৪ হাজার) সৈন্যের একটি বাহিনীর ব্যবস্থা করেন।[২০২]

---

২০১. *ফুতুহু মিসর ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আবদিল হাকাম, পৃ. ৮০-৮১।
২০২. *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ. ২১৪; *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৩৮।

একদল ঐতিহাসিক মিসর বিজয়ের পরিকল্পনাকে উমর রাযি.-এর প্রতি সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করেন—উমর রাযি. জাবিয়া নামক স্থানে অবস্থানকালে আমর ইবনুল আস রাযি.-কে পত্র মারফত মিসর অভিযানে যাত্রা করার নির্দেশ প্রদান করেন। ফিলিস্তিনের কায়সারিয়্যায় অবস্থানকালে পত্রটি তার হাতে পৌঁছে। এ পত্রে খলিফা আগ্রহী লোকদের তার সাথে যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।[২০৩]

মূলত মিসর বিজয়ের চিন্তা প্রথম জাগ্রত হয় যখন উমর রাযি. ১৭ হি./৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বিজিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে শৃঙ্খলা বিধানের বিষয়টি তত্ত্বাবধানের জন্য জাবিয়ায় আগমন করেন। উমর রাযি. ছিলেন একজন যোগ্য নেতা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাই জাবিয়ায় আগমনকালে তিনি নিম্নে বর্ণিত কিছু কারণে মিসর বিজয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন—

১. মিসরের অঞ্চলগুলোতে ইসলাম প্রচার
২. দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্ত থেকে বাইজেন্টাইনদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের ওপর আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত করা। কারণ, আরতাবুন এ দেশেই আশ্রয় গ্রহণ করে সিরিয়ায় মুসলিমদের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করছিল।
৩. মিসরের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি দ্বারা উপকৃত হওয়া
৪. সিরিয়া ও মিসরের মধ্যকার সম্পর্ক অটুট রাখা। উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকাল থেকেই এ দুই দেশ রাজনৈতিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রাখত।[২০৪]

বেবিলনের দুর্গ বিজয়

আমর ইবনুল আস রাযি. মিসরের চাবি হিসেবে খ্যাত পেলাসিয়াম (Pelusium) এর দিকে অগ্রসর হন এবং ১৯ হিজরি মোতাবেক ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে তা জয় করেন।[২০৫] এরপর আরও অগ্রসর হয়ে বেলবিসে পৌঁছেন। সেখানে আরতাবুনের নেতৃত্বে বাইজেন্টাইন বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের পর তিনি

---

২০৩. *ফুতুহুল বুলদান*, প্রাগুক্ত।
২০৪. *তারিখুদ দাওলাতিল আরাবিয়্যাহ*, সালেম, পৃ. ৪৮৫-৪৮৬।
২০৫. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৩৮; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ২, পৃ. ৩৯৫। পেলাসিয়াম হলো মিসরের উপকূলীয় একটি শহর।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ৪, পৃ. ২৫৫।

বেবলিসও জয় করেন।[২০৬] অতঃপর উম্মু দানিন[২০৭] পৌছলে সেখানে অপর একটি বাইজেন্টাইন বাহিনীর সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়। তিনি বাইজেন্টাইন বাহিনীকে পেছনে ফিরে গিয়ে বেবিলনের[২০৮] দুর্গে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করেন। মুকাওকিস এ দুর্গে বসবাস করত। আমর রাযি. দুর্গ অবরোধ করে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। তবে সেনাবাহিনীর স্বল্পতার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। ফলে তিনি অবরোধ করেই ক্ষান্ত হন এবং খলিফার কাছে সামরিক সাহায্য পাঠানোর জন্য পত্র প্রেরণ করেন।[২০৯]

মুকাওকিস অবরোধের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পেরে তা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করে এবং আমরের কাছে অর্থের বিনিময়ে অবরোধ তুলে নেওয়ার প্রস্তাব করে। মূলত মিসরে মুসলিমদের অভিযানের লক্ষ্য ছিল—ধর্মীয়, সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা এবং ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। অর্থের বিনিময়ে এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জলাঞ্জলি দেওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। তাই উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়।[২১০]

এদিকে খলিফার পক্ষ থেকে সেনা ও সামরিক সাহায্য এসে পৌছে যায়, যাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় চারজন সাহাবিও ছিলেন। তারা হলেন : যুবাইর ইবনুল আওয়াম, উবাদা ইবনুস সামেত, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ও মাসলামা ইবনু মাখলাদ রাযি.। অতঃপর মুসলিম বাহিনী অবরোধ আরও জোরদার করে। ফলে মুকাওকিস সন্ধিচুক্তিতে মুসলিমদের সব শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। উমর রাযি. কর্তৃক সিরিয়ার সন্ধি ও এ সন্ধির বিষয়বস্তু অভিন্নই ছিল।[২১১] তবে এ সন্ধিতে বাইজেন্টাইন সম্রাটের সম্মতির শর্তটি সংযোজন করা হয়। ফলে সন্ধির বিষয়টি কনস্টান্টিনোপলে চলে যায় এবং সম্রাটের সম্মতির ওপর তা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

---

[২০৬]. **বেলবিস** : একটি নগরী। সিরিয়ার পথে তার ও ফুসতাতের মধ্যকার দূরত্ব ১০ ক্রোশ।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ৪৭৯।

[২০৭]. **উম্মু দানিন** : কায়রো ও নীল নদের মধ্যবর্তী একটি গ্রাম।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ২৫১।

[২০৮]. **বেবিলন** : মিসরের একটি প্রাচীন নাম। কারও কারও মতে এটি ফুসতাতের অন্তর্গত একটি এলাকার নাম।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ৩১১।

[২০৯]. *ফুতুহু মিসর ওয়াল মাগরিব*, পৃ. ৮১; *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৩৮।

[২১০]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ১০৫।

[২১১]. *ফুতুহু মিসর ওয়াল মাগরিব*, পৃ. ১০৩।

প্রকাশ থাকে যে, হিরাক্লিয়াস সিরিয়ার রাজত্ব হারানো পর এখন মিসরের রাজত্ব হারানোর সংকেত অনুভব করে দিশেহারা হয়ে যায়। ফলে, সে সন্ধির শর্তসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং গভর্নর মুকাওকিসকে তার ব্যর্থতার কারণে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে। সেই সঙ্গে তাকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদেশ করে। অবশেষে ২০ হিজরির জুমাদাল উখরা মোতাবেক ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে মুসলিমরা বেবিলনের দুর্গ জয় করে এবং আমর রাজি. ও তার বাহিনী ফুসতাতের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেন। অতঃপর মিসরের অন্যান্য অঞ্চল, বিশেষত দক্ষিণাঞ্চল বিজয়ের জন্য বাহিনী প্রেরণ করেন।[২১২]

ইস্কান্দারিয়া (Alexandria) বিজয়

মুসলিমদের হাতে বেবিলন দুর্গের পতনের পর আলেক্সান্দ্রিয়ার সেনারক্ষীরা নিজেদের জীবন নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এদিকে বাইজেন্টাইনরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয় যে, যদি তারা এ মুহূর্তে ইস্কান্দারিয়ায় সাহায্য না পাঠায়, তাহলে এ নগরীরও পতন হবে। ইস্কান্দারিয়াকে বাইজেন্টাইনদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হতো। কারণ, ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যিক বন্দরটি এখানেই অবস্থিত ছিল। তা ছাড়া কনস্টান্টিনোপলের পরে এটিকেই দ্বিতীয় রাজধানী ও মিসরের বৃহৎ নগরী মনে করা হতো। এ কথা সর্বজনবীদিত ছিল যে, এর পতন হলে অচিরেই মিসরে বাইজেন্টাইন শাসনের পতন হবে।

সুতরাং বাইজেন্টাইন সম্রাট ইস্কান্দারিয়া রক্ষায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করে এবং মুসলিমদের জন্য এর সকল ফটক বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। অতঃপর মুসলিম সৈন্যরা চার মাস যাবৎ অবরোধ অব্যাহত রাখে এবং ২০ হি. মোতাবেক ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে বলপূর্বক শহরটি জয় করে।[২১৩] অবরোধকালে মুকাওকিস মুসলিমদের সাথে সন্ধিচুক্তির চেষ্টা করে। কিন্তু আমর রাযি. তার সন্ধির প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

মূলত ইস্কান্দারিয়া বিজয় ছিল সমগ্র মিসর মুসলিমদের করতলগত হওয়ার কার্যত ঘোষণা। ইতোমধ্যে মুসলিমরা মিসরের উচ্চভূমি ও ব-দ্বীপের অঞ্চলসমূহও জয় করে নেয়।

---

[২১২]. প্রাগুক্ত : পৃ. ১০৪-১০৫।

[২১৩] ফুতুহ মিসর ওয়াল মাগরিব : পৃ. ১০৬-১১৪।

পশ্চিম প্রান্তে সাম্রাজ্য বিস্তার

মিসরে মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর আমর ইবনুল আস মিসরের সীমানার বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি বাইজেন্টাইন সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণাধীন সিরিনাইকা, ত্রিপোলি প্রভৃতি অঞ্চল বিজয়ের মাধ্যমে পশ্চিম সীমান্তে প্রতিরক্ষামূলক নিরাপত্তাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করেন। ২২ হিজরি মোতাবেক ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হন। অতঃপর মদিনার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পশ্চিম প্রান্তে সামরিক অভিযান স্থগিত করা হয়।[২১৪]

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর যুগে রাষ্ট্রীয় কাঠামো

রাজনৈতিক-ব্যবস্থাপনা

মুসলিমরা যখন জাজিরাতুল আরবের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে, তখনো তাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক-ব্যবস্থাপনা বিজিত অঞ্চলগুলোর স্তরে উন্নীত হয়নি। তা ছাড়া বিজিত অঞ্চলগুলোর সমাজব্যবস্থায় যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বিরাজমান ছিল, আরবরা তাদের জীবন-ইতিহাসে কখনো তার চর্চা করেনি।

বাস্তবতা হলো—উমর রাযি.-এর যুগটি ছিল বিজয়ের যুগ, যেখানে আল্লাহর সাহায্য মুসলিমদের সঙ্গী হয়েছিল। ফলে তখন সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতি ঘটে, আর সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রনীতি একটি অপরিহার্য বিষয়। তাই উমর রাযি. সাধারণ জনগণ ও সেনাবাহিনীকে পরিচালনা এবং বিজিত অঞ্চলগুলোতে সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানোর জন্য ইসলামি শরিয়ার মূলনীতি ও ব্যক্তিগত ইজতিহাদের আলোকে একটি সংবিধান রচনা করেন। উল্লেখ্য যে, উমর রাযি.-এর যুগে শাসনব্যবস্থায় আরবদের ধারণাতীত উৎকর্ষ সাধিত হয়। রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য তিনি যে বিপ্লবী কর্মসূচি হাতে নেন, তা ইসলামের ইতিহাসে রাষ্ট্রবিনির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উমর রাযি. প্রথমে আরব ভূখণ্ডের বিরোধীশক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি নাজরানের নাসারাদের জাজিরাতুল আরব থেকে এবং ইহুদিদের খায়বার ও

---

[২১৪] প্রাগুক্ত : পৃ ২৩০-২৩২।

ফাদাক থেকে নির্বাসিত করেন। এর দ্বারা জাজিরাতুল আরবে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়।

জনস্বার্থে নবীজির হিজরতকে ইসলামি সনের সূচনা নির্ধারণ করেন।[২১৫] এমনিভাবে নবীজির যুগে এবং আবু বকর রাযি.-এর শাসনামলে যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে উঠেছিল, তার ওপর ভিত্তি করে শাসনব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজান।

বিচারব্যবস্থা

উমর রাযি. আবু মুসা আশআরি রাযি.-কে বসরার গভর্নর নিয়োগকালে বিচারব্যবস্থাকে স্বতন্ত্র বিভাগে রূপদান করেন এবং তার জন্য কিছু নীতিমালাও নির্ধারণ করেন।[২১৬] কারণ, তখন মুসলিমদের ক্রমাগত বিজয় ও ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তৃতির আবশ্যিক দাবি ছিল—বিচারব্যবস্থার পরিসরকে বিস্তৃত করা। এ লক্ষ্যে তিনি প্রত্যেকটি শহরে মনোনীত বিচারক প্রেরণ করেন, যার দায়িত্ব ছিল—মানুষের দ্বীনি ও দুনিয়াবি সকল বিষয়ের বিবাদ মীমাংসা করা এবং যুদ্ধলব্ধ ও বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পদের তত্ত্বাবধান করা। অতঃপর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের জন্য তিনি পৃথক আরেকজন লোক নিয়োগ করেন। উমর রাযি.-ই প্রথমে বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ থেকে পৃথক করেন। তিনি নিজে বিচারক নিয়োগ করতেন এবং বিচারকগণ মুসলিমদের বিবাদ নিরসনে সমস্যার সম্মুখীন হলে খলিফার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতেন; সে ক্ষেত্রে প্রাদেশিক গভর্নরদের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ ছিল না।[২১৭] এ ছাড়াও তিনি বিচার বিভাগের পাশাপাশি হিসাব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন; যে-কারণে সূক্ষ্ম যাচাই-বাছাই ছাড়া গভর্নর ও কর্মকর্তা-কর্মচারী কারও জন্য কোনো বিল পাশ হতো না।

দফতর স্থাপন

উমর রাযি.-এর যুগে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও বিজয়াভিযানের কারণে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ মদিনায় আসতে থাকে। এসব সম্পদের সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য উমর রাযি. নিয়মতান্ত্রিক দফতর স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। সেই দফতরে একটি রেজিস্টার বই থাকত, যেখানে সেনাবাহিনী ও অন্যান্য

---

[২১৫]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ২০৯।

[২১৬]. *আল-কামেল ফিল লুগাতি ওয়াল আদব*, আবুল আব্বাস আল-মুবাররাদ, খ. ১, পৃ. ১৬-২০।

[২১৭]. *আল-খুলাফাউর রাশিদুন*, আহমাদ শামি, পৃ. ২৬০।

লোক, যাদের জন্য ভাতা বরাদ্দ ছিল, তাদের নামের তালিকা ছিল। দফতর স্থাপনের বিষয়টিকে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশের যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেব গণ্য করা হয়। আরবের প্রশাসনব্যবস্থায় এটি ছিল একটি নতুন সংযোজন, যাতে বিজিত অঞ্চলগুলোর জাতিগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতারও প্রভাব ছিল। উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. ২০ হিজরি মোতাবেক ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে দফতর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিন শ্রেণির লোকের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন :

- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানাদি ও নিকটাত্মীয়;
- ইসলামের প্রথম সারির ব্যক্তিবর্গ;
- জিহাদ ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকে যারা ধৈর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং দ্বীন প্রচারের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।[২১৮]

উমর রাযি. যুদ্ধলব্ধ ও অন্যান্য সম্পদের সংরক্ষণের জন্য নিয়মতান্ত্রিক বাইতুল মাল বা ট্রেজারি স্থাপন করেন। তিনি বাইতুল মালের অর্থসম্পদ জনসেবামূলক কাজে ব্যয় করতেন। বাইতুল মালে জমাকৃত সম্পদের একাধিক উৎস ছিল। জাকাত, সাদাকা, জিযয়া, উশর ও খারাজ ছিল সেগুলোর প্রধান উৎস। তা ছাড়া বিজিত অঞ্চলগুলোতে যেসব মুদ্রা চালু ছিল, উমর রাযি. সেগুলো বহাল রাখেন। যেমন—ইরাক ও পারস্যে কিসরাভিয়্যাহ এবং সিরিয়া ও মিসরে হিরাকলিয়্যাহ।

প্রশাসননীতি

প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাজে বিজয়ী মুসলিমদের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা না থাকায় উমর রাযি. বিজিত অঞ্চলগুলোতে পারসিক ও বাইজেন্টাইন ব্যবস্থাপনার আমূল পরিবর্তন না করে, বিদ্যমান ব্যবস্থাপনার অধিকাংশই বহাল রাখেন। তবে ইসলামের নীতি ও আদর্শের আলোকে জনসেবা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের অবকাঠামো ঠিক রেখে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনায় সামান্য পরিবর্তন আনেন। যেসব দাফতরিক কর্মকর্তা যুদ্ধের সময় দেশত্যাগ করেনি, তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব বহাল রাখেন এবং তাদের দেশীয় ভাষায় নথিপত্র লেখার অনুমতি প্রদান করেন। ইরাক ও ইরানে প্রশাসনিক দায়িত্ব

---

[২১৮]. *কিতাবুল খারাজ*, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃ. ৪২-৪৭; *কিতাবুল আমওয়াল*, আবু উবাইদ আল-কাসেম ইবনু সাল্লাম, পৃ. ২৩৫-২৩৯।

বণ্টনের ক্ষেত্রে পারসিক ব্যবস্থাপনা—যা রাসাতিক নামে পরিচিত ছিল—বহাল রাখেন। অনুরূপ সিরিয়ায় প্রশাসনিক দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে বাইজেন্টাইন ব্যবস্থাপনা বহাল রাখেন। এ ব্যবস্থাকে তারা নিজামুল বুনুদ (نظام البنود) বা নিজামুস সুগুর (نظام الثغور) নাম দিয়েছিলেন। তাদের এ ব্যবস্থাপনা আজনাদ (اجناد) নামেও পরিচিত ছিল। তা ছাড়া মিসরে একাধিক ব্যবস্থাপনা চালু ছিল, যাকে তারা কুওয়ার (كور) বলতেন। এর একবচন হলো কুরাতুন (كورة), অর্থ—কেন্দ্র।

উমর রাযি.-এর মৃত্যু

একদিন উমর রাযি. ফজরের নামাজ পড়ানোর উদ্দেশ্যে তার ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদের দিকে যাত্রা করলেন। দিনটি ছিল ২৩ হিজরির জিলহজ মাসের ২৬ তারিখ বুধবার মোতাবেক ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। যখন মুসল্লিরা কাতারবদ্ধ হয়ে নামাজে দাঁড়াল, তখন লুকিয়ে থাকা এক ব্যক্তি হঠাৎ উমর রাযি.-এর সামনে এসে বিষ মিশ্রিত খঞ্জর দ্বারা তাকে কয়েকটি আঘাত করে। এ আঘাতকারী ছিল মুগিরা ইবনে শুবা রাযি.-এর দাস—আবু লুলু ফিরোজ, সে মূলত পারস্যের যুদ্ধবন্দি ছিল। এ ঘটনার তিন দিন পর উমর রাযি. শাহাদত বরণ করেন। তাকে নবীজির কবরের কাছে আবু বকর রাযি.-এর কবরের পাশে দাফন করা হয়।[২১৯]

অধিক গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, উমর রাযি.-এর মৃত্যুর পেছনে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের চক্রান্ত ছিল; যদিও আবু লুলু বাহ্যত ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ, সে উমর রাযি.-এর কাছে তার মনিব মুগিরার ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেছিল যে, মনিব তার থেকে অধিক পরিমাণ মাসুল আদায় করে, যার পরিমাণ ছিল দৈনিক দুই দিরহাম এবং সে তা আদায় করতে সক্ষম নয়। উমর রাযি., মুগিরার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। আর এতেই সে মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ ঘটনার সঙ্গে যে বৈদেশিক তৎপরতা সম্পৃক্ত ছিল, তা এড়িয়ে যাওয়া কোনো গবেষকের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, পারস্যের ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের কাছে পরাজিত হয়ে তাদের রাজ্য হারানোর পর মুসলিমদের প্রতি, বিশেষত উমর রাযি.-এর প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করেছিল।

[২১৯]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ১৯০-১৯৪।

|

উসমান বিন আফফান রাযি.

(২৪-৩৫ হি./৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)

উসমান বিন আফফান রাযি.-এর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ

একদল শীর্ষস্থানীয় সাহাবি উমর রাযি.-এর কাছে আবেদন করেছিলেন, তিনি যেন মৃত্যুর পূর্বেই তার খলিফা নিযুক্ত করে যান। কিন্তু উমর রাযি. তাতে রাজি হননি। তিনি বলতেন, জীবিত অবস্থায় খেলাফতের যে দায়ভার আমি বহন করেছি, মৃত্যুর পরও তা বহন করতে চাই না।[২২০] প্রকাশ থাকে যে, উমর রাযি. খলিফা হিসেবে এককভাবে কারও নাম প্রস্তাব করেননি। মূলত উমর রাযি.-এর ইচ্ছা ছিল, নির্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তিদের পরামর্শের ভিত্তিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হোক। এজন্য তিনি ছয় ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করেন, যেন তাদের যেকোনো একজনকে মুসলিমদের খলিফা নির্বাচন করা হয়। এ ছয়জনের প্রত্যেকে ছিলেন মুহাজির এবং কুরাইশ বংশের। তাদের মধ্যে আনসারদের কারও নাম স্থান পায়নি; যদিও খেলাফতের উপযুক্ততা তাদের মাঝেও ছিল এবং ইসলামের জন্য তারাও বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন। অতএব, আবু বকর রাযি. ও উমর রাযি.-এর পর তৃতীয় খলিফাও কুরাইশ বংশের হওয়াটা নিশ্চিত হয়ে যায়। উমর রাযি. কুরাইশের যে ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন তারা হলেন[২২১] :

১. আলি ইবনে আবু তালেব, তিনি ছিলেন আবদুল মুত্তালিব গোত্রের; ২. উসমান বিন আফফান, তিনি ছিলেন উমাইয়া গোত্রের; ৩. আবদুর রহমান বিন আউফ, তিনি ছিলেন বনু জুহরা গোত্রের; ৪. সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, তিনিও ছিলেন বনু জুহরা গোত্রের; ৫. যুবায়ের ইবনুল আওয়াম, তিনি ছিলেন আবদুল উজ্জা বিন কুসাই গোত্রের; ৬. তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, তিনি ছিলেন আবু বকর রাযি.-এর বংশীয় এবং বনু তাইম গোত্রের। উমর রাযি.

---

২২০. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ২২৭-২২৮।

২২১. *আল-ফিতনা*, হিশাম জুয়াইত, পৃ. ৫৬।

তাদের সাথে নিজ পুত্র আবদুল্লাহকেও এ শর্তে শরিক করেন যে, সে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে না। বরং যদি সকলে মত প্রদানের পর দুপক্ষের সদস্যসংখ্যা সমান (জোড়) হয়, তাহলে সে একদলের পক্ষে মত প্রদান করে সে সংখ্যাকে বেজোড় করে তুলবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতের ওপর সিদ্ধান্ত হবে।[২২২] তবে আলোচনা চলাকালে তার মতামতের কোনো ধর্তব্য হবে না।

উমর রাযি.-এর ইচ্ছানুযায়ী তার মৃত্যুর পূর্বেই শুরা সদস্যদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তবে এ বৈঠকে সদস্যগণ তাদের মতভিন্নতার কারণে বিশেষ কোনো ফলাফলে পৌছতে পারেননি। উমর রাযি.-এর মৃত্যুর পর তাদের দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[২২৩] এ পর্যায়েও শুরা সদস্যগণ নির্দিষ্ট কারও ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। তখন আবদুর রহমান বিন আউফ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি খলিফার পদ থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। তবে এর বিনিময়ে তিনি শর্ত করেন—আমাকে খলিফা নির্বাচনের অধিকার দিতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি তাদের এ প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেন যে, তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা শুধু ন্যায়, সত্য ও উম্মাহর কল্যাণের জন্য নেবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং স্বজনপ্রীতিও করবেন না।[২২৪] তিনি শুরা সদস্যদের থেকেও এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তিনি যাকে নির্বাচন করবেন, সকলে তার কাছে বাইআত করবেন।

আবদুর রহমান বিন আউফ তাদের মধ্য হতে উসমান রাযি. ও আলি রাযি.-কে মনোনীত করে এ ব্যাপারে জনগণের মতামত জানার চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকদের সাথে পরামর্শ করেন। অধিকাংশই উসমান রাযি.-এর পক্ষে মত প্রদান করেন। প্রকাশ থাকে যে, বনু উমাইয়া মক্কা বিজয়ের পর তাদের হারানো প্রতিপত্তির পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে উসমান রাযি.-কে নির্বাচনের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আবু বকর রাযি. ও উমর রাযি.-এর শাসনামলে তা পুনরুদ্ধারে তারা অনেকটা সফলতার মুখও দেখে।[২২৫]

---

[২২২]. *আনসাবুল আশরাফ*, বালাযুরি, খ. ৬, পৃ. ১২০-১২১; *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ২২৮-২২৯।

[২২৩]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ২২৯।

[২২৪]. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ২৩১-২৩২।

[২২৫]. *মুকাদ্দামা ফি তারিখি সাদরিল ইসলাম*, আবদুল আজিজ আদ-দুরি, পৃ. ৫০।

আবদুর রহমান বিন আউফ এই দুই ব্যক্তির প্রতি শর্তারোপ করেন—আল্লাহর কিতাব, নবীজির সুন্নাহ ও তাঁর পরবর্তী দুই খলিফার আদর্শের অনুসরণ করতে হবে এবং আত্মীয়স্বজনকে জনগণের দায়িত্বশীল করা যাবে না। উসমান রাযি. এ শর্ত মেনে নেন; কিন্তু আলি রাযি. খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে বলেন, তিনি চেষ্টা করবেন। আলি রাযি., শুরা সদস্যবৃন্দ ও অধিকাংশ জনগণের সমর্থন উসমান রাযি.-এর পক্ষেই ছিল।[২২৬] মূলত রাজনৈতিক অঙ্গনে তখন ভিন্ন ভিন্ন দুটি দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে দুটি পক্ষ তৈরি হয়েছিল :

এক পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—খলিফা হবেন এমন ব্যক্তি, যিনি আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং নবীজির সঙ্গে যার আত্মীয়তা ও রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। এ দলটি আলি রাযি.-কে সমর্থন করেছিল।

অপর পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—খলিফা হবেন এমন ব্যক্তি, যিনি খেলাফতের উপযুক্ত এবং সর্বোত্তমরূপে কুরাইশের প্রতিনিধিত্বকারী, অধিকন্তু তিনি বনু উমাইয়ার অন্তর্ভুক্ত। এ দলটি উসমান রাযি.-কে সমর্থন করেছিল।

এ সবকিছুর কারণে একটি জটিল সমীকরণ তৈরি হয় এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছা কঠিনতর হয়ে যায়। একদল সাহাবি উসমান রাযি. খলিফা হওয়ার বিরোধিতা করেন। কারণ, তারা মনে করতেন—উসমানকে খলিফা নির্বাচন করলে আলির যোগ্যতার অমর্যাদা করা হয়। তাদের এ বিরোধিতার কারণে এ আশঙ্কা তৈরি হয় যে, উসমান রাযি. খলিফা হলে পরে রাষ্ট্রে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।[২২৭] যারা বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের মধ্যে আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব, মিকদাদ বিন আমর, আবু যর গিফারি, আম্মার বিন ইয়াসির অন্যতম। আবার অনেক সাহাবি উসমান রাযি.-এর হাতে বাইআত হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন; যদিও তাদের সমর্থনের পেছনে একাধিক কারণ ছিল। সমর্থনকারীদের মধ্যে মুগিরা ইবনে শুবা রাযি., উসমান রাযি.-এর আত্মীয়স্বজন, যেমন : আবদুল্লাহ ইবনু আবি রাবিআহ, আবদুল্লাহ ইবনু আবি সারহ অন্যতম।[২২৮]

---

২২৬. *আনসাবুল আশরাফ*, বালাযুরি, খ. ৬, পৃ. ১২৭-১২৮।

২২৭. *আল-মুআররিখুনাল আরব ওয়াল ফিতনাতুল কুবরা*, আদনান মুহাম্মাদ মুলহিম, পৃ. ৯৩।

২২৮. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ২৩৩-২৩৪, ২৩৯।

অবশেষে ২৯ জিলহজ ২৩ হিজরি মোতাবেক ৫ নভেম্বর ৬৪৪ খ্রি. রোজ সোমবার উসমান রাযি.-এর হাতে বাইআত সম্পন্ন হয়। এর একদিন পরই ২৪ হিজরি শুরু হয়।[২২৯]

উসমান বিন আফফান রাযি.-এর যুগে বিজয়সমূহ

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর শাসনামলে বহুদূর পর্যন্ত ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। মুসলিমরা বাইজেন্টাইন ও পারস্য সম্রাটদ্বয়ের সাম্রাজ্যের বিশাল অংশ নিজেদের অধিকারে নেয়। উসমান রাযি.-এর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর কোনো কোনো অঞ্চলের লোকজন মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করে। উসমান রাযি. সেনাবাহিনী প্রেরণ করে তাদের দমন ও বশীভূত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। সেই অভিযানগুলোর অন্যতম হলো—হামাদান, রায়, ইস্কান্দারিয়া, কিরমান, সিজিস্তান, খোরাসান ও নিশাপুর বিজয়। এমনিভাবে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার বিদ্রোহীদের দমন করে সেখানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। এ ছাড়াও বাইজেন্টাইন সৈন্যরা যে-সকল উপকূলীয় শহর পুনর্দখল করেছিল, মুসলিমরা সেগুলো পুনরুদ্ধার করেন।[২৩০]

অপরদিকে উসমান রাযি. পারস্যের দিকেও বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখেন। বিশেষ করে, কুফা ও বসরার মতো গুরুত্বপূর্ণ দুটি শহর জয় করেন এবং এগুলোর ভূ-প্রাকৃতিক গুরুত্বের কারণে সেখানে মুসলিম সৈন্যদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। অতঃপর মুসলিমরা তাবারিস্তান, জুরজান, জাওযজান ও তালিকান জয় করেন।[২৩১]

এদিকে সিরিয়া অভিমুখে বাইজেন্টাইনদের মোকাবেলায়, বিশেষ করে সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে লড়াই অব্যাহত থাকে। ফলে মুসলিমরা উত্তরে আর্মেনিয়া এবং আফ্রিকার কারতাজিনা (Cartagena) জয় করেন। এ সময় মুআবিয়া রাযি. এশিয়া-মাইনরের মধ্যভাগে অবস্থিত আমুরিয়া (Amorium) জয় করেন। এ অঞ্চলে মৌসুমি যুদ্ধসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন,

---

[২২৯]. *আনসাবুল আশরাফ*, বালাযুরি, খ. ৬, পৃ. ১২৯, খ. ৬, পৃ. ২২৭-২৪১।

[২৩০]. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৬১-৬৪; *আল-বাদউ ওয়াত তারিখ*, আল-মাকদিসি : খ. ৫, পৃ. ১৯৪-১৯৮।

[২৩১]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪-১৮৬, ২৪৬-২৪৭, ২৫০।

যেগুলোকে গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ (صوائف) ও শীতকালীন যুদ্ধ (شواتي) বলে নামকরণ করা হয়।[২৩২]

প্রকাশ থাকে যে, স্থলপথের এ সকল যুদ্ধ বাইজেন্টাইন সৈন্যদের আক্রমণ থেকে সিরিয়া ভূখণ্ডকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট ছিল না। বরং জলপথে যুদ্ধ করাও অপরিহার্য ছিল। তখন মুআবিয়া রাযি. উসমান রাযি.-এর অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জলপথে যুদ্ধ শুরু করেন। ২৮ হিজরি মোতাবেক ৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সাইপ্রাস দ্বীপ জয় করেন। এরপর সিসিলি (Sicily) জয় করে রোডস (Rhodes) আক্রমণ করেন। অতঃপর পুনরায় সাইপ্রাসে অভিযান চালিয়ে বিদ্রোহ দমন করেন। তবে এ অঞ্চলে সবচেয়ে বড় যুদ্ধটি হয়েছিল ৩৪ হিজরি মোতাবেক ৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে, যখন মুসলিমরা এশিয়া মাইনরের কেলিয়া উপকূলে জাতুস সাওয়ারি (Battle of the Masts) নামক যুদ্ধে বাইজেন্টাইন সৈন্যদের মুখোমুখি হয়েছিল। এখানে মুসলিম নৌবাহিনী ও বাইজেন্টাইন নৌবাহিনীর মধ্যে সমুদ্রপথে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাইজেন্টাইন সম্রাট কন্সটান্স (Constans) এতে আহত হয়। এ যুদ্ধকে জাতুস সাওয়ারি (মাস্তুলধারী) নামকরণের কারণ হলো, এতে প্রচুর পরিমাণ মাস্তুলবিশিষ্ট জাহাজ ব্যবহৃত হয়।[২৩৩]

এ যুদ্ধের পর সামরিক অভিযান আপাতত স্থগিত করা হয়। কারণ, তখন মুসলিম ও বাইজেন্টাইনদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও কলহ-বিবাদ শুরু হয়। প্রত্যেকেই নিজেদের মধ্যকার অরাজকতা দমন ও বিবাদ নিরসনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ইসলামি সাম্রাজ্যে অরাজকতার কারণসমূহ

উসমান রাযি.-এর শাসনকাল ছিল ১২ বছর বা এক যুগ। এ সময়কে অবস্থার দিক বিবেচনায় দুভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি ভাগ ছয় বছর করে। প্রথম ভাগটি ছিল শান্ত, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও সন্তোষজনক। আর দ্বিতীয় ভাগটি ছিল বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনাপূর্ণ—যেখানে পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ থেকে খারাপতর হতে থাকে, অবশেষে তা উসমান রাযি.-এর নিহত হওয়ার পর্যায়ে গড়ায়। দ্বিতীয় ভাগে একটি কুচক্রী মহল অরাজকতা সৃষ্টি এবং উসমান রাযি.-এর বিরুদ্ধে জনগণকে বিক্ষুব্ধ করার ক্ষেত্রে যে-সকল অভিযোগ-আপত্তিকে

---

[২৩২]. *তারিখু খলিফা ইবনি খায়্যাত*, ইবনু খাইয়াত, পৃ. ৯২।

[২৩৩]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ২৫৮, ২৮৮-২৯২, ৩১৭।

হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, সেগুলোর অধিকাংশের শিকড় প্রথম ভাগেই ছিল। বিষয়টি এমন নয় যে, উসমান রাযি.-এর নীতি ও কর্মকাণ্ড সহসা পরিবর্তিত হয়ে জনসাধারণের মনকে বিষিয়ে দিয়েছে। বরং ২৯ হি. থেকেই তাঁর কিছু সিদ্ধান্তের ওপর মানুষের অসন্তোষ প্রকাশ পায় এবং তা ক্রমেই বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে ছোট ছোট এমন কিছু ঘটনাও ঘটে, যা জনমানুষের মেধা ও মননে বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং একপর্যায়ে তা বৃহদাকার ধারণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।[২৩৪]

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকালে উসমান রাযি. ছিলেন একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন পবিত্র অন্তর, সুন্দর নিয়ত ও নম্র স্বভাবের অধিকারী। তাঁর এ সকল গুণাবলির সুযোগে ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে ইন্দ্রজালের সরল শিকারে পরিণত করে। কারণ, শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কোমলতা ও ন্যায়নিষ্ঠার পাশাপাশি শাসকসুলভ দৃঢ়তা ও কঠোর নীতিও আবশ্যক।

উসমান রাযি. বিভিন্ন অঞ্চল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সংরক্ষণের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন। একই সময়ে তাকে অনেক দিক সামলাতে হয়। জিহাদের জন্য জীবনোৎসর্গকারী যোদ্ধাদের সঠিক নির্দেশনা প্রদান, মদিনার কেন্দ্রীয় শাসন, রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রক্ষণাবেক্ষণ, বিজিত অঞ্চলগুলোতে শৃঙ্খলা বিধান এবং পরাজিত জাতিগোষ্ঠীর সাথে সেনাদের আচরণবিধি ইত্যাকার সবকিছু তত্ত্বাবধান করতে হয়।[২৩৫]

ইতিহাসের উৎসগ্রন্থসমূহে উসমান রাযি.-এর বিরুদ্ধে যে-সকল আপত্তির কথা উল্লেখ আছে, তার মধ্যে উদার শাসননীতি ও গোত্রপ্রীতি ছিল অন্যতম। এ উদারনীতির কারণেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে অন্ধকারে পরিণত হয়। এ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোর গভীর অধ্যয়ন ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা ঐতিহাসিক সত্যটি জানতে পারি।

ইতিহাসবিদগণ অরাজকতার যেসব কারণ চিহ্নিত করেছেন, নিম্নে আমি সেগুলো হতে প্রধান কয়েকটি কারণ উল্লেখ করছি[২৩৬] :

---

২৩৪. *আনসাবুল আশরাফ*, বালাযুরি, খ. ৬, পৃ. ১৩৩; *আল-ফিতনা*, হিশাম জুয়াইত, পৃ. ৬৫-৬৬; *আল-মুআররিখুনাল আরব ওয়াল ফিতনাতুল কুবরা*, মুলহিম, পৃ. ১০৬।

২৩৫. *আল-ফিতনা*, হিশাম জুয়াইত, পৃ. ৬০।

২৩৬. *আনসাবুল আশরাফ*, বালাযুরি, খ. ৬, পৃ. ২০৮-২০৯।

১. উসমান রাযি. হাকাম বিন আস বিন উমাইয়াকে মদিনায় ফিরে আসার সুযোগ করে দেন; অথচ নবীজি তার কষ্টদায়ক স্বভাবের কারণে তাকে ও তার পুত্রকে তায়েফে নির্বাসন দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে উসমান রাযি.-এর যুক্তি ছিল—তিনি তাদের পক্ষে নবীজির সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তখন তিনি তাদের মদিনায় প্রবেশের অনুমতি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে মৃত্যুর কারণে এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।[২৩৭]

২. তিনি আবু যর গিফারি রাযি.-কে মদিনা থেকে রাবাযা নামক স্থানে প্রেরণ করেন। আবু যর রাযি. একজন দুনিয়াবিরাগী, সৎ মানুষ ছিলেন। তিনি ধনসম্পদ জমা করার বিরোধিতা করতেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—মানুষ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে ধনভান্ডার জমা করে, তা তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করবে। এ কারণে তিনি অতিরিক্ত সম্পদ গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া ওয়াজিব মনে করতেন। আসলে ধনসম্পদের বিষয়ে আবু যরের গবেষণা ও দৃষ্টিভঙ্গি অধিকাংশ সাহাবির দৃষ্টিভঙ্গির খেলাফ ছিল।

   উসমান রাযি.-সহ আরও কয়েকজন মিলে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, আপনার এ দাওয়াত মানবপ্রকৃতির অনুকূল নয় এবং এ মতের ওপর উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এ মতপার্থক্যের কারণে আবু যর উসমান রাযি.-এর কাছে মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুমতি কামনা করেন। তখন তিনি আবু যরকে অনুমতি দিয়ে রাবাযা[২৩৮] নামক এলাকায় বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। কেননা আবু যর রাযি. স্বভাবতই একাকীত্ব ও নির্জনতা পছন্দ করতেন।

৩. উসমান রাযি. উমর রাযি. কর্তৃক নিয়োগকৃত শাসক ও গভর্নরদের বরখাস্ত করে নিজের স্বজনদের তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তাদের নৈকট্যশীল করেন। উসমান রাযি.-এর এ পরিবর্তননীতি সাহাবায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসলিমদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তবে বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। উসমান রাযি. কাউকেই বিনা অভিযোগে কিংবা স্বেচ্ছায় অব্যাহতি কামনা ছাড়া বরখাস্ত

---

[২৩৭]. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ৩৪৭, ৩৯৯; *আনসাবুল আশরাফ*, বালাযুরি, খ. ৬, পৃ. ১৩৫-১৪৩৬।
[২৩৮]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ২৮৩-২৮৪।

করেননি।[২৩৯] আর রাষ্ট্রীয় কাজে আত্মীয়স্বজনদের নৈকট্যশীল করা কোনো নতুন বিষয় নয়।

তা ছাড়া তিনি আত্মীয়স্বজনদের মধ্য হতে কেবল তাদেরকেই সরকারি পদে নিয়োগ দিয়েছেন, যাদেরকে নবীজি নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাদের অধিকাংশই পূর্ববর্তী দুই খলিফার আমলে গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে সরকারি দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন : সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, ওয়ালিদ বিন উকবাহ, সাইদ ইবনুল আস, আবদুল্লাহ ইবনু আবি সারাহ, মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাযি.। বাস্তবতা হলো, উসমান রাযি. যে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ বা বরখাস্ত করেছেন, তা কেবল আমানত রক্ষা ও জনস্বার্থে করেছেন। সেখানে স্বজনপ্রীতির কোনো ভূমিকা ছিল না।

৪. উসমান রাযি. কর্তৃক কুরআন সংকলন এবং সাতটি আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে এক ভাষায় কুরআন তেলাওয়াত বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি ছিল একটি সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ। এ কারণে তিনি অনেক বিতর্কিত হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে উসমান রাযি.-এর যুক্তি ছিল—বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন তেলাওয়াতের কারণে মানুষের মতভেদ এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, এখন একে অপরকে কাফের বলতে শুরু করেছে এবং এতে করে উম্মতের মধ্যে বিরাট ফিতনা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।[২৪০]

৫. চারণভূমি বিস্তৃতকরণের নীতিটিও উসমান রাযি.-কে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। মূলত সাদকাকৃত উটের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তিনি সরকারি চারণভূমির সীমানা বৃদ্ধি করেন। তবে তিনি কিছুসংখ্যক সরকারি কর্মকর্তা ও সাহাবিকে সেখানে তাদের উট চরানোর অনুমতি প্রদান করেন। ফলে, কোনো কোনো সাহাবি তার এ কাজের সমালোচনা করেন।[২৪১]

---

[২৩৯]. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ২৫৩।

[২৪০]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ৩৪৭।

[২৪১]. প্রাগুক্ত; *আনসাবুল আশরাফ*, বালাযুরি, খ. ৬, পৃ. ১৪৯-১৫১।

৬. উসমান রাযি. ২৯ হিজরি মোতাবেক ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে হজের মৌসুমে মিনায় যে নামাজ আদায় করেন, তাতে তিনি তুমুল সমালোচিত হন। সেখানে তিনি নবীজি ও পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের নীতির বিপরীত দুই রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত আদায় করেন। আসল ব্যাপার হলো, তারা মিনায় মুসাফির হিসেবে নামাজ কসর করেছেন। আর উসমান রাযি.-এর এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যাখ্যা ছিল। তিনি মক্কায় বিবাহ করে আবাস গড়ার কারণে নিজেকে মুকিম মনে করতেন। এদিকে সাধারণ মুসলিমদের মধ্য হতে কেউ কেউ মনে করত—মিনায় মুকিমের নামাজও বুঝি দুই রাকাত। তিনি মূলত এ ভ্রান্তি নিরসন করতে চেয়েছেন। আবদুর রহমান বিন আউফ তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'ইয়ামেনবাসী ও বেদুইন হাজিদের মধ্য হতে কেউ কেউ গত বছর হজে এসে বলেছিল, মুকিমের নামাজ দুই রাকাত, যেমন তোমাদের এ ইমামও দুই রাকাত আদায় করেন! এ বছর আমি মক্কায় আবাস গড়েছি। এজন্য আমি চার রাকাত আদায় করি; যেন মানুষ এ কথা মনে না করে যে, মিনায় মুকিমের নামাজও দুই রাকাত।'[২৪২]

নৈরাজ্য সৃষ্টি ও উসমান রাযি.-কে হত্যা

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন উসমান রাযি. ও তার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের কারণ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—কুফা, বসরা, মিসর প্রভৃতি শহরে যে-সকল আরব বেদুইন বসতি গড়েছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল এমন, যারা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। নবীজির সাক্ষাৎ সান্নিধ্য তাদের ভাগ্যে জুটেনি এবং নববি চরিত্র ও শিষ্টাচারের যথাযথ অনুশীলন করে নিজেদের পরিশীলিত করতে পারেনি।

তা ছাড়া জাহেলি যুগের নির্দয়তা, রূঢ় স্বভাব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব পরিহার করে ঈমানের শীতলছায়ায় নিজেদের শান্ত করতে পারেনি। ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে মুহাজির ও আনসারদের [যেমন : কুরাইশ, কিনানা, সাকিফ, হুজাইল, হিজাজ ও ইয়াসরিববাসী, ঈমানের দিক থেকে যারা অগ্রগামী] শাসনাধীন হওয়াকে তারা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারেনি।

---

[২৪২]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ২৬৭-২৬৮।

কারণ, তারা বংশ, লোকবল, পারস্য ও রোমকদের মোকাবেলা ইত্যাদি বিচারে নিজেদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করত। বিকর বিন ওয়ায়েল, আবদুল কায়েস বিন রাবিআ গোত্র, কিন্দা, ইয়েমেনের আজ্‌দ গোত্র, তামিম ও মুজারের কায়েস গোত্র এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল লোক কুরাইশকে অবজ্ঞা ও হেয়জ্ঞান করল এবং তাদের আনুগত্যে শিথিলতা করতে লাগল। অজুহাত হিসেবে তারা কুরাইশের জুলুম ও সীমালঙ্ঘনকে দায়ী করল এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অক্ষমতা ও সম্পদের অসম বণ্টনের অভিযোগ আরোপ করল।

লোকমুখে এ বিষয়গুলোর চর্চা হতে হতে অবশেষে তা মদিনায় পৌঁছে গেল। মদিনাবাসীরা এসব অভিযোগকে খুব গুরুত্ব দিলো। উসমান রাযি. প্রকৃত অবস্থা যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন শহরে লোক প্রেরণ করলেন। কিন্তু সেই তালাশ-টিম সরেজমিন তদন্ত করে অভিযোগের কোনো বাস্তবতা খুঁজে পায়নি। এদিকে অভিযোগ, আপত্তি ও কদর্যতা যেন কোনোভাবেই থামছে না। এরপর বিভিন্ন শহর থেকে প্রতিনিধিদল এসে তাদের শাসকদেরকে বরখাস্তের আবেদন করল। হযরত আয়েশা রাযি., আলি রাযি., যুবায়ের রাযি. ও তালহা রাযি.-এর মতো নেতৃস্থানীয় সাহাবিদের কাছে তাদের অভিযোগের কথা তুলে ধরল। তাদের দাবি অনুযায়ী উসমান রাযি. কয়েকজন শাসককে বরখাস্তও করেন; কিন্তু তাতেও তাদের মুখ বন্ধ হয়নি।[২৪৩]

প্রকাশ থাকে যে, এ ফিতনার উৎপত্তি হয়েছিল কুফায়, যা তখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতায় ভুগছিল। কারণ, এখানকার অধিবাসীদের বিজয় ও গনিমতের পরিমাণ অন্যান্য শহরের তুলনায় কম ছিল। অধিকন্তু গনিমতের সম্পদ বণ্টনেও ত্রুটি ছিল। এ সবকিছুর কারণে শহরটি যেন অর্থনৈতিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। এদিকে ওয়ালিদ বিন উকবা ও সাইদ ইবনুল আস-এর দ্বৈতনীতির কারণে প্রশাসনও সফলতার মুখ দেখতে পারছিল না। ওয়ালিদ বিন উকবার নীতি ছিল—তিনি দরিদ্র, ক্রীতদাস ও নওমুসলিমদের কাছে টেনে নিয়ে তাদের জন্য ফাই (বিনা যুদ্ধে সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত অর্থসম্পদ) থেকে ভাতার ব্যবস্থা করতেন। অবশ্য অভিজাত শ্রেণি এ নীতির কারণে তার প্রতি রুষ্ট ছিল; যদিও তাদের ভাতায় কোনো কমতি হয়নি।

---

২৪৩. আল-মুকাদ্দামা : ইবনে খালদুন, পৃ. ৩৭৯-৩৮১।

বিপরীতে সাইদ ইবনুল আস খলিফার নির্দেশনা মোতাবেক গোত্রীয় মর্যাদার পরিবর্তে যারা পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ইসলামের জন্য যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি অনুসরণ করতেন।[২৪৪] তা সত্ত্বেও এ নীতি ক্রমাগত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। বিশেষ করে সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত ভূমির আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে খলিফা যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন—তথা অগ্রবর্তী মুসলিমদের জন্য সবটুকু বরাদ্দ দেওয়া—এর কারণে কুফাবাসী [আয়্যাম ও কাদিসিয়্যার অধিবাসী, যাদের অধিকাংশই ছিল ইয়ামেনি গোত্রের] ও কেন্দ্রীয় খেলাফতের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি হয়ে তা তলানিতে গিয়ে ঠেকে। কুফাবাসীরা এ নীতির বিরোধিতা করে। কারণ তারা বুঝতে পারে যে, এ নীতি তাদের মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। কেননা, সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত ভূমির আয়ের সঙ্গে তাদের যে অধিকার ও দাবি-দাওয়া সম্পৃক্ত উক্ত নীতির কারণে তাদের সে অধিকার ক্ষুণ্ন হবে।[২৪৫] পরবর্তী সময়ে তারা সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত ভূমির আয় মদিনায় প্রেরণ করতে আপত্তি করে এবং প্রত্যেক শহরের সমুদয় আয় সেখানকার যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টনের দাবি জানায়। এ দাবির পেছনে তাদের যুক্তি ছিল—এটি মুসলিমদের সম্পদ। কাজেই তা স্থানীয় মুসলিমদের মধ্যেই বণ্টন হবে। কিন্তু খলিফার যুক্তি ছিল, এটি আল্লাহর সম্পদ তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদ। কাজেই রাষ্ট্র তার প্রয়োজন অনুপাতে ব্যয় করবে।[২৪৬]

৩৩ হিজরি মোতাবেক ৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সাইদ ইবনুল আস এক জনসভায় একটি বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'এ শ্যামলভূমি তো কুরাইশের উদ্যান।' তখন মালেক বিন আশতার নাখয়ি তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ করে বলেন, 'তুমি কি মনে করো—যে শ্যামলভূমি আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের তরবারির বিনিময়ে দান করেছেন তা তোমার ও তোমার কওমের উদ্যান! আল্লাহর শপথ, তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি তার ভাগের সবটুকু উসুল করবে, তার অংশও আমাদের যে-কারও থেকে বেশি হবে না।'[২৪৭]

---

২৪৪. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ২৭৯; *আল-ফিতনা*, হিশাম জুয়াইত, পৃ. ৮২।

২৪৫. *আল-মুআররিখুনাল আরব ওয়াল ফিতনাতুল কুবরা*, মুলহিম, পৃ. ১৩৭।

২৪৬. *মুকাদ্দামা ফি তারিখি সাদরিল ইসলাম*, আবদুল আজিজ আদ-দুরি পৃ. ৫৫।

২৪৭. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ৩২৩।

আশতারের এ জবাবের মাধ্যমে মদিনা ও কুরাইশ অধ্যুষিত উসমানি সাম্রাজ্যের সাথে কুফার অভ্যন্তরীণ বিরোধের পাশাপাশি সাধারণভাবে অন্যান্য শহরের এবং বিশেষত কুফার বাহ্যিক বিরোধের বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কুফার পরিস্থিতি তখনো পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্যেই সীমিত ছিল। তাই খলিফা এটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন এবং বিক্ষোভকারীদের—যাদের নেতা ছিল মালেক বিন আশতার—দাবির প্রেক্ষিতে সাইদ বিন আসকে বরখাস্ত করে আবু মুসা আশআরিকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।[২৪৮] সেই সঙ্গে আরও প্রমাণিত হয় যে, বেদুইন গোত্রগুলো তখন মদিনার কেন্দ্রীয় শাসন ও কুরাইশের নেতৃত্বের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল।[২৪৯]

তাবারি বলেন, 'প্রথম উত্তেজনা কুফাবাসীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। এটিই ছিল প্রথম শহর, শয়তান যার অধিবাসীদের প্ররোচিত করেছে।'[২৫০]

এ বিক্ষোভ আন্দোলন কুফায় যতটা তীব্র আকার ধারণ করেছিল বসরায় ততটা ধারণ করেনি। কারণ, বসরার অর্থনৈতিক অবস্থা তখন কুফার চেয়ে ভালো ছিল। আবদুল কায়েস ও আজ্‌দ গোত্র এবং পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বসরা তখন অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল।

তবে বসরার গভর্নর আবু মুসা আশআরি রাযি. সংকীর্ণ নীতির অনুসরণ করে কয়েকজন স্থানীয় নেতাকে ক্ষেপিয়ে তোলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো গায়লান বিন খারাশাহ দাব্বি। এ কারণে খলিফা ২৯ হিজরি মোতাবেক ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে তাকে বরখাস্ত করে আবদুল্লাহ বিন আমেরকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।[২৫১] উসমান রাযি.-এর শাসননীতি ও তাঁর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যে-সকল আপত্তি তোলা হয়েছিল, তা ইতোমধ্যে বসরা-সহ অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে পড়ে।

বসরার একদল লোক উসমান রাযি.-এর কর্মকাণ্ড নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে। অতঃপর তাদের এক অনুসারীকে—যার নাম ছিল আমের বিন আবদুল কায়েস তামিমি—উসমান রাযি.-এর প্রতি মানুষের অভিযোগ সম্পর্কে

---

২৪৮. প্রাগুক্ত : খ. ৪ ,পৃ. ৩৩৫-৩৩৬।

২৪৯. *মুকাদ্দামা ফি তারিখি সাদরিল ইসলাম*, আবদুল আজিজ আদ-দুরি, পৃ. ১৮-২০।

২৫০. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ২৫১।

২৫১. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ২৬৪।

আলোচনা করতে মদিনায় প্রেরণ করে। সে মদিনায় পৌছে খলিফাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ প্রদান করে। তখন খলিফা তাঁকে এ বলে ধমক দেন—'তুমি তো জানই না যে, আল্লাহ কোথায় আছেন!'[২৫২]

উসমান রাযি.-এর শাসনামলের শুরুতে মিসরে দুজন শাসক ছিল। তাদের একজন আমর ইবনুল আস, যিনি নিচু অঞ্চলের শাসক ছিলেন। অপরজন আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ, যিনি উঁচু অঞ্চলের শাসক ছিলেন। আবার একই সঙ্গে তিনি উসমান রাযি.-এর চাচাতো ভাই ও দুধভাইও ছিলেন। তাদের প্রথমজন খলিফার কাছে দ্বিতীয়জনকে বরখাস্ত করে সমগ্র মিসর একাই শাসন করার আবেদন পেশ করেন। উসমান রাযি. তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তখন আমর খলিফার কাছে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলে খলিফা তাকে অব্যাহতি দিয়ে দেন এবং সাদ বিন আবি সারাহকে পুরো মিসরের দায়িত্ব প্রদান করেন।[২৫৩] তার দায়িত্ব পালনকালে মিসরে বহু অভিযোগ প্রকাশ পায়, যা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হয়। আর এ বিশৃঙ্খলার পেছনে যারা নেতৃত্ব দেন তারা হলেন : **এক.** মুহাম্মাদ বিন আবি হুজায়ফা রাযি., উসমান রাযি.-এর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত বিষয়ে বিরোধ ছিল। **দুই.** মুহাম্মাদ বিন আবু বকর, সম্ভবত তিনি প্ররোচনায় পড়ে এ তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। **তিন.** আম্মার বিন ইয়াসির, বনু হাশিমের মিত্র এবং উসমান রাযি.-এর নীতির সমালোচনাকারী, বিশেষ করে আত্মীয়স্বজনদের চাকরিতে নিয়োগ ও তাদের সাহায্য গ্রহণের বিষয়ে।

বিভিন্ন শহরে ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর ঘটনাবলি ও অভিযোগের কারণে উসমান রাযি. ৩৪ হিজরি মোতাবেক ৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তার গভর্নরদের নিয়ে একটি জরুরি পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। এ সভায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে শান্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এ বছরেই বিভিন্ন শহরের আনাচে-কানাচে অভিযোগ-আপত্তি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়; এমনকি মদিনায় এর রব পড়ে যায়। তখন কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবি উসমান রাযি.-এর কাছে গিয়ে তার কর্তব্যের বিষয়ে আলোচনা করেন। তখন উসমান রাযি. ৩৫ হিজরি মোতাবেক ৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তার গভর্নরদের নিয়ে দ্বিতীয় আরেকটি পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। এ

---

২৫২. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ৩৩৩।

২৫৩. *ফুতুহু মিসর ও আখবারুহা*, ইবনু আবদিল হাকাম, পৃ. ১১৮-১১৯; *কিতাবুল উলাত ওয়াল কুযাত*, আল-কিন্দি, পৃ. ১১।

সভায় গভর্নরগণ তাকে আশ্বস্ত করেন যে, অচিরেই তাদের শহরগুলোতে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসবে।[২৫৪]

এ উত্তপ্ত পরিবেশের ভেতরেই কুচক্রী মহলের নেতাদের মধ্যে একটি গোপন পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পত্রযোগে কিংবা ৩৪ হিজরি মোতাবেক ৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে হজের মৌসুমে তাদের পরামর্শ সভা আহ্বান করা হয়।[২৫৫] পরামর্শের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩৫ হিজরির শাওয়াল মোতাবেক ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মিসর, কুফা ও বসরার লোকদের নিয়ে একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠিত হয় এবং তারা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি স্থান দিয়ে মদিনায় প্রবেশ করে। তাদের বাহ্যিক উদ্দেশ্য ছিল—খলিফার কাছে তাদের অভিযোগ ও দাবিদাওয়া পেশ করা। তখন তাদের স্লোগান ছিল—'আপনি সবকিছু উলটপালট করে দিয়েছেন।' সেই সঙ্গে খলিফাকে তার দোষ স্বীকার করে নীতির পরিবর্তনের কথা বলা। কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য ছিল—যেকোনো ক্রমে খলিফাকে পদচ্যুত করা।[২৫৬]

এ বিক্ষোভ আন্দোলনের দুটি ধাপ ছিল। প্রথম ধাপটি ছিল শান্তিপূর্ণ। যেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা, বিতর্ক ও মধ্যস্থতা হয় এবং উসমান রাযি. বিক্ষোভকারীদের দাবি মেনে নিলে তারা নিজ দেশে ফিরে যায়। তখন বাহ্যত মনে হয়েছিল—এখানেই বুঝি চলমান সমস্যার ইতি ঘটেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, উসমান রাযি.-এর নীতিতে পরিবর্তন আনা এবং বিক্ষোভকারীদের ফিরে যাওয়া ছিল নিছক একটি কৌশল। এরপর তারা সশস্ত্র হামলার উদ্দেশ্যে আবার মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে এবং খলিফাকে তাঁর গৃহে অবরুদ্ধ করে। পরিস্থিতি ক্রমেই তীব্রতর হতে থাকে। পরিশেষে বিক্ষোভকারীরা দেয়াল টপকে খলিফার গৃহে প্রবেশ করে খলিফার ওপর আক্রমণ করে। উসমান রাযি. ১৮ জিলহজ ৩৫ হিজরি মোতাবেক ১৭ জুন ৬৫৬ খ্রি. রোজ শুক্রবার শাহাদত বরণ করেন।[২৫৭]
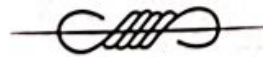
২৫৪. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ৩৩৩-৩৩৫, ৩৪২-৩৪৩।

২৫৫. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ৩৪৫; *আল-ফিতনা*, হিশাম জুয়াইত, পৃ. ১০৮-১০৯।

২৫৬. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯; *আনসাবুল আশরাফ*, বালাযুরি, খ. ৬, পৃ. ১৫৮, ১৭৪।

২৫৭. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ৩৪৬-৩৫৫, ৩৬৭-৩৯৬; *আনসাবুল আশরাফ*, বালাযুরি, খ. ৬, পৃ. ১৭৩-১৯২, ২০১-২০৫।

|

আলি ইবনে আবু তালেব রাযি.

(৩৬-৪০ হি./৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)

আলি রাযি.-এর হাতে বাইআত

ইসলামের ইতিহাসে উসমান রাযি.-এর হত্যাকাণ্ড ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক একটি ঘটনা। কারণ, নিষ্ঠুরতা ও নির্দয়তা এত দূর গড়ায় যে, হত্যাকারীরা তাকে হত্যার পর দাফনের সুযোগটি পর্যন্ত দিচ্ছিল না। পরিশেষে যখন উসমান রাযি.-এর চাচাতো বোন উম্মে হাবিবা, যিনি নবীজির বিধবা স্ত্রী ও উম্মুল মুমিনিন—সকলের সামনে নবীজির সম্মানহানির হুমকি[২৫৮] দিলেন, তখন তারা দাফনের পথ ছেড়ে দেয়। অতঃপর রাতের বেলা দাফনকার্য সম্পন্ন হয় এবং বাকিউল গারকাদের সীমানার বাইরে তাকে দাফন করা হয়।[২৫৯]

এসব ঘটনা তখনকার, যখন সাধারণ মুসলমান উসমান রাযি.-এর বাইআতের ওপর অটল ছিল এবং তার নিযুক্ত গভর্নরদের প্রতি অনুগত ছিল। কিন্তু মদিনার এ উত্তেজনাপূর্ণ ও সংকটময় মুহূর্তে হাতে গোনা কয়েকজন সাহাবি বাদে কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। কোনো কোনো গভর্নর যে সামরিক সাহায্য পাঠিয়েছিল, তা এসে পৌঁছুতে যথেষ্ট বিলম্ব হয় এবং এর পূর্বেই যা ঘটার, তা ঘটে যায়। ইতিহাসের পাতায় উসমান রাযি.-এর হত্যাকাণ্ডকে মুসলমানদের ঐক্যের প্রাচীরে ফাটল সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক ও আদর্শিক বিভাজনের সূচনা হিসেবে গণ্য করা হয়।[২৬০]

---

[২৫৮]. *আনসাবুল আশরাফ*, খ. ৬, পৃ. ২০৫।

বি. দ্র. সম্ভবত তিনি 'সম্মানহানি' এ কথার দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, দাফনকার্য সম্পন্ন করতে না দিলে প্রয়োজনে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। প্রকাশ থাকে যে, উম্মুল মুমিনিনকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার এবং এটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানহানির নামান্তর।—অনুবাদক

[২৫৯]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ৪১৪।

[২৬০]. *আল-ফিতনা*, হিশাম জুয়াইত, পৃ. ১২৫।

উসমান রাযি. নিহত হওয়ার পরপরই উমাইয়া বংশের লোকজন মদিনা থেকে সওে যায়। এমনিভাবে অধিকাংশ সাহাবি মদিনা ছেড়ে অন্যত্র যাত্রা করেন। অবশিষ্ট যারা ছিল, তারা দ্রুত গিয়ে আলি রাযি.-এর হাতে খেলাফতের বাইআত গ্রহণ করে। কারণ, এমন গুরুতর ও জটিল পরিস্থিতিতে উম্মাহ খলিফাবিহীন থাকতে পারে না। হত্যাকাণ্ডের পর বিক্ষোভকারীরা মদিনার শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেয়। হত্যা-পরবর্তী যেকোনো খারাপ পরিস্থিতির মোকাবেলা এবং তাদের বিরোধীশক্তিকে দমন করতে তারা আলি রাযি.-এর পক্ষ নেয় এবং তাকে খলিফা বানাতে জোর তৎপরতা চালায়। কিন্তু এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, তারা নির্দ্বিধায় আলি রাযি.-এর পক্ষ নিয়েছিল। বরং পরিস্থিতি পালটে গেলে আলি রাযি.-এর বিপক্ষে চলে যাওয়া ছিল তাদের জন্য সময়ের ব্যাপার। এমন জটিল সমীকরণের মধ্যে আলি রাযি.-এর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ বাহ্যত ঘটমান ট্র্যাজেডির সমর্থন ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়াকেই নির্দেশ করছিল।[২৬১]

আলি রাযি. একরকম বাধ্য হয়েই খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কারণ, তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, এ মুহূর্তে খলিফা না থাকলে দ্বীন ও মুসলিমদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিভক্তি চরম আকার ধারণ করবে। তবে যারা তাকে খলিফা হতে বাধ্য করেছিল, তাদের তিনি শর্ত করেছিলেন—'তার বাইআত মসজিদে প্রকাশ্যে হতে হবে এবং সকল মুসলিম, বিশেষত শুরা কমিটির সদস্য ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্মতি থাকতে হবে।'[২৬২]

বাস্তবে আলি রাযি.-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি কারও কোনো অভিযোগ ছিল না এবং তার নির্বাচন প্রক্রিয়া যদিও যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়নি তবুও তাতে তেমন আপত্তি ছিল না। তবে উম্মাহর একটি বৃহৎ অংশ উসমান রাযি.-এর খুনের বদলার দাবিতে তৎপর হয়। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আবার চরম উত্তেজনা শুরু হয়। এ কারণে নেতৃস্থানীয় অনেক সাহাবি বাইআত থেকে বিরত থাকেন। তাদের কেউ কেউ বাইআত হতে ইতস্তত বোধ করেন। যেমন, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর প্রমুখ। এ ছাড়াও হাস্সান বিন সাবেত, মাসলামা ইবনে মাখলাদ, আবু সাইদ খুদরি প্রমুখ সাহাবি—যারা উসমান রাযি.-এর ঘনিষ্ঠ ছিলেন—বাইআত থেকে বিরত থাকেন।

---

[২৬১]. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৪১-১৪২।

[২৬২]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ৩২৭-৪৩৫।

আবার কুরাইশ বংশের বনু উমাইয়া গোত্রের কয়েকজন নেতা এজন্য বাইআত করেননি যে, আলি রাযি.-এর হাতে বাইআত হলে খেলাফতের ধারা বনু উমাইয়া থেকে বনু হাশিমদের মধ্যে চলে যাবে।[২৬৩] আবার তাদের কেউ কেউ এমন শর্ত করেন যে, তিনি যেন তাদের ক্ষমা করে দেন এবং তাদের হাতে যে সহায়-সম্পত্তি আছে তা আপন অবস্থায় বহাল রাখেন, সেই সঙ্গে উসমান রাযি.-এর হত্যাকারীদের ওপর কিসাস প্রয়োগ করেন। আবার বিশিষ্টজনদের কেউ কেউ আশঙ্কা করেন, উসমান রাযি.-এর যুগে আয়েশি জীবনযাপনের পর আবার বুঝি উমর রাযি.-এর যুগের মতো কঠোর শাসনে ফিরে যেতে হবে। কারণ, আলি রাযি. ছিলেন উমর রাযি.-এর মতো কঠোর হৃদয়, দৃঢ়চিত্ত ও সংকল্পের অধিকারী।[২৬৪] সর্বোপরি, আলি রাযি. সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা নির্বাচিত হননি; বরং অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে খলিফা হয়েছিলেন এবং উসমান রাযি.-এর নিহত হওয়ার পাঁচ দিন পর লোকজন তাঁর কাছে বাইআত হওয়া শুরু করে।[২৬৫]

আলি রাযি.-এর সর্বজনীন রাজনীতি

আলি রাযি.-এর হাতে বাইআত হওয়ার পর কয়েক মাস যাবৎ তার কোনো শত্রু ছিল না; বরং তখন ইসলামি রাষ্ট্রের মধ্যে ধীরে ধীরে অসন্তোষ ও ক্ষোভ ছড়াতে থাকে। ইতোমধ্যে তিনি ধন ও জনে সমৃদ্ধ অধিকাংশ প্রদেশের গভর্নরদের থেকে তাঁর খেলাফতের স্বীকৃতি নিয়ে নিয়েছিলেন। তবে একটি প্রদেশ তখনো পর্যন্ত সাহসিকতার সাথে বাইআত থেকে বিরত থাকে। যদিও উসমান রাযি.-এর নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতি উম্মাহর অধিকাংশ লোকই তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে; তবে তারা খলিফার প্রতি সমর্থনের মধ্য দিয়ে উম্মাহর ঐক্য ধরে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। তখন সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন মুআবিয়া রাযি. এবং তিনি ছিলেন একক ব্যক্তিত্ব, যার দিকে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। কারণ, সিরিয়াবাসীরা আলি রাযি.-এর বাইআত প্রত্যাখ্যান করেছিল।

আলি রাযি.-এর নির্বাচন-সংক্রান্ত জটিলতাগুলো সমাধান করা সম্ভব ছিল। তবে তিনি দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যে-কারণে পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। যেমন তিনি নতুন

---

[২৬৩]. প্রাগুক্ত।

[২৬৪]. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪২৭-৪৪১।

[২৬৫]. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৩৬।

রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেন, যেখানে তিনি প্রশাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। এ পরিবর্তিত নীতির কারণে প্রশাসনের একটি বৃহৎ অংশ তার বিরুদ্ধে চলে যায়। একই সময়ে অনেক শীর্ষস্থানীয় সাহাবি উসমান রাযি.-এর হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হলে আলি রাযি. তাদের শান্ত হতে ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরার উপদেশ দেন।

প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং আলি রাযি.-ও উসমান রাযি.-এর হত্যাকাণ্ডের কারণে অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। তবে তখনকার পরিস্থিতি এমন সঙ্গিন ছিল যে, ধর্মীয় চেতনাবোধের ওপর রাজনৈতিক প্রবণতা প্রাধান্য বিস্তার করে। মানুষ দ্বীনি কাজে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার পরিবর্তে সমালোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং কিতাবুল্লাহর অভিমুখী হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠে। ফলে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে এবং অনিরাপত্তা বিরাজ করে।

আলি রাযি. খেলাফত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই উসমান রাযি. কর্তৃক নিযুক্ত সমস্ত গভর্নরকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মূলত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—একদিকে জনগণকে শান্ত করা এবং অপরদিকে আস্থাভাজন গভর্নরদের নিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা; যদিও তার ঘনিষ্ঠজনদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাকে এ কথা বুঝিয়েছিলেন যে, আপনি এমন পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকুন, কিংবা করতে চাইলে আরও পরে করুন। সেই সঙ্গে মুআবিয়া রাযি.-এর সঙ্গে কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার করবেন না। কারণ, তিনিই একমাত্র গভর্নর, যার প্রদেশটি এখনো পর্যন্ত স্থিতিশীল। তা ছাড়া তাকে কিন্তু উসমান রাযি. গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেননি; বরং তিনি সে-সকল গভর্নরদের একজন, যাদের স্বয়ং উমর রাযি. নিয়োগ দিয়েছিলেন।

এ জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে খলিফার পক্ষ থেকে পূর্বের গভর্নরদের পদচ্যুত করে তাদের জায়গায় একদল নতুন গভর্নর নিয়োগের ফরমান এসে উপস্থিত হয়। তবে আবু মুসা আশআরি ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তাকে পদচ্যুত না করে শুধু বসরা থেকে সরিয়ে কুফার গভর্নর করা হয়।[২৬৬] খলিফা কর্তৃক বরখাস্তের এ ফরমান রাজনৈতিক অঙ্গনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এদিকে বিভিন্ন শহরে উসমান রাযি.-এর হত্যাকারীদের থেকে

---

২৬৬. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৭৭।

কিসাস গ্রহণের আওয়াজ ওঠে। এমনিভাবে অনেক জায়গায় উসমান রাযি. হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আলি রাযি.-এর সম্পৃক্ততার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। খলিফার আরেকটি সিদ্ধান্ত পরিস্থিতিকে আরও বেশি অশান্ত করে তোলে। আর তা হলো, উসমান রাযি. তার কয়েকজন আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিকে বাইতুল মাল থেকে যে জায়গির বরাদ্দ দিয়েছিলেন, আলি রাযি. সেগুলো প্রত্যাহার করেন এবং তাদের বাড়তি সুবিধা বাতিল করে তাদের অন্য লোকদের বরাবর করে দেন।

জঙ্গে জামাল (উটের যুদ্ধ)

রাজনৈতিক বিভাজন ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে আলি রাযি. কর্তৃক প্রশাসন ও নির্বাহী বিভাগ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলোর কারণে তার বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। মুআবিয়া রাযি. তার বাইআতকে প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে খলিফা কর্তৃক নবনিযুক্ত সিরিয়ার গভর্নর সাহল বিন হুনাইফ রাযি. সিরিয়ায় আগমনের পূর্বেই মাঝপথ থেকে মদিনায় ফিরে যান। তখন তিনি শুধু কাগজে-কলমে খলিফার অধীন গভর্নর ছিলেন; কিন্তু কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের মতো কার্যত নির্বাহী ক্ষমতা তার ছিল না। অধিকন্তু রাজনৈতিক অঙ্গনে তখন অনেক নেতৃস্থানীয় সাহাবি এমন ছিলেন, যাদের কথা তার চেয়ে বেশি মান্য করা হতো।

উসমান রাযি.-এর হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে প্রথমে হযরত আয়েশা রাযি.-এর পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। তিনি মক্কা থেকে প্রতিবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দুজন বিশিষ্ট সাহাবি তাকে এ কাজে সহযোগিতা করেন। তারা হলেন, তালহা ও যুবায়ের। তারা উসমান হত্যাকাণ্ডের চার মাস পর আলি রাযি.-এর অনুমতিক্রমে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন এবং সেখানে গিয়ে হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে যুক্ত হন।

হজরত আয়েশা রাযি. উসমান রাযি.-এর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান। কেননা, পবিত্র মাসে আল্লাহর পবিত্র নগরীতে এ নৃশংসতার বৈধতার কোনো সুযোগ নেই; অধিকন্তু যখন উসমান রাযি. বিক্ষোভকারীদের কাছে তার পূর্ববর্তী নীতি থেকে সরে আসার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।[২৬৭] এদিকে উমাইয়ারা মাজলুম খলিফা উসমান রাযি.-এর হত্যাকারীদের ওপর আল্লাহর শরিয়া অনুযায়ী কিসাস প্রয়োগের দাবিতে সোচ্চার হয়।

---

[২৬৭]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ৪৪৮-৪৪৯।

অল্প সময়ের মধ্যে নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে মৈত্রীজোট এবং তার অনুসারীরা বসরায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারণ, এ শহরটি উদ্ভূত সমস্যার মধ্যেও অভ্যন্তরীণ বিভাজন থেকে মুক্ত ছিল। সেই সঙ্গে এ শহরের অধিবাসীরা উসমান রাযি.-এর প্রতি ছিল সহানুভূতিশীল এবং তারাও উসমান রাযি.-এর হত্যার বিচার কামনা করত। অধিকন্তু অন্যান্য শহরের মুসলিমদের ওপর এখানকার নেতৃবৃন্দের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। মূলত শুরুতে আলি রাযি.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোনো চিন্তা কারোরই ছিল না। কিন্তু বসরার গভর্নর উসমান বিন হুনাইফ দৃঢ়ভাবে আলি রাযি.-এর পক্ষাবলম্বন করে এবং তার পক্ষে শক্তি-সঞ্চয় করে। এমনকি মৈত্রীজোটের সহযোগীদের অস্ত্রের মুখে শহরে প্রবেশে বাধা প্রদান করে। তথাপি বসরাবাসীদের অনেকে তাদের দলে শামিল হয়।[২৬৮]

আলি রাযি. মুআবিয়ার সঙ্গে চলমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সিরিয়া অভিমুখে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে তার কাছে মৈত্রীজোটের সৈন্যসমাবেশের সংবাদ এসে পৌঁছে। তখন তিনি সিরিয়া গমনের পূর্বে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের ইচ্ছা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ৩৬ হি. রবিউস সানি মাসের শেষ সপ্তাহ মোতাবেক ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে মদিনা থেকে বসরার দিকে যাত্রা করেন। এ বাহিনীর মধ্যে উসমান রাযি.-এর হত্যাকারীরাও ছিল। তাদের নেতা ছিল—আশতার, যায়েদ বিন সুহান, আদি বিন হাতিম, ইয়াযিদ বিন কায়েস প্রমুখ। এদিকে কুফা ও বসরাবাসীরা তাদের সেনাবাহিনীর সিংহভাগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে। এভাবে যারা উসমান রাযি.-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করেছিল, তারাই আলি রাযি.-এর বাহিনীর প্রধান প্রধান দায়িত্বে নিযুক্ত হয়। এরপর আলি রাযি. 'যু-ক্বার' নামক স্থানে সেনাছাউনি স্থাপন করেন, যেখানে তিনি পূর্বে থেকেই সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি কুফাবাসীদের নিজের পক্ষে রাখার জন্য তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করতে থাকেন। তখন ৭ হাজার ২০০ যোদ্ধা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। তারপর তিনি সৈন্যদের নিয়ে বসরা অভিমুখে যাত্রা করেন। ইতোমধ্যে তার সৈন্যসংখ্যা ১২ হাজার থেকে ২০ হাজারে উন্নীত হয়। অতঃপর তিনি শুক্রবার সকালে (জুমাদাল উখরার ২০ তারিখ মোতাবেক ৪ ডিসেম্বর) বসরায় পৌঁছেন এবং বসরার

---

২৬৮. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ৪৬১-৪৬২।

নিকটবর্তী 'জাবিয়া' নামক এলাকায় তাঁবু গাড়েন।[২৬৯] অপরদিকে মৈত্রীজোটের সৈন্যরা—যাদের সদস্যসংখ্যা ছিল ৩০ হাজার—জাবুকা থেকে ফারজায় গিয়ে উপস্থিত হয়।[২৭০] অতঃপর উভয় বাহিনী 'খুরাইবা' নামক স্থানে মুখোমুখি হয়।[২৭১]

এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার একপর্যায়ে উভয় পক্ষ পরিস্থিতি শান্ত হলে উসমান রাযি.-এর হত্যাকারীদের ওপর কিসাস প্রয়োগ করা হবে—এ বিষয়ে সম্মত হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়। কিন্তু আলি রাযি.-এর বাহিনীতে ঘাপটি মেরে থাকা উসমান রাযি.-এর হত্যাকারীরা, যখন দেখল যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্ধি হয়ে যাবে, তখন তারা একটি গোপন পরামর্শ সভার আয়োজন করে। সেখানে আশতার আলি রাযি.-কে হত্যার পরামর্শ দেয়। আরেক নেতা আলি রাযি.-এর পক্ষত্যাগের পরামর্শ প্রদান করে। কিন্তু তৃতীয় একটি দল উভয় পক্ষের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করে। আর তা এভাবে যে, তারা উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে অতর্কিত হামলা শুরু করবে, আর হলোও তা-ই। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক বাহিনী মনে করে, প্রতিপক্ষ তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ফলে, যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। হযরত আয়েশা রাযি. যে-উটের হাওদায় বসেছিলেন, তা যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো। কারণ, উটকে উদ্দেশ্য করেই একদল আক্রমণ করছিল এবং অপর দল আক্রমণ প্রতিহত করছিল। এ কারণে এ যুদ্ধটি উটের যুদ্ধ (জঙ্গে জামাল) নামে পরিচিত। যুদ্ধ শেষে আলি রাযি. বিজয় লাভ করেন এবং তালহা রাযি. ও যুবায়ের রাযি. শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর আলি রাযি. আয়েশা রাযি.-কে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে মদিনায় প্রেরণ করেন এবং তিনি মদিনার পরিবর্তে কুফাকে রাজধানীতে রূপান্তর করেন। কারণ, তিনি যুদ্ধের পূর্বে তাকে সহায়তাকারী কুফাবাসীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কুফাকে রাজধানীতে রূপান্তরিত করবেন।[২৭২]

---

[২৬৯]. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ৪৮৭-৫০৫।

[২৭০]. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ৫০৫।

[২৭১]. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ৫২৪।

[২৭২]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ৫৪৬; *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৮০-৮২।

সিফ্‌ফিন যুদ্ধ

আলি রাযি.-এর হত্যাকাণ্ড

জঙ্গে জামাল (উটের যুদ্ধ) এরপর পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত হয় এবং বসরা, কুফা, মিসর, ইয়েমেন, হিজাজ, ইরান ও খোরাসানে আলি রাযি.-এর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সিরিয়া ছিল এর ব্যতিক্রম। কারণ, তখন মুআবিয়া রাযি. ছিলেন একক ব্যক্তিত্ব, যিনি আলি রাযি.-এর বাইআত প্রত্যাখ্যান করার মতো হিম্মত ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এ সময় আলি রাযি.-কে তার সঙ্গীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পরামর্শ দিচ্ছিলেন, দ্রুত সিরিয়া গিয়ে মুআবিয়াকে বশে আনুন। কিন্তু তিনি তাতে বিলম্ব করেন এবং মুআবিয়া রাযি.-এর কাছে পুনরায় আশাবাদ ব্যক্ত করে পত্র লেখেন—হয়তো তিনি এবার বশ্যতা স্বীকার করে বাইআত গ্রহণ করবেন এবং মুসলিমদের বড় দলের সাথে শরিক হয়ে যাবেন। মুআবিয়া রাযি. তার পত্রের জবাবে দুটি শর্ত আরোপ করেন। **এক.** উসমান রাযি.-এর হত্যাকারীদের থেকে কিসাস নিতে হবে। **দুই.** নতুন খলিফা নির্বাচনের জন্য শুরা ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।[২৭৩]

মুআবিয়া রাযি.-এর এ দুটি শর্তের কারণে পরিস্থিতি আবারও উত্তপ্ত হয় এবং তাদের মধ্যে লড়াইয়ের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। কারণ, প্রথম শর্তটি উসমান রাযি.-এর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত বিষয়, আর দ্বিতীয় শর্তটি শাসনক্ষমতা সংশ্লিষ্ট। তন্মধ্যে প্রথম বিষয়টি প্রকট আকার ধারণ করে। বিশেষত ক্বারি, দুনিয়াবিরাগী শ্রেণি এবং সিরিয়ার যোদ্ধাদের একটি বড় দল—যারা মজলুম নিহত খলিফার নির্মম হত্যাকাণ্ডে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হয়েছিলেন—তারা কিসাসের দাবিতে সরব হয়ে ওঠেন।

আর দ্বিতীয় শর্তটি এমন, যা ছিল আলি রাযি.-এর খেলাফতের জন্য হুমকিস্বরূপ। কারণ, ইতোমধ্যেই তিনি অধিকাংশ মুহাজির ও আনসারদের সমর্থন পেয়ে গেছেন। যেহেতু খেলাফতের দায়িত্বপ্রদানের কেন্দ্র ছিল মদিনা, আর তার নির্বাচন প্রক্রিয়াটি মদিনাতেই সম্পন্ন হয়। এদিকে মুআবিয়া রাযি. উসমান রাযি.-এর হত্যাকে কেন্দ্র করে নতুনভাবে বিরোধ শুরু করেন।[২৭৪] তার যুক্তি ছিল—বাইআত সংঘটিত হয়েছিল এমন সময়, যখন পরিবেশ

---

২৭৩. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ৫৬১-৫৬২।

২৭৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৯০।

অশান্ত ছিল এবং মদিনা উচ্ছৃঙ্খল লোকদের দখলে ছিল। তা ছাড়া এ বাইআতের পেছনে সকল সাহাবির সম্মতি ছিল না। মুআবিয়ার এহেন বিরোধের কারণে তার ও আলি রাযি.-এর রাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

অতএব, ৩৭ হিজরির সফর মোতাবেক ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফোরাত নদীর তীরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। যুদ্ধের ভয়াবহতা ও মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতির কথা উপলব্ধি করে সিরীয় বাহিনীর মাঝে এমন চিন্তা জাগ্রত হয় যে, এ যুদ্ধের কারণে ইসলাম ও আরবদের অস্তিত্ব এখানেই বিলীন হয়ে যাবে। কেননা, এর মাধ্যমে গোটা উম্মত সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে এবং একদল অপর দলের ওপর বিজয়ের প্রচেষ্টায় টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এমন সময় তারা বাকিয়্যা (بقية)[২৭৫] বলে সন্ধির আওয়াজ তোলে। কিন্তু আলি রাযি.-এর বাহিনী মুআবিয়ার সন্ধির প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। সম্ভবত ইরাকি বাহিনী ধারণা করেছিল, সিরীয় সৈন্যরা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং আমাদের বিজয় সন্নিকটে, তাই তারা এখন সন্ধির প্রস্তাব করছে। তখন মুআবিয়া রাযি. ইসলামের ইঙ্গিতসূচক ভাষার আশ্রয় নেন এবং সৈন্যদেরকে বর্শার মাথায় কুরআন শরিফ উঁচু করে ধরতে আদেশ করেন। অতঃপর ইরাকি সৈন্যদের উদ্দেশে বললেন, আল্লাহর কিতাব আমাদের মাঝে ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবে।[২৭৬] এ জায়গায় হযরত মুআবিয়ার কৌশলটিকে তার পরাজয় এড়ানোর জন্য প্রতারণার আশ্রয় মনে করা ভুল। কারণ, তখন তিনি না পরাজয় বরণ করেছিলেন, আর না পরাজয়ের উপক্রম হয়েছিলেন।[২৭৭]

ইরাকি সৈন্যরা কিতাবুল্লাহর দিকে আহ্বানে সাড়া দেয় এবং যুদ্ধ মুলতবি করে। আলি রাযি. তখন তাঁর সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। অনেকেই যুদ্ধবিরতি করে কিতাবুল্লাহর ফয়সালা মেনে নেওয়ার পক্ষে মত প্রদান করে। যেমন : আশআস বিন কায়েস, হামদানিদের সর্দার সাইদ বিন কায়েস, রাবিআ গোত্রের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ এবং কারিদের একটি বড়

---

[২৭৫]. **বাকিয়্যা :** জাহেলি যুগের যুদ্ধের একটি পরিভাষা। যখন দুই গোত্রের মধ্যে লড়াই হতো এবং যুদ্ধের মাত্রা এত ভয়াবহ হতো যে, উভয় গোত্র ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হতো তখন তারা বাকিয়্যা (بقية) বলে আওয়াজ দিত। এর অর্থ হলো, সকলে ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কায় আমরা এখন যুদ্ধবিরতি করতে চাই।—লিসানুল আরব, ইবনে মানজুর, খ. ১৪, পৃ. ৮০।

[২৭৬]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৪, পৃ. ৫৬৯-৫৭২, খ. ৫, পৃ. ১০-৪৮।

[২৭৭]. *আল-ফিতনা*, হিশাম জুয়াইত, পৃ, ২০৩।

দল; কুরআনের আহ্বান যাদের হৃদয়ে রেখাপাত করেছিল। অধিকাংশ সৈন্য এ দলের মতকে সমর্থন করে। কিন্তু আরেকটি দল যুদ্ধ মুলতবির বিরোধিতা করে। যেমন : আশতার, আদি ইবনে হাতেম প্রমুখ। মূলত এরা ছিল ওই দলের সদস্য, যারা উসমান রাযি.-এর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। কারিদের মধ্য হতে কট্টরপন্থী একটি ছোট দল তাদের মতকে সমর্থন করে। এরা সন্ধির প্রস্তাবকে অস্বীকার করে এবং বিজয়ের আগমুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করে। এরাই ছিল খারেজি সম্প্রদায়ের নেতা।[২৭৮] যদিও আলি রাযি. যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন; তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সৈন্যদের মতের বিপরীতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ তাঁর ছিল না।[২৭৯]

বাস্তবতা হলো, তখন উভয় পক্ষের সৈন্যরা শান্তিচুক্তির প্রতি অধিক আগ্রহী ছিল, যে কারণে সন্ধির বিষয়টি একরকম নিশ্চিত হয়ে যায়। উভয় পক্ষ তাদের মধ্য হতে একজনকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ লক্ষ্যে আলি রাযি. আবু মুসা আশআরিকে এবং মুআবিয়া রাযি. আমর ইবনুল আসকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করেন। তাদেরকে ছয় মাসের সময় বেঁধে দেওয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে তাদের আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ নিরসন করতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, যারা যুদ্ধবিরতির পক্ষে মত দিয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক বুঝতে পারে—তারা তড়িঘড়ি করে এমন সিদ্ধান্তের আশ্রয় নিয়েছে—যার পরতে পরতে হযরত মুআবিয়ার জন্য সুসংবাদ লুক্কায়িত রয়েছে। বিষয়টি তাদের স্বার্থের জন্য পূর্বের তুলনায় বেশি হুমকিস্বরূপ। তখন তারা ঘোষণা করে—যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। এরপর তারা আবার যুদ্ধ শুরু করার জোর দাবি করে এবং আলি রাযি.-এর ওপর ভুল স্বীকার করে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করার জন্য অনবরত চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। আলি রাযি. তাদের আহ্বানে সাড়া না দিলে তারা বিদ্রোহ করে খারেজি সম্প্রদায়ের দলে গিয়ে যুক্ত হয়।[২৮০]

---

[২৭৮]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ৪৯-৫৪।

[২৭৯]. প্রাগুক্ত : খ. ৫, পৃ. ৪৮-৫২।

[২৮০]. *আল-হিযবিয়্যাতুস সিয়াসিয়্যাহ মুনযু কিয়ামিল ইসলাম হাত্তা সুকুতিত দাওলাতিল উমাবিয়্যাহ*, রিয়ায ঈসা, পৃ. ৯১।

এ বিরোধের কারণে আলি রাযি.-এর বাহিনী থেকে ১২ হাজার সৈন্য আলাদা হয়ে যায়। তারা 'হারুরা'য়[২৮১] গিয়ে স্বতন্ত্র দল গঠন করে। এ কারণে তারা হারুরিয়্যাহ নামে পরিচিতি লাভ করে।[২৮২] আলি রাযি. তাদেরকে তাদের মত পরিহার করে নিজ দলে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তখন তারা মধ্যস্থতাকারী পরিহার করে যুদ্ধে ফিরে যাওয়ার শর্ত করে এবং 'আল্লাহ ছাড়া আর কারও সিদ্ধান্ত মানি না'—স্লোগান তুলে তাদের মতবাদ প্রচার করতে থাকে।[২৮৩]

জর্ডানের অন্তর্গত পেট্রার নিকটবর্তী 'আজরুহ' নামক স্থানে বিবদমান দুপক্ষের সম্মতিতে দুই মধ্যস্থতাকারী একত্র হন। কিন্তু তারা কোনো সিদ্ধান্তে একমত হতে পারেননি। আলোচনার পুরো সময়জুড়ে আমর ইবনুল আস রাযি. তার মক্কেল (মুআক্কিল) মুআবিয়ার জন্য খলিফার প্রার্থিতা বহাল রাখেন। কিন্তু আবু মুসা আশআরি রাযি. লাজুক স্বভাবের কারণে এবং বিশৃঙ্খলা বন্ধের উদ্দেশ্যে আলি রাযি.-এর পরিবর্তে খলিফা হিসেবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাতে সম্মত হননি। অতঃপর এ জটিলতা নিরসনের জন্য তারা একটি সিদ্ধান্তে একমত হন। তা হলো, তারা দুজনেই আলি রাযি. ও মুআবিয়া রাযি.-কে পদচ্যুত করে সমগ্র মুসলিমদের অধিকার দেবে, যেন তারা পরামর্শের ভিত্তিতে একজন খলিফা নির্বাচন করে নেয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত ঘোষণার ক্ষেত্রে ঘটে ভিন্ন ঘটনা। আবু মুসা আশআরি রাযি. আলি রাযি. ও মুআবিয়া রাযি. দুজনকেই পদচ্যুত করে খেলাফতের বিষয়টি মুসলিমদের ওপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু আমর ইবনুল আস রাযি. আলি রাযি.-কে পদচ্যুত করে মুআবিয়া রাযি.-কে খলিফার পদে বহাল রাখেন।[২৮৪]

আলি রাযি. ও মুআবিয়া রাযি. এর মধ্যকার মতবিরোধ ক্রমেই বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে আলি রাযি. (৪০ হিজরির রমজান মোতাবেক ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে)[২৮৫] খারেজি নেতা আবদুর রহমান বিন মুলজিমের হাতে নিহত হন। এ হত্যার পেছনে একটি রহস্য ছিল। খারেজি সম্প্রদায়ের কয়েকজন নেতা পরামর্শ করে স্থির করে যে, মুসলিমদের

---

[২৮১]. **হারুরা :** কুফার অন্তর্গত একটি গ্রাম।

[২৮২]. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৯২।

[২৮৩]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ৭২।

[২৮৪]. প্রাগুক্ত : খ. ৫, পৃ. ৬৭-৭১।

[২৮৫]. *তারিখু খলিফা ইবনি খায়্যাত*, খ. ১, পৃ. ১৮২; *তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ১৪৩।

মতানৈক্যের উৎস প্রভাবশালী তিন ব্যক্তিকে হত্যা করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এ তিন ব্যক্তি হলেন, আলি রাযি. মুআবিয়া রাযি. ও আমর ইবনুল আস রাযি.। তারা একই রাতে এ তিন ব্যক্তিকে হত্যার পরিকল্পনা করে। অতঃপর আলি রাযি.-এর হত্যাকারী তার মিশন বাস্তবায়নে সফল হয়, আর বাকি দুজন ব্যর্থ হয়।
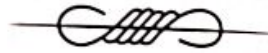
চতুর্থ অধ্যায়

উমাইয়া বংশের শাসনামল[২৮৬]

(৪১-১৩২ হি./৬৬১-৭৫০ খ্রি.)

২৮৬. উমাইয়া শাসনামলের বিস্তারিত বিবরণ জানতে দেখুন আমার রচিত গ্রন্থ—*'তারিখুদ দাওলাতিল উমাবিয়্যাহ'*।

উমাইয়া খলিফাবৃন্দ

মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান	৪১-৬০ হি./ ৬৬১-৬৮০ খ্রি.
ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়া (প্রথম ইয়াযিদ)	৬০-৬৪ হি./ ৬৮০-৬৮৩ খ্রি.
মুআবিয়া ইবনে ইয়াযিদ (দ্বিতীয় মুআবিয়া)	৬৪ হি./৬৮৪ খ্রি.
মারওয়ান ইবনুল হাকাম	৬৪-৬৫ হি./৬৮৪-৬৮৫ খ্রি.
আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান	৬৫-৮৬ হি./৬৮৫-৭০৫ খ্রি.
ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক (প্রথম ওয়ালিদ)	৮৬-৯৬ হি./৭০৫-৭১৫ খ্রি.
সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক	৯৬-৯৯ হি./৭১৫-৭১৭ খ্রি.
উমর ইবনে আবদুল আজিজ	৯৯-১০১ হি./৭১৭-৭২০ খ্রি.
ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালিক (দ্বিতীয় ইয়াযিদ)	১০১-১০৫ হি./৭২০-৭২৪ খ্রি.
হিশাম ইবনে আবদুল মালিক	১০৫-১২৫ হি./৭২৪-৭৪৩ খ্রি.
ওয়ালিদ বিন [দ্বিতীয়] ইয়াযিদ (দ্বিতীয় ওয়ালিদ)	১২৫-১২৬ হি./৭৪৩-৭৪৪ খ্রি.
ইয়াযিদ বিন [প্রথম] ওয়ালিদ (তৃতীয় ইয়াযিদ)	১২৬ হি./৭৪৪ খ্রি.
মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ	১২৭-১৩২ হি./৭৪৪-৭৫০ খ্রি.

I

মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযি.

(৪১-৬০ হি./৬৬১-৬৮০ খ্রি.)

উমাইয়া বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা

আলি রাযি.-এর হত্যাকাণ্ডের ফলে মুআবিয়া রাযি.-এর সামনে থেকে জগদ্দল পাথরটি সরে যায় এবং তার খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পথ সুগম হয়। তখন কুফাবাসীরা হাসানের হাতে বাইআত গ্রহণ করে এবং একই সময়ে সিরিয়াবাসীরা মুআবিয়া রাযি.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করে, অতঃপর মুআবিয়া রাযি. ইরাকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দ্রুত সেদিকে রওনা করেন। হাসান রাযি.-এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে মুআবিয়া রাযি.-এর মোকাবেলার জন্য বের হন। কিন্তু মুআবিয়া রাযি. ঘাসান রাযি.-এর সেনাপতি কায়েস বিন সাদ বিন উবাদাহ আনসারি ও ইবনে আব্বাসকে নিজের দলে ভেড়াতে সমর্থ হন। অপরদিকে হাসান রাযি. তার অনুসারীদের সহযোগিতার ব্যাপারে সন্দিহান, বরং আস্থাহীন হয়ে পড়েন; বিশেষত যখন তাদের একটি দল বিদ্রোহ করে তার পক্ষ ত্যাগ করে। তিনি অনুধাবন করেন, ইরাকি ও সিরীয় বাহিনীর রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি এক সমান নয়। তা ছাড়া নতুন করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে পুনরায় মুসলিমদের মধ্যে রক্তপাতের ঘটনা ঘটবে। তাই তিনি মুআবিয়ার সঙ্গে সমঝোতার নীতিকেই প্রাধান্য দেন। দুপক্ষের আলোচনার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, হাসান রাযি. খলিফার পদ থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেবেন এবং মুআবিয়া রাযি.-কে খেলাফতের দায়িত্ব প্রদান করবেন। মুআবিয়া রাযি.-এর পর মুসলিমরা পরামর্শের মাধ্যমে খলিফা নির্বাচন করবে, অপর এক বর্ণনামতে মুআবিয়া রাযি.-এর মৃত্যুর পর হাসান খলিফা হবেন। এ সন্ধির পর মুআবিয়া রাযি. কুফায় প্রবেশ করেন এবং হাসান ও হুসাইন রাযি. তার হাতে বাইআত

গ্রহণ করেন। এ বছরটিকে (৪১ হি.) 'ঐক্যের বছর' (عام الجماعة) বলে নামকরণ করা হয়। কারণ, তখন মুসলিম উম্মাহ একজন খলিফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়; তবে খারেজি সম্প্রদায় তখনো তার বাইআত থেকে বিরত থাকে। এভাবেই মুসলিমবিশ্বে উমাইয়া বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়।[২৮৭]

মুআবিয়া রাযি.-এর রাষ্ট্রনীতি

মুআবিয়া রাযি. ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং জাগতিক বিষয়ে সচেতন এক চৌকশ রাষ্ট্রনায়ক। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন সহনশীল, শক্তিমান, দক্ষ রাজনীতিবিদ, কুশলী, প্রাজ্ঞ, বিশুদ্ধভাষী ও বাগ্মী। তিনি কোমলতার জায়গায় যেমন কোমল আচরণ করতেন, তেমনই কঠোরতার জায়গায় কঠোর হতেন। তবে তার স্বভাবে কোমলতার প্রভাবই বেশি ছিল। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন উদার মনের অধিকারী ও মুক্তহস্তে সম্পদ ব্যয়কারী। নেতৃত্বের প্রতি তার স্বভাবজাত ঝোঁক ছিল। তিনি নিজের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রেখে বেশ কয়েকটি স্তম্ভ বা মৌলনীতির ওপর রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি স্তম্ভ হলো :

- রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলে পরিবর্তন আনা, আর তা সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে; যাদেরকে তিনি ইসলামি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে গঠন করে সুবিন্যস্ত করেন;
- অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক নীতিমালা প্রণয়ন, গোত্রীয় সাম্য প্রতিষ্ঠা, ভবিষ্যৎ খলিফা নির্ধারণ ও বিরোধীদের অনুগত করণ;
- ইসলামের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি যেমন—সাহাবা ও তাদের পুত্রদের সমর্থন ধরে রাখার লক্ষ্যে তাদের জন্য উপঢৌকন ও ভাতার ব্যবস্থা করা;
- নিজ হাতে রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনা;
- সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃতকরণ।

---

২৮৭. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ১২৩; *তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ১৬১, ১৬৩; *তারিখু খলিফা ইবনি খায়্যাত*, খ. ১, পৃ. ১৮৭; *আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার*, আবুল ফিদা, খ. ১, পৃ. ১৮৪; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবনু কাছির, খ. ৮, পৃ. ১৩৭; *আল-ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়্যাহ ওয়াদ দুওয়ালিল ইসলামিয়্যাহ*, ইবনুত তিকতাকা, মুহাম্মাদ বিন আলি বিন তাবাতবা, পৃ. ১০৪।

মুআবিয়া রাযি.-এর যুগে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

খারেজিদের আন্দোলন

মুআবিয়া রাযি. খারেজি সম্প্রদায়ের প্রতি আলি রাযি.-এর চেয়েও বেশি রুষ্ট ছিলেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এরা ইসলামের গতিপথ থেকে ছিটকে পড়েছে। অন্যদিকে তারাও উমাইয়া খলিফার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা তো করেইনি; উপরন্তু তাদের কর্মতৎপরতা খলিফাকে বরাবর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছে। এ কারণে তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে মোকাবেলা করতে বাধ্য হন। কুফা ও বসরায় এদের মজবুত ঘাঁটি ছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষও হয়; তবে কোনো ইতিবাচক ফলাফল সামনে আসেনি। তা ছাড়া মুআবিয়া রাযি.-এর পুরো শাসনামলজুড়ে গভর্নরদের কঠোর শাসন সত্ত্বেও ইরাকের অঞ্চলগুলো তেমন স্থিতিশীল হয়নি।[২৮৮]

আলাভিদের আন্দোলন

মুআবিয়া রাযি. খারেজি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অপর একটি শক্তির মোকাবেলা করেন। আর তা হলো, আলি ইবনে আবু তালেব রাযি.-এর ভক্তবৃন্দ, যারা আলাভি বা শিয়ানে আলি নামে পরিচিত। এরা কুফা ও বসরায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এদের বশে আনতে মুআবিয়া রাযি. কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কারণ, উমাইয়া শাসনামলে ইরাক ছিল একটি অরাজক অঞ্চল। এ দলটি হরহামেশা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে যৎসামান্যই শান্তিপূর্ণ আচরণ করে। উপরন্তু তারা কুফার গভর্নর মুগিরা ইবনে শুবা রাযি.-এর কোমল নীতির সুযোগে রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রাখে। তাই কঠোর পদক্ষেপ ছাড়া এ বিদ্রোহ দমন করে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ছিল দুরূহ ব্যাপার। এ কারণে মুআবিয়া রাযি. মুগিরা ইবনে শুবার মৃত্যুর পর (৫০ হিজরি মোতাবেক ৬৭০ খ্রি.) জিয়াদ ইবনে আবিহিকে বসরার পাশাপাশি কুফারও গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি কঠোর শাসননীতি অনুসরণ করে ইরাকবাসীর অন্তরে পুরোদস্তুর ভীতির সঞ্চার করেন। যে-কারণে আলাভিদের শক্তি

---

[২৮৮]. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ১২৪; *তারিখু খলিফা ইবনি খায়্যাত*, খ. ১, পৃ. ১৮৮; *তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ১৬৬, ১৭০-১৭১, ১৭৩-১৭৪, ২১৬, ২২২, ২২৮-২২৯, ৩১২-৩১৩; *আদ-দাওলাতুল আরাবিয়্যাহ ওয়া সুকুতুহা*, জুলিয়াস ওয়েল হাউজেন, পৃ. ৫৮-৫৯।

বহুলাংশে খর্ব হয়, এমনকি কুফি সর্দার হুজর ইবনে আদি ব্যতীত তখন আর কোনো বিরুদ্ধবাদীই ছিল না, আর হুজর ইবনে আদিকে তার কৃতকর্মের কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।[২৮৯]

ইয়াযিদের পক্ষে খেলাফতের বাইআত

মুআবিয়া রাযি. তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে স্বীয় পুত্র ইয়াযিদের নাম ঘোষণা করেন। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। বহু লোক তার সমালোচনা করে এবং তার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। কেননা এ কাজের মাধ্যমে তিনি সেই নীতি থেকে বের হয়ে গেছেন, মুসলিমরা আবু বকর রাযি.-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে নীতির অনুসরণ করে আসছিল।[২৯০]

আসলে মুআবিয়া রাযি.-এর এমন সিদ্ধান্তের পেছনে যে তাৎপর্য লুক্কায়িত ছিল, তা হলো—উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করার পেছনে তিনি যে অক্লান্ত শ্রম ও মেধা ব্যয় করেছেন তা যেন বিনষ্ট না হয়। বিশেষত উমাইয়া ও বনু হাশিমের মধ্যে বহুকাল আগ থেকে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। এখন যদি তারপরে বনু হাশিমের কাউকে খলিফা নির্বাচন করা হয়, তা হলে উমাইয়া বংশ থেকে খলিফা হওয়ার ধারা বন্ধ হয়ে যাবে—যা মেনে নিতে তারা কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিল না। এ কারণে তিনি বনু উমাইয়ার মধ্য হতে কোনো একজনকে স্থলাভিষিক্ত করা সংগত মনে করেন। এ লক্ষ্যে তিনি হিজাজ ও অন্যান্য শহরের অধিকাংশ লোকের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজ পুত্র ইয়াযিদকে[২৯১] ৫৬ হিজরি মোতাবেক ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। তবে সিরিয়াবাসী শুরু থেকেই তার সমর্থন জুগিয়েছিল। হযরত মুআবিয়া রাযি. বিরোধিতাকারীদের ইয়াযিদের পক্ষে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেন। কিন্তু হুসাইন বিন আলি রাযি. ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. কোনোভাবে স্বীকৃতি দিতে রাজি হননি।[২৯২] মুসলিমরা খেলাফতে রাশেদার যুগ থেকে যে নীতির চর্চা করে আসছিল,

---

২৮৯. *তারিখু খলিফা ইবনি খায়্যাত*, খ. ১, পৃ. ১৯৫, ১৯৯; *তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ২৫৩-২৫৭; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৩, পৃ. ২০৭।

২৯০. *আল-আলামুল ইসলামি ফিল আসরিল উমাবি*, আবদুশ শাফেয়ি আবদুল লতিফ, পৃ. ১২১।

২৯১. *তারিখু খলিফা ইবনি খায়্যাত*, খ. ১, পৃ. ১৯৯।

২৯২. *আল-ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ*, ইবনু কুতাইবা, খ. ১, পৃ. ১৪৮-১৫৪।

মুআবিয়া রাযি.-এর উক্ত সিদ্ধান্ত ছিল তার স্পষ্ট বিপরীত। এভাবে শুরাভিত্তিক খেলাফত ব্যবস্থার স্থলে রাজতন্ত্রের সূচনা হয়।[২৯৩]

মুআবিয়া রাযি.-এর পররাষ্ট্রনীতি

পূর্ব দিকের অভিযান

মুআবিয়া রাযি. তার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কিছু সুচিন্তিত ও প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা প্রণয়ন করেন। তবে তার শাসনামলে ব্যাপক আকারে বিজয় অর্জিত হয়নি; যদিও তখন মুসলিমদের বিজয়ধারা সিন্ধু পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তারা কাবুল[২৯৪] ও বোখারাও[২৯৫] জয় করে করে ফেলে। এরপর তিনি প্রাচ্যের দেশগুলোতে বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন এবং পারস্যের সাম্প্রদায়িক চেতনার কারণে বিজিত অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন সময় যে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দেয়, তা দমনের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

পশ্চিম দিকের অভিযান

ইসলামি সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল তথা সিরিয়া ও মিসরের অবস্থা ছিল এই যে, ইসলামি সাম্রাজ্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পাশাপাশি অবস্থানের কারণে একদিকে যেমন তাদের মধ্যে লড়াই অব্যাহত ছিল, অপরদিকে মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য তা ছিল রীতিমতো আতঙ্কের কারণ। বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত সামরিক নীতি প্রণয়ন, কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের লক্ষ্যে সুবিন্যস্ত অভিযান পরিচালনা, সেই সঙ্গে বাইজেন্টাইনদের আক্রমণ থেকে মুসলিমদের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, এ সবকিছুর কৃতিত্ব সামগ্রিকভাবে উমাইয়া খেলাফতের এবং বিশেষত মুআবিয়া রাযি.-এর। তিনি সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং বাইজেন্টাইন সীমান্তের সম্মুখবর্তী দুর্গ ও গিরিপথগুলোতে স্থায়ী নিরাপত্তা চৌকির ব্যবস্থা করেন, যা সুগুর (সীমান্ত চৌকি) নামে পরিচিত। সেই সঙ্গে তিনি বাইজেন্টাইন ভূখণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ কেল্লা ও স্থাপনাতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে

---

২৯৩. *তারিখুল ইসলাম আস-সিয়াসি...*, ইবরাহিম হাসান, খ, ১, পৃ. ২৮৪।

২৯৪. **কাবুল :** হিন্দুস্তান ও সিজিস্তানের মধ্যবর্তী অঞ্চল। এটি তাখারিস্তানের সীমান্তজুড়ে অবস্থিত [বর্তমানে আফগানিস্তানের রাজধানী]।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ৪, পৃ. ৪২৬।

২৯৫. **বোখারা :** মাওয়ারা-উন-নাহরের বৃহৎ অঞ্চলগুলোর একটি। বোখারা থেকে জায়হুন নদীর দূরত্ব দুদিনের পথ। এটি ছিল সামানি সাম্রাজ্যের রাজধানী (৮১৯-৮৯৯ খ্রি.)।-*মুজামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ৩৫৩।

তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখেন। বিশেষত যখন তারা মুসলিম ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে, তখন তাদের মোকাবেলায় আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক মৌসুমি অভিযানের ব্যবস্থা করেন। ঋতুভেদে এ অভিযান পরিচালনার কারণে এর নাম দেওয়া হয় শাওয়াতি (শীতকালীন অভিযান) ও সাওয়াইফ (গ্রীষ্মকালীন অভিযান)। এভাবে তিনি সীমান্তবর্তী দুর্গগুলোকে মজবুত করেন এবং জাজিরার অন্তর্গত সামিসাত (Samosata), মালাতিয়্যা (Malatya) ও ইস্পার্টা (Isparta) জয় করেন এবং নতুন করে আরও কিছু দুর্গের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।[২৯৬]

মুআবিয়া রাযি. জলপথে বাইজেন্টাইনদের প্রভাব বিস্তার রোধ ও সমুদ্র তীর থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুসলিম নৌবাহিনী গঠন করেন। এ নৌবাহিনী খলিফার প্রধান লক্ষ্যস্থল কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের উদ্দেশ্যে অনবরত আক্রমণ চালায়।

মুসলিমরা দুইবার বাইজেন্টাইনদের রাজধানী অবরোধ করে। প্রথমবার ৪৯ হি. মোতাবেক ৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে, আর দ্বিতীয়বার ৫৪ হি. মোতাবেক ৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে। দ্বিতীয় অবরোধ ৬০ হি. মোতাবেক ৬৮০ খ্রি. সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তবে মজবুত প্রাচীর ও ভূ-প্রাকৃতিক কারণে তারা সীমান্তের ভেতরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়।[২৯৭]

এরপর মুআবিয়া রাযি. অনুধাবন করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাইজেন্টাইনদের সাথে দীর্ঘ সময়ের জন্য সন্ধি করা প্রয়োজন। ফলে, মুসলিম ও বাইজেন্টাইন দুপক্ষের কূটনৈতিক আলোচনার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা হলো—মুআবিয়া রাযি. বাইজেন্টাইনদের বার্ষিক কর প্রদান করবেন, যার পরিমাণ ৩ হাজার স্বর্ণমুদ্রা, ৫০ জন কারাবন্দিকে মুক্তি প্রদান ও ৫০টি উন্নত মানের ঘোড়া। এ সন্ধি তিন বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।[২৯৮]

---

[২৯৬]. *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ. ১৮৮-১৮৯। ইস্পার্টা হলো রোমের এক প্রান্তে মালাতিয়্যা, সামিসাত ও হাদাসের মধ্যবর্তী একটি শহর।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ৩, পৃ. ১৩০-১৩১।

[২৯৭]. *তারিখু খলিফা ইবনি খায়্যাত*, খ. ১, পৃ. ১৯৭; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৩, পৃ. ৫৬-৫৭; *আল-কুওয়াল বাহরিয়্যাহ ওয়াত তিজারিয়্যাহ ফি হাউযিল বাহরিল মুতাওয়াসসিত*, আরচিবাল্ড লুইস, পৃ. ৯৬।

[২৯৮]. Les expéditions des Arabes contre Constantinople dans l'histoire et dans la légende : Canard, J. A. 1926, p. 36-80.

উত্তর আফ্রিকা অভিযান

মুআবিয়া রাযি. ৪৯ হি./৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে উকবা ইবনে নাফেকে আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি তিউনিসিয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, যেমন : ওদ্দান (Waddan), ফেজান (Fezzan), খাওয়ার (Khaoar) ও গাদামিস (Ghadames)[২৯৯] বিজয়ের মাধ্যমে তার সামরিক তৎপরতা শুরু করেন। সেই সঙ্গে তিনি এ যাবৎকালীন অর্জনগুলোর সুরক্ষার জন্য বিজিত শহর ও অঞ্চলগুলোতে সেনাঘাঁটি স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। এর পরের বছর তিনি উত্তর আফ্রিকাতে সামরিক অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে কায়রোয়ান শহর আবাদ করে সেখানেও সেনাঘাঁটি স্থাপন করেন।

মুআবিয়া রাযি. ৫৫ হি./৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দে উকবা ইবনে নাফেকে আমাজিগদের প্রতি তার কঠোর নীতির কারণে বরখাস্ত করেন এবং আবুল মুহাজির দিনার আনসারিকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি সেই অঞ্চলে বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা জোরদার করেন এবং আমাজিগদের প্রতি কোমলনীতি গ্রহণ করেন। এরপর তিনি আলজেরিয়ার দিকে বিজয়াভিযানের সূচনা করেন। উকবা বিন নাফে তিলিমসানের সন্নিকটে[৩০০] কুসাইলার নেতৃত্বাধীন আমাজিগ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে তাদের পরাজিত করেন এবং কুসাইলাকে বন্দি করেন। কিন্তু আবুল মুহাজির কুসাইলাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে কোমল আচরণ করেন। ফলে কুসাইলা ও তার কওম ইসলামে প্রবেশ করে।[৩০১] এরপর ৬২ হিজরি মোতাবেক ৬৮২ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া আবুল মুহাজিরকে বরখাস্ত করে উকবা ইবনে নাফেকে উত্তর আফ্রিকায় গভর্নর পদে পুনর্নিয়োগ করে।[৩০২]

---

২৯৯. *ফুতুহু মিসর ওয়া আফ্রিকিয়্যা*, ইবনু আবদিল হাকাম, পৃ. ২৬৪।

৩০০. **তিলিমসান :** মরক্কোয় (বর্তমানে আলজেরিয়ায়) অবস্থিত। এটি মূলত প্রাচীর ঘেরা দুটি পার্শ্ববর্তী শহরের সমষ্টি। উভয়ের মধ্যে পাথর নিক্ষেপ পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ২, পৃ. ৪৪।

৩০১. *ফুতুহুল বুলদান*, বালাযুরি, পৃ. ২৩০; *তারিখুল মাগরিব ও হাযারাতুহু মিন কুবাইলিল ফাতহিল ইসলামি ইলাল গাযভিল মুগোলি*, হুসাইন মুনিস খ. ১, পৃ. ৯১।

৩০২. *ফুতুহুল বুলদান*, বালাযুরি, পৃ. ২৩০।

মুআবিয়া রাযি.-এর প্রশাসন-নীতি

মুআবিয়া রাযি.-এর যুগে শাসনব্যবস্থায় আবশ্যিক পরিবর্তন এনে প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আধুনিকায়ন করা হয়। মূলত উমর রাযি. প্রশাসন-ব্যবস্থায় যে আধুনিকায়নের সূচনা করেন, মুআবিয়া রাযি. সেই ধারাকে অব্যাহত রাখেন; তবে তখনো পর্যন্ত চূড়ান্ত রূপদান সম্ভব হয়নি।[৩০৩] মুসলিমদের মধ্যে প্রথম মুআবিয়া রাযি. ডাক বিভাগ ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিটি সরকারি আদেশ ও প্রজ্ঞাপনের ওপর মোহর লাগানোর ও প্রতিটি নির্দেশের অফিস কপি সংরক্ষণের প্রথা চালু করেন। তিনি সরকারি চিঠিপত্রের খসড়া তৈরির জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করেন। এ ছাড়াও সেনা অধিদফতর ও রাজস্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা তার অনন্য কীর্তি। মূলত মুআবিয়া রাযি. বাইজেন্টাইন প্রশাসনে কর্মরত খ্রিষ্টান ব্যক্তিদের থেকে এ কাজে সহায়তা গ্রহণ করেন। যেমন সারজুন বিন মানসুর ও তার পুত্র মানসুর।[৩০৪]

মুআবিয়া রাযি.-এর মৃত্যু

মুআবিয়া রাযি. ৬০ হিজরির রজব মোতাবেক ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি চারজন নেতার অবস্থান সম্পর্কে খুব শঙ্কিত ছিলেন। তারা হলেন—আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, হাসান ইবনে আলি, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুম।[৩০৫]

* * *

---

৩০৩. *মালামিহুত তায়্যারাতিস সিয়াসিয়্যা ফিল কারনিল আওয়াল আল-হিজরি*, ইবরাহিম বায়যুন, পৃ. ১৫১।

৩০৪. *দিরাসাত ফি তারিখিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, হাস্সান হাল্লাক, পৃ. ৩৪।

৩০৫. *আল-আখবারুত তিওয়াল*, দিনাওয়ারি, পৃ. ১৭২।

ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়া

(৬০-৬৪ হি./৬৮০-৬৮৩ খ্রি.)

ইয়াযিদের হাতে বাইআত

মুআবিয়া রাযি.-এর মৃত্যুর পর লোকজন ইয়াযিদের হাতে বাইআত গ্রহণ করে। তবে হিজাজবাসীদের মধ্য থেকে হুসাইন ইবনে আলি রাযি. ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. বাইআত থেকে বিরত থাকেন।[৩০৬] মূলত ইয়াযিদ এক বিশালায়তন বিশিষ্ট ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে; তবে এর রাজনৈতিক বাতাবরণ ছিল বড় জটিল। উপরন্তু এ সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পেছনে তার উল্লেখযোগ্য ত্যাগ ও অবদান কোনোটিই ছিল না। বাস্তবিক অর্থে শাসনক্ষমতার তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি না করেই সেই ক্ষমতা হাতে পেয়ে যায় সে। তার ধারণা ছিল—সবকিছু তার ইচ্ছামাফিক হবে। ইয়াযিদ এ কথা বিশ্বাস করত যে, খলিফা হিসেবে তার আনুগত্য করা সকল মানুষের ওপর ওয়াজিব।

ইয়াযিদের শাসনামলে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি

কারবালা ট্রাজেডি[৩০৭]

ইয়াযিদ তার শাসনামলে গুরুত্বের বিচারে তিনটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রথমটি হলো, হুসাইন রাযি.-এর বাইআত প্রদানে অস্বীকৃতি; দ্বিতীয়টি হলো, মদিনাবাসীদের বিদ্রোহ; আর তৃতীয়টি হলো, মক্কায় আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর বাইআত প্রদানে অসম্মতি।

ইয়াযিদের খলিফার পদে সমাসীন হওয়াটা ইরাকবাসীদের অন্তরে তীব্র যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। কেননা, মুআবিয়া রাযি.-এর যুগে তাদের ওপর কঠোর

---

৩০৬. *তারিখু খলিফা ইবনি খায়্যাত*, খ. ১, পৃ. ২২২-২২৪।

৩০৭. **কারবালা :** কুফার নিকটস্থ মরুভূমির দিকে অবস্থিত।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ৪, পৃ. ৪৪৫।

শাসন অব্যাহত রাখা হয়। মুআবিয়া রাযি.-এর মৃত্যুর পর তাদের কাছে হুসাইন রাযি. কর্তৃক ইয়াযিদের বাইআত প্রত্যাখ্যানের সংবাদ পৌঁছে। সেই সঙ্গে কুফায় নিযুক্ত উমাইয়া গভর্নর নুমান বিন বশিরের পদচ্যুতি তাদের মনোবলকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তখন তারা ইয়াযিদের বিরুদ্ধে একটি জোট গঠনের প্রয়াস চালায়। এ লক্ষ্যে তারা হুসাইন রাযি.-কে বাইআতের জন্য কুফায় আমন্ত্রণ জানায়। তখন তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল—ইয়াযিদকে খলিফার মসনদ থেকে নামানো এবং তাকে খলিফা ঘোষণার মধ্য দিয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতালাভের যে নীতি নির্ধারিত হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করা।[৩০৮]

হুসাইন রাযি. কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার মনস্থ করেন। তবে তিনি এর পূর্বে কুফাবাসীদের মানসিকতা ও সেখানকার বাস্তবচিত্র সম্পর্কে জানতে আপন চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনে আকিলকে কুফায় প্রেরণ করেন।[৩০৯]

মুসলিম ইবনে আকিল ৬০ হিজরির শাওয়াল মোতাবেক ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে কুফায় পৌছলে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনায় বরণ করা হয়। এমনকি তার সামনে ১২ হাজার (অপর এক বর্ণনামতে ১৮ হাজার) লোক হুসাইন রাযি.-এর প্রতি তাদের নিষ্ঠা ও সমর্থন প্রকাশে শপথ করে। এ দৃশ্য দেখে তিনি কুফাবাসীদের প্রতি আশ্বস্ত হন এবং তাদের থেকে হুসাইন রাযি.-এর পক্ষে বাইআত গ্রহণ করেন। এরপর ত্বরিত গতিতে হুসাইন রাযি.-এর কাছে অবস্থার বিবরণ লিখে পত্র প্রেরণ করেন এবং পত্র হাতে পাওয়ামাত্রই তাকে কুফায় আগমনের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন।[৩১০]

ইতোমধ্যে উমাইয়া প্রশাসন কুফাবাসীদের আন্দোলনের বিষয়ে তৎপর হয়ে নুমান বিন বশিরকে পদচ্যুত করে এবং তার স্থলে কঠোর শাসক উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করে। সেই সঙ্গে তাকে বসরার দায়িত্বও প্রদান করে দায়িত্ব গ্রহণ করেই জিয়াদ কঠোরভাবে

---

৩০৮. *আল-আখবারুত তিওয়াল*, দিনাওয়ারি, পৃ. ১৭২; *আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা*, ইবনু কুতাইবা, খ. ২, পৃ. ৪।

৩০৯. *তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৩।

৩১০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৪৫; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৩, পৃ. ১৪৪; *আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা*, ইবনু কুতাইবা, খ. ২, পৃ. ৫।

বিদ্রোহ দমন করে। একই সঙ্গে মুসলিম ইবনে আকিল ও তার আপ্যায়নকারী হানি ইবনে উরওয়াকে হত্যা করে।[৩১১]

চাচাতো ভাইয়ের চিঠি হাতে পাওয়ামাত্র হুসাইন রাযি. গুটিকয়েক সফরসঙ্গী নিয়ে মক্কা থেকে কুফা অভিমুখে যাত্রা করেন। অনেক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তাকে কুফাবাসীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মক্কা ছেড়ে কুফায় না যেতে অনুরোধ করেন। কারণ, তখনো পর্যন্ত কুফায় উমাইয়া শাসন বলবৎ ছিল। তা ছাড়া সেখানকার অধিবাসীরা ছিল আদতে বিশ্বাসঘাতক, যার একাধিক নজির রয়েছে।[৩১২]

ইতোমধ্যে দামেশক থেকে উবায়দুল্লাহর কাছে নির্দেশনা আসে—হুসাইন রাযি. নিজে থেকে যুদ্ধ শুরু না করলে যেন তার সাথে যুদ্ধ করা না হয়।[৩১৩] হুসাইন রাযি.-এর কাফেলা কারবালার প্রান্তরে পৌঁছলে উমর বিন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস তার বাহিনী নিয়ে হুসাইন রাযি.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। ইতোমধ্যে কুফার গভর্নর উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে উমর বিন সাদের প্রতি কঠোর নির্দেশনা প্রদান করে। হুসাইন রাযি.-কে গভর্নরের নির্দেশনা জানানো হয় যে, তাকে ইয়াযিদের কাছে বাইআত হতে হবে। তখন হুসাইন রাযি. উমর বিন সাদের কাছে নিম্নে বর্ণিত তিনটি প্রস্তাবের যেকোনো একটি মঞ্জুরির আবেদন করেন :

- তিনি যেখান (মক্কা) থেকে আগমন করেছেন, তাকে সেখানে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক;
- অথবা তিনি সরাসরি ইয়াযিদের সঙ্গে চলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর ইয়াযিদ যা ভালো মনে করে, সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করবে;
- অথবা তাকে দূরের কোনো সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গিয়ে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ দেওয়া হোক।[৩১৪]

---

[৩১১]. *আল-আখবারুত তিওয়াল*, দিনাওয়ারি, পৃ. ১৭৬-১৮০।
[৩১২]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ৩৪৫; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৩, পৃ. ১৪৫-১৪৯।
[৩১৩]. *আল-আখবারুত তিওয়াল*, দিনাওয়ারি, পৃ. ১৮৩।
[৩১৪]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ৩৮৯।

কিন্তু গভর্নরের নির্দেশ ছিল—কোনো প্রকার শর্ত ছাড়া হুসাইন রাযি.-কে ইয়াযিদের আনুগত্যে বাধ্য করবে; কিংবা তার সাথে যুদ্ধ করবে। এ ছাড়া বিকল্প কোনো সুযোগ নেই।

৬১ হিজরির ১০ মহররম/৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঘটে সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা। এক অসম যুদ্ধের পর ৭২ জন সঙ্গী-সহ হুসাইন রাযি.-কে শহিদ করা হয়।[৩১৫] হুসাইন রাযি.-এর হত্যাকাণ্ডের কারণে ইয়াযিদ যদিও কিছুটা বিষণ্ন হয়; তবু তার একজন প্রভাবশালী হাশেমি প্রতিদ্বন্দ্বীর বিলুপ্তির কারণে সে স্বস্তিবোধ করে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে ইয়াযিদ তার গভর্নরকে কোনো প্রকার শাস্তি প্রদান করেনি।

মদিনাবাসীদের বিদ্রোহ : হাররার যুদ্ধ

কারবালার ট্রাজেডি হিজাজবাসীদের অন্তরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে, যারা শুরু থেকেই মুআবিয়া রাযি. কর্তৃক শাসননীতির পরিবর্তন এবং তৎপরবর্তী রাজনৈতিক বিবর্তনগুলোর ঘোরবিরোধী ছিলেন। ফলে তাদের ও উমাইয়া শাসনের মধ্যে যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত হতে শুরু করে। হিজাজের মজলিসগুলোতে ব্যাপকহারে এ আলোচনা হতে থাকে যে, 'ইয়াযিদ আল্লাহর দ্বীন থেকে বহুদূরে সরে গেছে, অতএব তাকে পদচ্যুত করা ওয়াজিব।' অবশেষে মদিনাবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

ইয়াযিদ প্রথমে ধীরে সুস্থে এ অবস্থার মোকাবেলা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও আপত্তি তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এমনকি একপর্যায়ে তার সম্পর্কে এমনসব আলোচনা হতে থাকে, যেগুলো তার ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্রকে কলুষিত করে। এ সবকিছুর কারণে হিজাজবাসীরা সামগ্রিকভাবে উমাইয়া শাসনের প্রতি রুষ্ট হয়ে ওঠে। অবশেষে ইয়াযিদের বাইআত ত্যাগ করে তারা আবদুল্লাহ ইবনে হানজালার হাতে বাইআত হওয়ার ঘোষণা করে। এ সকল সংবাদ ইয়াযিদের কাছে পৌঁছলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে মনস্থ করে। অতঃপর ইয়াযিদ মুসলিম ইবনে উকবা মুররির নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করে। উভয় পক্ষের মধ্যে (জিলহজ ৬৩ হিজরি মোতাবেক আগস্ট ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দে)

---

৩১৫. *আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা*, ইবনু কুতাইবা, খ. ২, পৃ. ১৮৪-১৮৫; *তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ৩৮৯-৩৯০, ৪০০।

এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা হাররার যুদ্ধ নামে পরিচিত এবং এর মাধ্যমে মদিনার বিদ্রোহ দমন করা হয়।[৩১৬], [৩১৭]

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর বিদ্রোহ

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর তৎপরতাকে মদিনাবাসীদের বিদ্রোহের একটি অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। মূলত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. কারবালার মর্মান্তিক ট্রাজেডি, মদিনাবাসীদের বিদ্রোহ, মুআবিয়া রাযি.-এর মৃত্যুর পর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অঙ্গনের নেতৃত্ব-শূন্যতা ও মুসলিমবিশ্বে ইয়াযিদের প্রতি তীব্র জনরোষ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে মোক্ষম সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং মক্কা থেকে উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের

---

[৩১৬]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ৪৭৯, ৪৮৭-৪৯১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবনু কাছির, খ. ৮, পৃ. ২১৫-২১৬।

[৩১৭]. সময়টা ৬৩ হিজরি। মুআবিয়া রাযি.-এর পর শাসনের মসনদে তখন ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়া। ইয়াযিদের হাতে বাইআতের ব্যাপারে শুরু থেকেই বিভিন্ন জায়গার মুসলিমদের দ্বিমত ছিল। এ সময় তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। একদিকে ইয়াযিদের হাতে যেন বাইআত না হতে হয়, এজন্য আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. মক্কায় চলে যান। অপরদিকে আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা রাযি.-সহ মদিনাবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল ইয়াযিদের সাক্ষাতে যান। ইয়াযিদ তাদেরকে বেশ সমাদর করে উপঢৌকন দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা ফিরে এসে মদিনাবাসীর সামনে ইয়াযিদের পাপাচার ও দোষত্রুটি তুলে ধরেন। সবাইকে ইয়াযিদের বাইআত ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। মদিনাবাসী তখন ইয়াযিদের বাইআত ত্যাগ করে।

এই সংবাদ জানতে পেরে ইয়াযিদ তার বিশ্বস্ত সেনাপতি মুসলিম ইবনে উকবাকে এক বিশাল সেনাবাহিনী দিয়ে মদিনায় পাঠায়। মুসলিমকে ইয়াযিদ নির্দেশনা দিয়ে পাঠায়—মদিনাবাসীকে তিনবার পুনরায় বাইআত গ্রহণের আহ্বান জানাবে। যদি তার আহ্বান ফিরিয়ে দেয়, তাহলে তিনদিন সেনাবাহিনীর জন্য মদিনাবাসীদের রক্তকে বৈধ করে দেবে। মদিনার লড়াই শেষ করে মক্কায় গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে গ্রেফতার করবে।

মদিনাবাসীদের সাথে মুসলিমের বাহিনীর লড়াই হয়। আনসারদের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা রাযি.। মদিনার চারদিকে খন্দক নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু বনু হারিস বিশ্বাসঘাতকতা করে খন্দকের সুড়ঙ্গপথ দিয়ে মুসলিমের বাহিনীর একটি দলকে মদিনায় ঢুকিয়ে নেয়। তাদের তাকবিরধ্বনি শুনে মদিনাবাসীদের মনোবল ভেঙে যায়। মুসলিম ইবনে উকবার বাহিনীর হাতে মদিনার পতন ঘটে। এরপর টানা তিন দিন মুসলিম ইবনে উকবার বাহিনী মদিনায় নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা রাযি., মাকিল ইবনে সিনান রাযি., মুহাম্মাদ ইবনে আবিল জাহম রাযি.-সহ বহু সাহাবি ও তাবেয়িকে হত্যা করা হয়।

যারা বেঁচে ছিল, তাদের কাছ থেকে এই মর্মে বাইআত নেওয়া হয়—মদিনাবাসীরা ইয়াযিদের দাসানুদাস। ইয়াযিদ যখন যেভাবে চাইবে, তাদের হত্যার হুকুম দিতে পারবে। তাদের জান-মাল ও পরিবারের ব্যাপারে যা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

এই তিন দিনকে বলা হয় 'ইয়াউমুল হাররা' বা হাররার দিন। মদিনার হত্যাযজ্ঞ শেষ করে মক্কায় যাওয়ার পথে মুসলিম ইবনে উকবার মৃত্যু হয়। [*ফাতহুল বারি*, ১৩/৮৪, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি। মাকতাবাতুস সফা, প্রথম সংস্করণ।]—নিরীক্ষক

পরিকল্পনা করেন। তিহামা ও হিজাজবাসীদের মধ্য হতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ ব্যতীত বাকি সকলে তার হাতে বাইআত করেন। এরপর তিনি মক্কা ও মদিনা থেকে ইয়াযিদ কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নরদের বিতাড়িত করেন।[৩১৮]

ইয়াযিদ প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তার সিদ্ধান্তের ওপর অটল থাকার কারণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন ইয়াযিদ তাকে দমন করতে মুসলিম বিন উকবা মুররির নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু এ সেনাপতি পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে হুসাইন ইবনে নুমাইর সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং মক্কায় আক্রমণ করে শহরটিকে অবরোধ করে রাখে। এদিকে অবরোধ চলাকালে ইয়াযিদের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে হুসাইন বিন নুমাইর মক্কা থেকে অবরোধ উঠিয়ে নেয় এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর সঙ্গে সমঝোতা করতে ব্যর্থ হয়ে দামেশকে ফিরে যায়।[৩১৯], [৩২০]

---

৩১৮. *আল-আখবারুত তিওয়াল*, দিনাওয়ারি, পৃ. ১৯৬।

৩১৯. *তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ৪৯৬-৪৯৭, ৫০২।

৩২০. এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। **এক.** আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. শুরু থেকেই ইয়াযিদের খেলাফতের বিরোধিতা করেছেন। তার বাইআত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। ইয়াযিদ যখন খলিফা হয়, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তখন মক্কায়। মক্কার গভর্নর তখন হারিস ইবনে খালিদ ইবনুল আস। ইবনে যুবায়েরের বাইআত নেওয়ার জন্য ইয়াযিদ লোক পাঠায়। উপঢৌকন হিসেবে সাথে পাঠায় রৌপ্যমুদ্রা ও রেশমের তৈরি পোশাক। ইবনে যুবায়ের সাফ জানিয়ে দেন, 'আল্লাহর কসম, আমি ইয়াযিদের হাতে বাইআত হব না; তার আনুগত্যও গ্রহণ করব না।' [*তারিখু খলিফা ইবনে খাইয়াত*, পৃষ্ঠা, ২৫২]

তবে, ইয়াযিদের জীবদ্দশায় তিনি নিজে থেকে খেলাফতও দাবি করেননি। ড. সুহাইল তাক্কুশ যে চিত্রায়ণ করেছেন, তা খেলাফতের ডাক দেওয়ার আগের। ইয়াযিদের আশঙ্কা ছিল, তার মতো ব্যক্তি বাইআত না হলে বিদ্রোহ তৈরি হতে পারে।

দুই. অদ্ভুতভাবে ড. সুহাইল তাক্কুশ এখানে ইবনে যুবাইর রাযি.-এর খেলাফতকালের ইতিহাস এড়িয়ে গেছেন। অথচ হাফেজ যাহাবি ও ইবনে হাজার-সহ বরেণ্য ঐতিহাসিক ও আলিমগণ তার খেলাফতকালকে শরয়ি খেলাফত বলেছেন। কিন্তু ড. তাক্কুশের বিবরণ দেখে ভ্রম হয়—আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (নাউযুবিল্লাহ) শরয়ি খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ছিলেন। পরবর্তী পৃষ্ঠার বিবরণগুলো দেখে ইবনে যুবায়ের রাযি.-কে মনে হবে ক্ষমতার লোভে দ্বন্দ্বে লিপ্ত একজন মানুষ। অথচ তিনি খেলাফতের আহ্বান জানান ইয়াযিদের মৃত্যুর পর। সামগ্রিকভাবেও খেলাফতের যোগ্য ও হকদার ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

ঐতিহাসিক খলিফা ইবনে খাইয়াত লেখেন, ইবনে যুবাইর রাযি. নিজের বাইআতের আহ্বান জানান ইয়াযিদের মৃত্যুর পর। ৬৪ হিজরির রজব মাসে তার নামে খেলাফতের বাইআত গ্রহণ করা হয়। ইয়াযিদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি নিজেও বাইআতের আহ্বান জানাননি;

এমনকি তার পক্ষ হয়েও কেউ আহ্বান জানায়নি। [*তারিখু খলিফা ইবনে খাইয়াত*, পৃষ্ঠা : ২৫৭-২৫৮, দার তাইবা]
ইবনে যুবাইরের এই খেলাফত শামের একাংশ বাদে সমগ্র মুসলিমরা মেনে নিয়েছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. লেখেন, ইবনে যুবাইর যখন খেলাফতের আহ্বান জানান এবং সে আহ্বানে মানুষজন বাইআত হয়, তখন মক্কা-মদিনা, ইরাক, মিশর ও আশেপাশের অঞ্চলগুলো তার আনুগত্য মেনে নেয়। যাহহাক ইবনে মুযাহিম রাযি. জর্ডান ব্যতীত সমগ্র শামে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.-এর পক্ষে বাইআত নেন। অপরদিকে মারওয়ানের আহ্বানে সাড়া দেয় ফিলিস্তিন ও হিমসবাসী। ইবনে হাজার এও লেখেন, ইবনে যুবাইরের একচ্ছত্র গ্রহণযোগ্যতা দেখে মারওয়ান একবার ভেবেছিলেন, তিনিও ইবনে যুবাইরের হাতে বাইআত হয়ে যাবেন। কিন্তু শামবাসীর একাংশ তার হাতে বাইআত হয় এবং তাকে খলিফা হতে উদ্বুদ্ধ করে। সে অনুযায়ী ইবনে যুবাইরের শাম প্রতিনিধি যাহহাক ইবনে মুযাহিম রাযি. ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে যাহহাক রাযি. শহিদ হলে মারওয়ান সমগ্র শাম অধিকারে নিয়ে নেন। এরপর মিশর অধীনস্ত করেন। এর কিছুদিন পর, খেলাফত দাবি করার মাত্র ছয় মাস পর মারওয়ান ইন্তেকাল করেন। উমাইয়া খেলাফতে পিতার উত্তরাধিকারী হয় আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান। [*ফাতহুল বারি*, ১৩/৮৪, ইবনে হাজার, মাকতাবাতুস সফা, প্রথম সংস্করণ]

ইবনে যুবাইর রাযি.-এর শাহাদাত

৬৪ হিজরি থেকে ৭২ হিজরি—এই দীর্ঘ সময়টিতে দূরদর্শী আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ধীরে ধীরে গুছিয়ে ওঠেন। ৭২ হিজরির আগ পর্যন্ত তিনি স্বীকৃত খলিফা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.-এর সাথে সরাসরি ঝামেলায় যাননি। চতুর্দিকের সম্ভাব্য শত্রুদের বশ করা ও বিভিন্ন অঞ্চলকে নিজের আয়ত্তাধীন করা—এদিকেই পুরো মাত্রায় মনোনিবেশ করেন। ৭১ হিজরি পর্যন্ত ইসলামি খেলাফতের স্বীকৃত খলিফা হিসেবে প্রতিবছর ইবনে যুবাইরের নেতৃত্বে হজ পালিত হতে থাকে। ঝামেলা শুরু হয় ৭২ হিজরি থেকে। চতুর্দিক নিষ্কণ্টক বুঝতে পেরে আবদুল মালিক এবার ইবনে যুবাইরের প্রতি মনোযোগী হন। যেকোনো মূল্যে নিজের মসনদকে একচ্ছত্র ও নিষ্কণ্টক করতে হবে। এর জন্য দায়িত্ব দেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফিকে।
৭২ হিজরিতে আবদুল মালিক হাজ্জাজকে মক্কায় পাঠান, ইবনে যুবাইর রাযি.-এর সাথে লড়াই করার জন্য। জিলকদ মাসে প্রথম লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। ইবনে যুবাইর রাযি. বাইতুল্লায় আশ্রয় নেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তখন কাবার দিকে তাক করে মিনজানিক স্থাপন করে। এখানে মূলত যুদ্ধ ছিল না। ছিল একপাক্ষিক শক্তি প্রদর্শন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শক্তিশালী বাহিনীর সামনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.-এর মোকাবেলা করার পরিস্থিতি ছিল না। হাজ্জাজ ভেবেছিল ইবনে যুবাইর রাযি. হারাম থেকে বেরিয়ে আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। এই অস্থিতিশীল পরিবেশের মধ্য দিয়েই ৭২ হিজরির হজ পালিত হয়। একদিকে হাজ্জাজ নেতৃত্ব দেয়, অপরদিকে ইবনে যুবাইর রাযি. নিজ অনুসারীদের নিয়ে হজ আদায় করেন।
হাজ্জাজ আবারও হামলা করে। এবার হাজ্জাজের মিনজানিকের আঘাতে কাবা ধসে যায়। পাথর নিক্ষেপের ফলে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করে। দীর্ঘদিন অবরোধ ও লড়াইয়ের পর ৭৩ হিজরির জুমাদাল উখরায় ইবনে যুবাইর রাযি. শাহাদাত বরণ করেন। [*তারিখু খলিফা ইবনে খাইয়াত*, পৃষ্ঠা : ২৬৮-২৬৯]—নিরীক্ষক

ইয়াযিদের শাসনামলে বৈদেশিক রাজনৈতিক ঘটনাবলি

ইয়াযিদের শাসনামলে আফ্রিকার অভিযান ছাড়া বৈদেশিক অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি। বরং শুধু আফ্রিকায় চোখে পড়ার মতো কিছু ত্বরিত বিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন উকবা ইবনে নাফেকে পুনরায় গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। তিনি সেই অঞ্চলে জিহাদ পরিচালনা করে তিয়ারেত (Tiaret)[৩২১] জয় করে তাঞ্জিয়ার (Tangier)[৩২২] পর্যন্ত পৌঁছে যান। অতঃপর তিনি কুসাইলার নেতৃত্বাধীন আমাজিগদের বিরুদ্ধে তাহুদার (Tahuda) যুদ্ধে (৬৪ হিজরির শেষ ভাগে/৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে)[৩২৩] শাহাদত বরণ করেন। উল্লেখ্য যে, কুসাইলা ইসলাম গ্রহণের পর উকবার কঠোর নীতির দোহাইয়ে আবার মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলে যায়।

ইয়াযিদের মৃত্যু

ইয়াযিদ ৬৪ হিজরির রবিউল মাসের ১৪ তারিখ মোতাবেক ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মৃত্যুবরণ করে।[৩২৪]

* * *

৩২১. **তিয়ারেত :** মরক্কোর শেষ প্রান্তে পাশাপাশি দুটি শহরের সামষ্টিক নাম। এ দুটি ও মাসিলার মধ্যবর্তী দূরত্ব ছয় মারাহালা (২৪ মাইল)। শহরটি তিলিমসান ও বনু হাম্মাদ দুর্গের মাঝামাঝি অবস্থিত।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ২, পৃ. ৭।

৩২২. **তানজিয়ার :** ভূমধ্যসাগরের তীরে আল-জাজিরাতুল খাজরা (Algeciras)-এর বিপরীতে স্পেনের অন্তর্গত একটি শহর।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ৪, পৃ. ৪৩।

৩২৩. *ফুতুহ মিসর ওয়া আফ্রিকিয়্যাহ*, ইবনু আবদিল হাকাম, পৃ. ২৬৭; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ২৩-৩০।

৩২৪. *তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ৪৯৯।

মুআবিয়া ইবনে ইয়াযিদ : দ্বিতীয় মুআবিয়া

(৬৪ হি./৬৮৪ খ্রি.)

ইয়াযিদের মৃত্যুর পর দুটি পৃথক বাইআত অনুষ্ঠিত হয়। একটি সিরিয়ায় মুআবিয়া ইবনে ইয়াযিদের কাছে, অপরটি হিজাজে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর কাছে।

দ্বিতীয় মুআবিয়া ছিলেন অল্পবয়সী, রুগ্ন ও খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে অনাগ্রহী। উমাইয়া শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সজ্জন ও ধার্মিক। তার ব্যাপারে ইতিহাসের উৎসগ্রন্থসমূহে অতি সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিমদের মধ্যকার বিশৃঙ্খলা দমনের সামর্থ্য না থাকায় তিনি বাইআত গ্রহণের কিছুদিন পরেই স্বেচ্ছায় খেলাফতের মসনদ থেকে সরে যান এবং শুরাব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন খলিফা নির্বাচনের পরামর্শ প্রদান করেন। এরপর তিনি নিজ ঘরে অন্তরিন হন। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাস পর তিনি অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন।[৩২৫]

---

[৩২৫]. প্রাগুক্ত : খ. ৫, পৃ. ৫০১।

সীমান্ত বাহিনী
সাজুর নদী
হাররান
রা'সুল আইন
আমেদ
মারসিন
আকরাদ পর্বত
খাবুর নদী
আরসুস
আলেপ্পো
তাল্লআবইয়াম
সুওয়াহদিয়া
রা'সুল বাসিত
কিন্নাসরিন
রাক্কা
মানাসেফ
লাতাকিয়া
নুমান
জাবিয়া পর্বত
ফোরাত নদী
জাবলাস
শিযার
বানিয়াস
হামাত
কাদমুস
দায়রেসুর
বিশারি পর্বত
তারতুস
হিমস বাহিনী
সাফিতা
হিমস
ফারকাস
তাদমুর
আরওয়াদ উপদ্বীপ
আরিদা
আইনুল বায়যা
ত্রিপোলি
কালামুন
কাসরুল হিয়ার আল-গারবি
বুতুন
আল-কারয়াতাইন
বৈরুত
যাইলা
আল-কুতাইফা
দামুর
দোমা
দামেশক
টায়ার
জাওলান
আক্কা
হায়ফা
হাওরান
কাইসারিয়া
ইরাবিদ
আজলুন
আর সুফ
নাবলুস
যারকা
লড
রামলা
ওমান
বেতেলহেম
খলিল পর্বত
সিরিয়া মরুভূমি
বিরে সিবা
কারাক
ফিলিস্তিন বাহিনী
সিরহান উপত্যকা
মুতা
আন-নাকব
কাতরানা
পেত্রা
ওয়াদি মুসা
মাআন
মিশর
আইলা
তাবিক পর্বত
সিনাই

উমাইয়া শাসনামলে
সিরিয়ার বাহিনীসমূহ

মারওয়ান ইবনুল হাকাম

(৬৪-৬৫ হি./৬৮৪-৬৮৫ খ্রি.)

মুসলিমবিশ্বের আনাচে-কানাচে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়লে উমাইয়া খেলাফত এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। তখন বনু উমাইয়ার নেতৃস্থানীয় লোকজন দামেশকের অন্তর্গত 'জাবিয়া' নামক এলাকায় মুসলিমবিশ্বের বিভাজনকে সামনে রেখে তাদের ভঙ্গুর খেলাফত রক্ষায় সমবেত হয়। মূলত তখন তারা প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রসমূহের জিঘাংসার শিকার ছিল। সভায় সকলের ঐকমত্যে মারওয়ান ইবনুল হাকামকে খলিফা নির্বাচিত করা হয়। এর মাধ্যমে রাজত্ব বনু উমাইয়ার সুফিয়ানি ধারা থেকে মারওয়ানি ধারায় স্থানান্তরিত হয়। দামেশকে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর হুকুমত ছুটে যাওয়ায় দাহ্হাক বিন কায়েস ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং হৃত হুকুমত পুনরুদ্ধারে কায়েস বংশীয়রা তার নেতৃত্বে সমবেত হন।

এদিকে ইয়েমেনিরাও উমাইয়াদের সঙ্গে জোট করে তাদের মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হয়। অতঃপর 'মার্জ রাহেত' নামক এলাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে (৬৪ হিজরির জিলকদ মোতাবেক ৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে) যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মারওয়ান ও তার সহযোগী ইয়েমেনবাসীরা কায়েস বংশীয়দের সহজেই পরাস্ত করে। যুদ্ধে দাহ্হাক ও তার বহু অনুসারী নিহত হয়। এর ফলে সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসরে মারওয়ানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। এরপর মারওয়ান দুটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। তন্মধ্যে একটি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর বিরুদ্ধে হিজাজে প্রেরণ করে। এ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন হুবাইশ ইবনে ওয়ালাজাহ। অপরটি উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের নেতৃত্বে জাজিরার দিকে প্রেরণ করে। উল্লেখ্য যে, হিজাজের বাহিনীটি মদিনায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। এদিকে মারওয়ানের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ তার অভিযান স্থগিত করে।[৩২৬]

---

৩২৬. *তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ৫৩৫; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৩, পৃ. ২৭৩-২৭৪।

।

আবদুল মালিক বিন মারওয়ান

(৬৫-৮৬ হি./৬৮৫-৭০৫ খ্রি.)

আবদুল মালিকের খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ

মারওয়ান তার মৃত্যুর পূর্বে নিজ পুত্রদ্বয় আবদুল মালিক ও তারপরে আবদুল আজিজকে খলিফা ঘোষণা করে। আবদুল মালিক ৬৫ হিজরির রমজান মোতাবেক ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইসলামি বিশ্বের বিভক্তিকালীন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি উমাইয়া খেলাফতের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও মুসলিমদের মধ্যকার ঐক্য পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করেন।[৩২৭]

আবদুল মালিকের যুগে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি

তাওয়াবিনদের যুদ্ধ

আবদুল মালিকের শাসনামলের শুরুতে চারটি ইসলামি দল শাসনক্ষমতা লাভের জন্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। দলগুলো হলো : ১. উমাইয়া বংশ—যারা মিসর ও সিরিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করে। ২. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. ও তার অনুসারীরা—যারা হিজাজ ও ইরাকে আধিপত্য বিস্তার করে। ৩. আলাভি বা আলিভক্তদের দল—যারা ইরাকে সক্রিয় ছিল। ৪. খারেজি সম্প্রদায়।

অতএব, খলিফার জন্য একই সঙ্গে এতগুলো শক্তির মোকাবেলা করা সহজ কোনো বিষয় ছিল না।

আলাভিরা ইসলামি বিশ্বের ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে এবং হুসাইন রাযি.-এর হত্যার প্রতিশোধ নিতে তারা জাজিরা অভিমুখী উমাইয়া সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

---

৩২৭. *তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ৬১০।

করে। তারা উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদকে উক্ত হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করে। তারা এ কথাও স্বীকার করে যে, হুসাইন রাযি.-এর সহযোগিতায় তারা অবহেলা করেছে। সুলাইমান বিন সুরাদ খুজায়ি এ দলের নেতৃত্ব প্রদান করে। এ দলটি তাওয়াবিন (অনুতপ্ত) বাহিনী নামে পরিচিত।

সিফ্ফিনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে জাজিরার অন্তর্গত আইনুল ওয়ারদাহ নামক স্থানে উভয় দলের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে তাওয়াবিন বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এরপর উবায়দুল্লাহ তার বাহিনীকে ইরাক অভিমুখে প্রেরণ করে।[৩২৮]

মুখতার বিন আবু উবাইদ সাকাফির যুদ্ধ

এ দলটির বৈশিষ্ট্য হলো, এরা ছিল উমাইয়া শাসনের বিরোধিতাকারী এবং আলাভি বা আলিভক্ত। তা ছাড়া তাদের দলপতি মুখতার ক্ষমতার দখলেরও স্বপ্ন দেখত। বাহ্যত হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ নিতে মুখতার সকল আলিভক্তকে একত্র করে সেনাবাহিনী গঠন করে। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. কর্তৃক নিযুক্ত কুফার গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে মুতির বাহিনীকে পরাজিত করে কুফায় প্রবেশ করে।[৩২৯]

কুফায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর মুখতার বাহিনী ত্রিমুখী বিপদের সম্মুখীন হয়। একে তো কুফার অভ্যন্তরে আলাভি দলভুক্ত নয় এমন লোকেরা তাদের বিরোধিতা করে। উপরন্তু বাহির থেকে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর বাহিনী ও ইরাকের দিকে ধাবমান উমাইয়া বাহিনীর আক্রমণের ঝুঁকি তো ছিলই। এতৎসত্ত্বেও তারা (১০ মহররম ৬৭ হিজরি মোতাবেক ৬ আগস্ট ৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) উমাইয়া বাহিনীকে খাজির[৩৩০] নদীর তীরে পরাজিত করে তাদের সেনাপতি উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ ও হুসাইন ইবনে নুমাইরকে হত্যা করে। তবে তার বাহিনী মুসআব ইবনে যুবায়েরের—আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নরের সামনে ব্যর্থ হয়। তিনি ৬৭ হিজরির মাঝামাঝি ও ৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে ওয়াসিত ও বসরার মধ্যবর্তী মাজার

---

৩২৮. *তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ৫৯৬-৬০৫।

৩২৯. *আল-আখবারুত তিওয়াল*, দিনাওয়ারি, পৃ. ২৯২।

৩৩০. **খাজির :** ইরবিল ও মসুল এবং উঁচু জাব ও মসুলের মধ্যবর্তী একটি নদী।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ২, পৃ. ৩৩৭।

যুদ্ধে তাদের পরাজিত করেন। কুফায় মুখতার নিহত হয় এবং মুসআব কুফায় আধিপত্য বিস্তার করেন।[৩৩১]

যুবায়ের পুত্রদ্বয়ের যুদ্ধ

মুখতারের পরাজয়ের কারণে ইসলামি বিশ্বের নেতৃত্বের লড়াই আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। উমাইয়া খলিফা তখন অনুধাবন করেন, তার প্রতিপক্ষের মূল শক্তি এখন ইরাক। এ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে অচিরেই যুবাইরি শাসনের পতন হবে। কেননা, হিজাজের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ইতোমধ্যে অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই তিনি বিশাল বাহিনী নিয়ে ইরাক অভিমুখে যাত্রা করেন। সংবাদ পেয়ে মুসআব ইবনে যুবায়ের তাদের মোকাবেলার জন্য কুফার উত্তর প্রান্তে রওনা করেন। অবশেষে দুজাইল নদীর তীরে মাসকিন জেলার অন্তর্গত দায়ের আল-জাসালিক নামক স্থানে (৭২ হিজরির জুমাদাল উখরা মোতাবেক ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে) উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে উমাইয়া বাহিনী বিজয় লাভ করে এবং মুসআব ইবনে যুবায়ের নিহত হন। সেই সঙ্গে কুফায় আবদুল মালিকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়।[৩৩২]

বিজয়ী খলিফা কুফার বিজয়ের ফল ভোগের সুযোগ নষ্ট না করে ত্বরিত হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফির নেতৃত্বে একটি বাহিনী হিজাজে প্রেরণ করেন। এ বাহিনী (৭৩ হিজরির জুমাদাল উলা মোতাবেক ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) দীর্ঘদিন মক্কা অবরোধের পর আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-কে হত্যা করে।[৩৩৩] এর মাধ্যমে জুবায়রি খেলাফতের অবসান হয় এবং হিজাজ ভূমি আবদুল মালিকের করতলগত হয়। সেই সঙ্গে ইসলামি বিশ্ব আবার একক নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়।

খারেজিদের দমন

আবদুল মালিকের শাসনামলের শুরু হতে অদ্যাবধি খারেজিরাই রক্তাক্ত সংঘাতের বাইরে ছিল। এরাও উমাইয়া খেলাফতের বিরোধী ছিল।

---

৩৩১. *আল-আখবারুত তিওয়াল*, দিনাওয়ারি, পৃ. ৩০৮; *তারিখে তাবারি*, খ. ৬, পৃ. ১০৫-১০৭।

৩৩২. *আল-আখবারুত তিওয়াল*, দিনাওয়ারি, পৃ. ৩১১; *মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*, আল-মাসউদি, খ. ৩, পৃ. ১০৯।

৩৩৩. *তারিখে তাবারি*, খ. ৬, পৃ. ১৮৭-১৮৮।

মুসলিমবিশ্বের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ইরাকে হাজ্জাজের কঠোর-নীতি তাদের কেন্দ্রীয় শাসনকে চ্যালেঞ্জ করতে বিশেষভাবে সাহস জোগায়। এরা উমাইয়া শাসনের জন্য হুমকিস্বরূপ—আবদুল মালিক এ কথা বুঝতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মনোনিবেশ করেন। অতঃপর ইরাক ও ইয়ামামার ভয়াবহ সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে খলিফা তাদের পদানত করতে সমর্থ হন।[৩৩৪]

ইবনুল আশআসের বিদ্রোহ

আবদুর রহমান ইবনুল আশআসের ফিতনাকে উমাইয়া শাসনের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফিতনা হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ, তার বিদ্রোহ উমাইয়া শাসনের ভিত নাড়িয়ে তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এ দলের উৎপত্তি কোনো মতাদর্শের ভিত্তিতে ছিল না, খারেজিদের যেমনটি ছিল। বরং ইরাকবাসীদের প্রতি হাজ্জাজের সংকীর্ণ নীতি এ বিদ্রোহের মূল কারণ। তা ছাড়া বিদ্রোহীদের মনে উমাইয়া শাসনের প্রতি যে ক্ষোভ জমা ছিল, ইবনুল আশআস তা থেকেও সুবিধা ভোগ করে। মূল ঘটনাটি হলো, হাজ্জাজ ইরাকবাসীদের দ্বারা একটি সেনাবাহিনী গঠন করে ইবনুল আশআসের নেতৃত্বে পূর্ব দিকে সিজিস্তানে প্রেরণ করেন এবং তাকে কাবুলের শাসক রাতবিলকে পরাস্ত করতে আদেশ করেন। ইবনুল আশআস তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং রাতবিলের দুর্গসমূহের ওপর হামলা করেন। তবে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল ও প্রতিকূল ভূ-প্রাকৃতিক কারণে তাদের পরাস্ত করা সম্ভব হয়নি। তখন ইবনুল আশআস তার সৈন্যদেরকে নিয়ে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আগামী এক বছরের জন্য তারা সামরিক অভিযান মুলতবি করবেন, যেন এ সময়ের মধ্যে সৈন্যরা নতুন অঞ্চলের সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারে। এ মর্মে তিনি হাজ্জাজের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু হাজ্জাজ তার কঠোর নীতির কারণে সেনাপতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং নতুন করে তুর্কি সৈন্যদের পেছনে ধাওয়া করার নির্দেশ প্রদান করেন। এমনকি এ আদেশ পালন না করলে তাকে পদচ্যুত করারও হুমকি দেন। এ সবকিছুর কারণে ইবনুল আশআস অপমান বোধ করেন। তখন তিনি সৈন্যদের জমা করে হাজ্জাজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। সৈন্যরা তাদের দীর্ঘদিন যাবৎ ইরাক ভূমি থেকে দূরে রাখা এবং ফিরে আসার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়ার কারণে চরম ক্ষিপ্ত হয়। পরিশেষে হাজ্জাজকে পদচ্যুত করার

---

[৩৩৪]. *আল-কামেল ফিল লুগাতি ওয়াল আদব*, মুবাররাদ নাহভি, খ. ২, পৃ. ২৯৮-৩০১, ৩০২-৩০৬; *তারিখে তাবারি*, খ. ৬, পৃ. ২১১-২২৩, ২৭৯-২৮১, ৩০৪, ৩০৮-৩০৯।

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সকলে ইবনুল আশআসের হাতে বাইআত গ্রহণ করে। এরপর তারা ইরাকের দিকে অগ্রসর হয়।

এদিকে হাজ্জাজ তাদের মোকাবেলায় একাধিক বাহিনী প্রেরণ করেন। ৮২ হিজরির ১৪ জুমাদাল উখরা (৭০১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে) কুফার উপকণ্ঠে 'দায়রুল জামাজিম' নামক এলাকায় যুদ্ধ সংঘটিত হলে হাজ্জাজ বাহিনী তাদের পরাজিত করে। ইবনুল আশআস পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী সিজিস্তানে পালিয়ে রাতবিলের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু হাজ্জাজ সেখানেও তাকে নিস্তার দেননি। বরং তাকে ফেরত দিতে রাতবিলকে বাধ্য করেন। ইবনুল আশআস এ কথা জানতে পেরে আত্মহত্যা করেন এবং এরই মাধ্যমে তার আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।[৩৩৫]

আবদুল মালিকের পররাষ্ট্রনীতি

মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের অর্ধেক অংশে অবিরাম বিশৃঙ্খলার কারণে সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়ানোর কোনো সুযোগ ছিল না। সাম্রাজ্যে স্থিতিশীলতা ফিরে আসলে পূর্ব দিকে মুসলিমরা মাওয়ারা-উন-নাহরের অঞ্চলগুলো : যেমন কিশ্‌শ, খুত্তাল, রেখ্‌শ জয় করে।[৩৩৬] আর পশ্চিম দিকে মুসলিম ও বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনীর মধ্যে হামলা পালটা হামলা অব্যাহত থাকে। অবশেষে সেই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে আবদুল মালিক রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে বাইজেন্টাইন সম্রাটের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্ত ছিল—মুসলিম খলিফা বাইজেন্টাইন সম্রাটকে বার্ষিক ৩ লাখ ৬৫ হাজার স্বর্ণমুদ্রা, ৩৬০টি ক্রীতদাস ও ৩৬০টি উন্নতমানের ঘোড়া প্রদান করবেন। বিনিময়ে বাইজেন্টাইনরা মুসলিমদের ভূখণ্ডে তাদের হামলা স্থগিত করবে এবং সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে বাইজেন্টাইন সামরিক বাহিনীকে—যারা মারাদ্দাহ নামে পরিচিত ছিল—প্রত্যাহার করবে। এ সন্ধি ১০ বছর বলবৎ থাকবে।[৩৩৭]

---

[৩৩৫]. প্রাগুক্ত : খ. ৬, পৃ. ৩৩৬, ৩৩৯-৩৪০, ৩৪২, ৩৪৬-৩৫৫, ৩৫৮-৩৮৮।

[৩৩৬]. *তারিখু খলিফা ইবনি খায়্যাত*, খ. ১, পৃ. ২৭৫; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৩, পৃ. ৪৮১-৪৮২।

[৩৩৭]. Chronique : Michel Le Syrien. 11 pp 469-470.

মারাদ্দাহ : মারাদ্দাহ হলো খ্রিষ্টানদের কিছু উপজাতি—যারা আমানুস পর্বতমালায় বসবাস করত। তারা একটি সামরিক বাহিনী গঠন করে, যাদের দ্বারা বাইজেন্টাইন প্রশাসন অত্র অঞ্চলে প্রাচীর নির্মাণ করে। বালাযুরি তাদের শহর জারজুমাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করে তাদের জারাজিমাহ নাম দিয়েছেন। দ্র. *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ. ২১৭-২২৩।

মারাদ্দাহ বাহিনীর প্রত্যাহারের সুযোগে সেই অঞ্চলের সিসাঢালা প্রাচীরটি ধ্বংস হয়ে যায়—যা এশিয়া মাইনরকে মুসলিমদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করত। এরপর শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন আক্রমণ শুরু হয়। তখন মুসলিমরা কায়সারিয়্যা জয় করে এবং আর্মেনিয়ায় বিজয়াভিযান পরিচালনা করে। এ ছাড়াও ফোরাত নদীর অববাহিকায় মালাতিয়্যাহ ও কালিকালায় অভিযান চালায়, যখন বাইজেন্টাইনরা শুধু মারআশ (Marash)-এ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।[৩৩৮]

এদিকে উত্তর আফ্রিকায় মুসলিমরা কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করে উত্তর উপকূলের বাইজেন্টাইন ঘাঁটিগুলোকে ধ্বংস করে এবং আমাজিগদের সঙ্গে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। এ সময় আমাজিগরা গামেদি নারী কাহিনার[৩৩৯] নেতৃত্বে সেই অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হাসসান বিন নুমান গাসসানি তাদের বিদ্রোহ দমন করে কাহিনাকে হত্যা করেন।

আবদুল মালিকের প্রশাসননীতি

আবদুল মালিক বিন মারওয়ান রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। এই ধারাবাহিকতায় তিনি গোত্র ও সমাজের গণ্ডি ছাড়িয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংস্কার সাধন করেন। তবে আবদুল মালিক প্রশাসনের দুটি ক্ষেত্রে সংস্কারকাজের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন :

এক. তিনি প্রশাসনিক কাঠামোকে উন্নত ও আধুনিকায়ন করেন। ফলে তার শাসনামলে ইসলামি রাষ্ট্র এমন রূপ পরিগ্রহ করে যা সমকালীন অন্যান্য আধুনিক রাষ্ট্রের চেয়ে খুব একটা পিছিয়ে ছিল না। তিনি প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শাসনব্যবস্থাকে পাঁচটি প্রধান দপ্তরে বিভক্ত করেন। ১. রাজস্ব (খারাজ) বিভাগ; ২. সেনা বিভাগ; ৩. রাষ্ট্রীয় ডাক বিভাগ (দিওয়ানুর রাসাইল) ; ৪. সিল-মোহর (রেজিস্ট্রি) বিভাগ; ৫. সাধারণ ডাক বিভাগ (দিওয়ানুল বারিদ)।

---

[৩৩৮]. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৩, পৃ. ৫০০; Theophanes: Chronographia p 802।

[৩৩৯]. *ফুতুহু মিসর ওয়াল মাগরিব*, পৃ. ২৬৯-২৭১; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ৩৫।

ইংল্যান্ড
আটলান্টিক মহাসাগর
লোয়ার নদী
নওরোজ
তুলুজ
টিমস
সাইরাকাশ
টলেডো
সেভিয়া
জিব্রালটার প্রণালি
তানজিয়ার
সিউটা
ফেস
টাজা
ভেনিস
এড্রিয়াটিক সাগর
রোম
তাবারজা যুদ্ধ
যাজক দেহিয়ার পরাজয়
৭০২ হিজরি
কার্থেজের ধ্বংসযজ্ঞ
৬৯৮ খ্রি.
কার্টেজিনা
সিসিলি
তিউনিসিয়া
তিসা যুদ্ধ
আরবদের পরাজয়
৬৯৮ খ্রি.
কাইরুয়ান
সুসা
কায়রোওয়ান প্রতিষ্ঠা
৬৭০
আফ্রিকা
সাবতালআ যুদ্ধ
৬৪৭ খ্রি.
দানিয়ুব নদী
বাইজেন্টাইন
কনস্টান্টিনোপল
গ্রিস
জারাগোজা
ক্রিট
রোডস
ভূমধ্যসাগর
হাসান ইবনে
নুমানের ঘাঁটি
কৃষ্ণসাগর
রোম সাম্রাজ্য
আঙ্কারা
সাইপ্রাস
সিডন
টায়ার
আলেপ্পো
লেবানন
দামেশক
সিরিয়া
ফুস্তাত
নীল নদ
লোহিত সাগর
ভোলগা নদী
কাস্পিয়ান সাগর
ককেশাস
তিবিলিসি
আরদাবিল
মসুল
দজলা
ফুরাত
কুফা
আবদুল মালিকের আমলে
আফ্রিকার বিজয়সমূহ
৭৬-৮৬ হি./৬৯৫-৭০৫ খ্রি.

দুই. তিনি প্রশাসনিক নথিপত্র ও দলিলদস্তাবেজের ভাষা আরবিকরণ করেন, যা 'হারাকাতুত তারিব' নামে পরিচিত।[৩৪০]

আবদুল মালিকের মৃত্যু

আবদুল মালিক ৮৬ হিজরির শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে (৭০৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) মৃত্যুবরণ করেন।[৩৪১]

* * *

[৩৪০]. *শুজুরুল উকুদ ফি যিকরিন নুকুদ*, তাকিয়ুদ্দিন আহমদ আল-মাকরিযি, খ. ৬, পৃ. ২৭৩।

[৩৪১]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৬, পৃ. ৪১৮-৪১৯।

I

ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক

(৮৬-৯৬ হি./৭০৫-৭১৫ খ্রি.)

ওয়ালিদের অভ্যন্তরীণ সংস্কার

ওয়ালিদ তার পিতা আবদুল মালিকের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৩৪২] তার শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং ব্যাপক উন্নয়ন ও সংস্কার সাধন হয়। এ কারণে তার শাসনকালকে বিজয় ও সমৃদ্ধির যুগ বলে অভিহিত করা হয়। ওয়ালিদ ছিলেন একজন সংস্কারধর্মী মানুষ। তিনি সড়ক নির্মাণ, পুরোনো রাস্তাঘাট সংস্কার ও কূপ খননের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এ ছাড়াও মসজিদে নববি ও উমাইয়া জামে মসজিদের পরিধি বিস্তৃত করেন, দামেশক নগরীর সৌন্দর্যবর্ধন করেন এবং সেখানকার প্রতিটি বড় বাড়িতে বারাদা (Barada) নদী থেকে নালার মাধ্যমে পানি পৌছানোর ব্যবস্থা করেন।

মাওয়ারা-উন-নাহরের দেশগুলো বিজয়

খোরাসানে ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমানার সঙ্গে মাওয়ারা-উন-নাহরের দেশগুলো লাগোয়া ছিল। এ সকল দেশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে সেগুলোর রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল ছিল। আর তা-ই মুসলিমদের তাদের দেশে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। তখন মুসলিম সেনাপতি ও খোরাসানের শাসক কুতাইবা ইবনে মুসলিম বাহেলি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন। তিনি তাখারিস্তান পুনর্বিজয় করেন, বোখারায় অভিযান পরিচালনা করেন এবং সন্ধির মাধ্যমে বিকান্দ জয় করেন। এ ছাড়াও সমরকন্দ, খাওয়ারিজমের শহরসমূহ, শাশ, ফারগানা ও চীনের সবচেয়ে নিকটবর্তী শহর কাশগড় জয় করেন।[৩৪৩]

---

[৩৪২]. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ২০৪; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৯, পৃ. ৭০।

[৩৪৩]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৬, পৃ. ৪৩০-৪৩৩, ৪৪৫, ৪৬৯।

সিন্ধু বিজয়

সিন্ধু মূলত ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পারস্যের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। এ অঞ্চল বিজয়ের ঘটনাবলি মাওয়ারা-উন-নাহরের দেশগুলো বিজয়ের ঘটনাবলির সদৃশ। হাজ্জাজ তার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে সিন্ধু বিজয়ের নির্দেশ প্রদান করেন। তখন মুহাম্মাদ বিন কাসিম মাকরান হয়ে ভারত সাগরের তীরে দেবল[৩৪৪] পৌঁছে তা জয় করেন।[৩৪৫]

---

৩৪৪. **দেবল বিজয়ের বিবরণ**

মুহাম্মাদ বিন কাসিম যেদিন দেবল পৌঁছলেন সেদিন ছিল শুক্রবার। চূড়ান্ত আক্রমণ হানতে হবে দেবলে। জনবল, অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদভরতি জাহাজগুলো ঘাটে নোঙর করল। মুহাম্মাদ বিন কাসিম চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য কৌশলী যুদ্ধপন্থা অবলম্বন করলেন। যে যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করেছিলেন আরেক মুহাম্মাদ, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইয়াওমুল আহযাবে।

দেবলে অবস্থানস্থলের চারপাশে মুহাম্মাদ বিন কাসিম খন্দক খনন করলেন। খন্দক ভরে দিলেন বর্শা দিয়ে। বিভিন্ন দিকে পতাকা ছড়িয়ে দিয়ে সবাইকে পতাকাতলে সমবেত করে দিলেন। ৫০০ লোকে টানা ক্ষেপণাস্ত্র মিনজানিক স্থাপন করলেন। মিনজানিকটির নাম আরুসবর। মুহাম্মাদ বিন কাসিম কতটা কৌশলী সমরবিদ ছিলেন, দেবল অভিযান তার বড় প্রমাণ।

দেবলে একটি বড় বৌদ্ধ মূর্তি ছিল। দেবলের উপাস্য। মূর্তিটি ছিল বড় একটি মিনারের ওপর। তার ওপর পরিত্যক্ত জাহাজের একটি লম্বা মাস্তুল। মাস্তুলের মাথায় বাঁধা ছিল একটি লাল পতাকা। বাতাস বইলে শহরকে কেন্দ্র করে পতপত করে উড়তে থাকত লাল পতাকাটি।

প্রতি তিন দিন অন্তর অন্তর মুহাম্মাদ বিন কাসিম হাজ্জাজকে পত্র মারফত অগ্রগতির খবর জানাচ্ছিলেন। দেবলে অবস্থান করে বিস্তারিত বিবরণ-সহ প্রস্তুতির খবর হাজ্জাজকে জানান। ফিরতি পত্রে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নির্দেশ দিলেন, মূর্তিটিকে উদ্দেশ্য করে মিনজানিক থেকে পাথর নিক্ষেপ করো। ফলাফল পাবে। বেশ কিছুদিন অবরোধের পর একদিন মিনজানিক থেকে পাথর ছোড়েন মূর্তিটিকে লক্ষ্য করে। মিনজানিকের আঘাতে পতাকাসমেত মাস্তুলটি ভেঙে পড়ে। বৌদ্ধ মূর্তির সাথে সাথে শহরবাসীর মনোবলও ভেঙে পড়ে।

শহরপ্রাচীরে থাকা বৌদ্ধ মূর্তির ওপর মিনজানিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়। মুহাম্মাদ বিন কাসিম শহরে আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করেন। রাজা দাহির পালিয়ে যায়। মুহাম্মাদ বিন কাসিম তিন দিন সেখানে অবস্থান করে দাহিরের লোকদের হত্যা করেন। হত্যা করেন উপাসনালয়ের রক্ষীদের। তারপর মুসলমানদের জন্য সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে মুহাম্মাদ বিন কাসিম বেরুনের দিকে রওনা হন। [*ফুতুহুল বুলদান*, পৃ ৬১৩-৬১৪, বালাযুরি] পথিমধ্যে হাজ্জাজের পত্র আসে—'যতটুকু অঞ্চল বিজয় করেছ, তার সবটার আমির তুমি।' হিজরি ক্যালেন্ডারে সময়টা তখন ৯৩ হিজরি। [*তারিখু খলিফা ইবনে খাইয়াত*, পৃ ৩০৪]

মুহাম্মাদ বিন কাসিম সিন্ধু অঞ্চলে যতগুলো যুদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ধরা হয় রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধটিকে। কারণ, দাহির ছিল সিন্ধের প্রতাপশালী রাজা। দাহিরকে হত্যার মাধ্যমে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমত, মুসলমানদের দুর্বল মনে করা হয়েছিল, তার যথোচিত জবাব দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, হিন্দু রাজাদের সাহসিকতায় চিড় ধরে। যার ফলে মুহাম্মাদ বিন কাসিম পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু শহর যুদ্ধ ছাড়া কেবল সন্ধির মাধ্যমে বিজয় করেছেন। হিন্দু রাজারা বুঝতে পেরেছিল, জানবাজ মুসলিম মুজাহিদদের

তখন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাসিন্দারা ছুটে এসে মুসলিমদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করে।[৩৪৬] এরপর মুহাম্মাদ বিন কাসিম বেরুন পৌঁছলে সেখানকার অধিবাসীরাও সন্ধি করে। অনুরূপভাবে তিনি নিরুন, সেহওয়ান ও সিসাম অধিকার করেন। এ শহরগুলো মূলত সিন্ধুনদের পূর্ব তীরে অবস্থিত।[৩৪৭]

বাইজেন্টাইনের অভিযান

ওয়ালিদ মূলত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে চাপে রাখার নীতি অনুসরণ করেন। তার শাসনামলে খলিফার ভাই উমাইয়া সেনাপতি মাসলামা ইবনে আবদুল মালিক অত্র অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি কনস্টান্টিনোপলের পথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি জয় করতে সক্ষম হন। যেমন : তাওয়ানা (Tyana), হিরাকলা (Hergla), আমুরিয়্যা (Amorium), ডরিলিয়াম (Dorylium) ইত্যাদি। এদিকে বাইজেন্টাইনরা মুসলিম সৈন্যদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে চেষ্টা করে এবং সেই লক্ষ্যে এশিয়া মাইনরে সামরিক শক্তি বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

উত্তর আফ্রিকার অভিযান

ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের যুগে সেনাপতি মুসা ইবনে নুসাইরের নেতৃত্বে তিনি এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে। আফ্রিকা ও

সামনে তাদের টিকে থাকা সম্ভব নয়। এ যুদ্ধের পর মুহাম্মাদ বিন কাসিম প্রায় সম্পূর্ণ সিন্ধু অঞ্চল বিজয় করেন।

দেবল যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন মুহাম্মাদ বিন কাসিমের বাহিনীতে থাকা যোদ্ধা কাহমাস বিন হাসান। কাহমাস বলেন, 'আমি মুহাম্মাদ বিন কাসিমের বাহিনীতে ছিলাম। রাজা দাহির এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে আমাদের মুখোমুখি হয়। তার সাথে ছিল ২৭টি হাতি। আমরা তাদের পেরিয়ে শহরে ঢুকে পড়ি। আল্লাহ তাআলা তাদের পরাজিত করে দেন। দাহির তখন পালিয়ে যায়। কয়েকজন মুসলমান সেনা শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে হত্যা করেন। তারপর মুসলিম শিবিরে ফিরে আসেন। পরবর্তী সময়ে অন্য এক শহর থেকে ফেরার সময় রাতের বেলা রাজা দাহির বিশাল বাহিনী নিয়ে উন্মুক্ত তরবারি হাতে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে রাজা দাহির এবং তার সঙ্গীরা নিহত হয়। বাহিনীর অন্য সৈন্যরাও পরাজয় বরণ করে।

মুহাম্মাদ বিন কাসিম তাদের ধাওয়া করে ব্রহ্মা শহর পর্যন্ত চলে আসেন। ব্রহ্মা শহরের লোকেরা শহর থেকে বেরিয়ে এসে লড়াই করে। কিন্তু মুসলমানদের আক্রমণের তীব্রতার সামনে টিকতে না পেরে তারা পুনরায় শহরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তারপর মুহাম্মাদ বিন কাসিম শহর অবরোধ করেন এবং শহরের পতন ঘটে। বিন কাসিম সেখান থেকে যান কিরজে। কিরজও জয় করেন।' [*তারিখু খলিফা ইবনে খাইয়াত*, পৃ ৩০৪-৩০৫]—নিরীক্ষক

[৩৪৫]. *ফুতুহুল বুলদান*, বালাযুরি, পৃ. ৪২৪-৪২৫।

[৩৪৬]. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ২১২।

[৩৪৭]. *ফুতুহুল বুলদান*, বালাযুরি, পৃ. ৪২৪-৪২৭।

আলজেরিয়ায় পূর্বসূরিদের কীর্তিগাথা অটুট রাখতে কাজ করেছেন। এরপর তিনি মরক্কোর ভেতরে সোস (Sous)-এর দিকে অগ্রসর হন। তিনি আমাজিগদের পুনরায় ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম হন। অতঃপর ইসলামের অন্য সকল যোদ্ধাদের মতো তারাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। খলিফা স্পেন বিজয়ে তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করেন।

ওয়ালিদের মৃত্যু

ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক ৯৬ হিজরির জুমাদাল উখরা মোতাবেক ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দিয়ারে মারওয়ানে (মারওয়ানের ইবাদতখানায়) মৃত্যুবরণ করেন।[৩৪৮]

* * *

৩৪৮. *তারিখে তাবারি*, খ. ৬, পৃ. ৪৯৫-৪৯৬।

|

সুলাইমান বিন আবদুল মালিক

(৯৬-৯৯হি./৭১৫-৭১৭ খ্রি.)

সুলাইমানের স্বরাষ্ট্রনীতি

সুলাইমান তার সহোদর ওয়ালিদের পর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক, বিশুদ্ধভাষী, ন্যায়পরায়ণ কিন্তু যুদ্ধপ্রেমী। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তিনি তার ভাইয়ের নিযুক্ত গভর্নরদের পদচ্যুত করেন এবং তাদের স্থলে নতুন গভর্নর নিযুক্ত করেন।[৩৪৯] গ্রহণযোগ্য মত এটাই যে, খলিফার উপদেষ্টা উমর বিন আবদুল আজিজ ও রজা ইবনে হাইওয়ার প্রভাবে তার অন্তরে এ পরিবর্তন-চিন্তার উদয় হয়। কারণ, ইসলামি সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পর রাজনৈতিক ও সামরিক বিবর্তনের কারণে উমাইয়া খেলাফতের মধ্যে একধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল। তাই তখন প্রজ্ঞার দাবি ছিল—হাজ্জাজের প্রশাসন ও নীতির পরিবর্তন করে প্রশাসনকে নতুন করে ঢেলে সাজানো।

খলিফা উমাইয়া শাসনের বিরোধিতাকারী সহস্রাধিক মুসলিমকে কারামুক্ত করেন। ভাতা ও অনুদান দ্বিগুণ করেন এবং জনগণের ওপর থেকে অর্থনৈতিক চাপ লাঘব করেন। সম্ভবত সুলাইমানের এ নীতির কারণেই মুসলিমরা ব্যাপকভাবে তার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে এবং তার প্রশংসা করে।[৩৫০]

---

৩৪৯. *ফুতুহুল বুলদান*, বালাযুরি, পৃ. ৪২৮।

৩৫০. *তারিখে তাবারি*, খ. ৬, পৃ. ৫৪৬।

সুলাইমানের পররাষ্ট্রনীতি

পূর্ব দিকের অভিযান

তার সময়ে পূর্ব দিকে নতুন করে ইসলামের বিজয় অর্জিত হয়নি। কারণ, ৯৮ হিজরি মোতাবেক ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে ১৩২ হিজরি মোতাবেক ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে উমাইয়া শাসনের পতন পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিজয়াভিযান পরিচালনার অনুকূল ছিল না। বরং কেন্দ্রীয় প্রশাসন তখন খারেজি সম্প্রদায় ও ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাবের ফিতনা-সহ নতুন করে আরও যে-সকল ফিতনা মাথাচাড়া দিয়েছিল, সেগুলো দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে খোরাসানে বসবাসরত আরবদের মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আব্বাসিরা যেগুলোকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। তবে স্পষ্টত উমাইয়া শাসকরা তখনো পর্যন্ত পূর্বসূরিদের অর্জনগুলো ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

বাইজেন্টাইন অভিযান

সুলাইমানের শাসনামলে সবচেয়ে বড় অভিযানটি ছিল—মাসলামা বিন আবদুল মালিকের নেতৃত্বে বাইজেন্টাইন শাসিত কনস্টান্টিনোপল অবরোধ। খলিফা তার সহোদর মাসলামাকে সেনাপতি করে তার অধীনে ১ লাখ ৮০ হাজার সদস্যের একটি সেনাবাহিনী এবং ১ হাজার ৮০০ সদস্যের একটি নৌবাহিনী গঠন করেন।[৩৫১] ৯৮ হি./৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে এ বাহিনী বাইজেন্টাইন অঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করে এবং খলিফা দাবিক (Dabiq)-এ অবস্থানকালীন সেনাবাহিনী বাইজেন্টাইন ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। সুলাইমান দাবিকে প্রবেশ করে আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, মুসলিম সেনাবাহিনী কনস্টান্টিনোপলে প্রবেশের পূর্বে তিনি কিছুতেই এখান থেকে কোথাও যাবেন না।[৩৫২]

মুসলিম সেনাবাহিনী স্থলপথে বাইজেন্টাইনের রাজধানী পর্যন্ত পৌছে তার ওপর অবরোধ আরোপ করে। ঠিক একই সময়ে নৌবাহিনী জলপথে অবরোধ আরোপ করে। সেনাপতি মাসলামা ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে শহরটির ওপর পাথর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু তাদের সুদৃঢ় প্রাচীর ও দক্ষ বাইজেন্টাইন

---

[৩৫১]. Le Monde Oriental : Diehl et Marçais : pp 251-252.

[৩৫২]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৬, পৃ. ৫৩১। দাবিক : ইযাযের অন্তর্গত আলেপ্পোর নিকটবর্তী একটি গ্রাম। এর ও আলেপ্পোর মধ্যবর্তী দূরত্ব চার ক্রোশ (১৯.৩১ কি.মি.)।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ২, পৃ. ৪১৬।

প্রকৌশলীদের কল্যাণে তারা বেঁচে যায়। সম্রাট তৃতীয় লিও (Leo III) বিশালাকার শিকলের মাধ্যমে বসফরাস প্রণালির প্রবেশপথ বন্ধ করে দেন; যাতে করে মুসলিমদের জাহাজগুলো সেদিক দিয়ে প্রবেশ করতে না পারে। এদিকে সমুদ্র থেকে বয়ে আসা ঝড় মুসলিমদের জাহাজগুলোকে সীমান্ত-প্রাচীর থেকে বহুদূরে ঠেলে দেয় এবং তাতে অনেক জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়। তা ছাড়া বাইজেন্টাইনরা গ্রিক ফায়ারের মাধ্যমে মুসলিমদের অনেক জাহাজ জ্বালিয়ে দেয়।

এত সব প্রতিবন্ধকতার সামনে মুসলিমরা বাইজেন্টাইন রাজধানী জয় করতে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে বাইজেন্টাইরা কৃষ্ণসাগর যোগে তাদের প্রয়োজনীয় রসদসামগ্রী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়, বিপরীতে মুসলিমদের রসদসামগ্রী ফুরিয়ে আসতে থাকে। এদিকে বাইজেন্টাইনদের বাধার কারণে সিরিয়া থেকে মুসলিম সৈন্যদের জন্য রসদসামগ্রীর আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। আবার ইসলামি নৌবাহিনীতে কর্মরত খ্রিষ্টান নাবিকরা গোপনে বাইজেন্টাইনদের সাথে আঁতাত করার কারণে পরিস্থিতি অধিকতর খারাপ হয়ে যায়। ফলে মুসলিম বাহিনীর সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হতে থাকে। সুলাইমানের পরবর্তী খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ মাসলামাকে পত্রযোগে অবরোধ তুলে নিয়ে সিরিয়া ফিরে আসার নির্দেশ দেন। ফলে এ যাত্রায় মুসলিমদের রক্ষা হয়।[৩৫৩]

এ অভিযানটিকেই উমাইয়া শাসক কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের শেষ অভিযান হিসেবে গণ্য করা হয়।

সুলাইমানের মৃত্যু

সুলাইমান দাবিকে অবস্থানকালে ১০ সফর ৯৯ হি. মোতাবেক সেপ্টেম্বর ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আপন চাচাতো ভাই উমর বিন আবদুল আজিজকে এবং তারপরে আপন সহোদর ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিককে খলিফা মনোনীত করেন।[৩৫৪]

* * *

---

৩৫৩. *তারিখে তাবারি*, খ. ৬, পৃ. ৫৩০-৫৩১।

৩৫৪. প্রাগুক্ত : খ. ৬, পৃ. ৫৩১-৫৩২, ৫৫২।

|

উমর বিন আবদুল আজিজ

(৯৯-১০১ হিজরি/৭১৭-৭২০ খ্রি.)

উমর বিন আবদুল আজিজের শাসননীতি

উমর বিন আবদুল আজিজের খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি একদিকে যেমন তার জীবনের গতিধারা পালটে দেয়, অপরদিকে তা সাধারণভাবে ইসলামি ইতিহাসের ওপর এবং বিশেষভাবে উমাইয়া খেলাফতের ইতিহাসের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে।

স্বয়ং উমর রাযি.-এর জীবনে খেলাফতের প্রভাব এই ছিল যে, খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের ফলে তার জীবনে দুটি অধ্যায় তৈরি হয়। এর মধ্যে প্রথম অধ্যায়টি ছিল জাঁকজমক ও বিলাসিতাপূর্ণ। তা ছিল খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেকার সময়। আর দ্বিতীয় অধ্যায়টি ছিল খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরবর্তী সময়। তখন তিনি পার্থিব জীবনের সাজসজ্জা ও সৌখিনতা পরিহার করে সত্যিকার অর্থে দুনিয়াবিমুখতা অবলম্বন করেন এবং শাসকসুলভ দম্ভ ও অহংকারের পরিবর্তে আপন দায়িত্বের গভীর অনুভূতি অর্জন করেন।

ইসলামের ইতিহাসে তার খেলাফতের প্রভাব এই ছিল যে, উমর বিন আবদুল আজিজ বিশ্বমানবতার সামনে প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেশ করে গেছেন, যদি কোনো মুসলিম শাসক আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার ভয় করে খাঁটি মনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সংকল্প করে, তবে তার পক্ষে প্রতিকূল অবস্থাকেও অনুকূল করা এবং বিপথগামীদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।[৩৫৫]

---

৩৫৫. *আল-আলামুল ইসলামি ফিল আসরিল উমাবি*, আবদুল লতিফ, পৃ. ১৭৪।

উমর বিন আবদুল আজিজ তার শাসনামলে বহিঃরাষ্ট্রে সামরিক অভিযান স্থগিত করেন এবং সন্ধিনীতির অনুসরণ করে অমুসলিমদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন।[৩৫৬]

তিনি মুসলিম সমাজের বহু বিষয়ে সংস্কার সাধন করেন। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় হলো, বিরোধী মতাবলম্বীদের প্রতি উদারনীতি, বিধর্মীদের প্রতি দ্বীনি সহিষ্ণুতা এবং তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান, সমমনা প্রভাবিত একদল প্রশাসক তৈরি এবং নতুন বিজয়সমূহের কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধান।

উমর বিন আবদুল আজিজের সংস্কার কীর্তির আরও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক হলো, তিনি দূরবর্তী শহরগুলোতে ও খোরাসানের পথে সরাইখানা নির্মাণ করেন। মুসাফিরদের জন্য সেখানে একদিন একরাত মেহমানদারির ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়াও তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, শরিয়া বহির্ভূত কর আদায় ও উপঢৌকন গ্রহণ নিষিদ্ধ করে তার আদর্শিক চিন্তার বাস্তবায়ন করেন।

উমর বিন আবদুল আজিজের মৃত্যু

উমর বিন আবদুল আজিজ ২৫ রজব ১০১ হিজরি মোতাবেক ফেব্রুয়ারি ৭২০ খ্রিষ্টাব্দে হামাত ও আলেপ্পোর মধ্যবর্তী দিয়ারে সাময়ানের অন্তর্গত খানাসিরা নামক শহরে মৃত্যুবরণ করেন। তার শাসনকালকে উমাইয়া শাসনের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল শাসনকাল হিসেবে অভিহিত করা হয়; এমনকি কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাকে খেলাফতে রাশেদার পূর্ণতা দানকারী মনে করেন।[৩৫৭]

***

---

৩৫৬. *তারিখে তাবারি*, খ. ৬, পৃ. ৫৬৮।

৩৫৭. প্রাগুক্ত : খ. ৬, পৃ. ৫৬৫; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৯, পৃ. ১৯২, ২০০।

|

ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক (দ্বিতীয় ইয়াযিদ)

(১০১-১০৫ হি./৭২০-৭২৪ খ্রি.)

দ্বিতীয় ইয়াযিদের যুগে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা

ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবের বিদ্রোহ

উমর বিন আবদুল আজিজের পর সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের পূর্বঘোষণা অনুযায়ী ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ইয়াযিদ ক্ষমতা গ্রহণের পর কায়েস গোত্রের লোকদের প্রতি অতিমাত্রায় পক্ষপাতিত্ব করেন। আর সে কারণেই ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাব বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসরা, কুফা, আহওয়াজ ও পারস্যের বেশ কিছু অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি তিনি প্রায় পুরো ইরাকের ওপর কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হন। তখন মানুষজন তার হাতে বাইআত করে তার প্রতি নিজেদের সমর্থন প্রকাশ করে। বিশেষ করে ইরাকবাসীরা তার আন্দোলনের সাথে একাত্মতা পোষণ করে। মূলত এটি ছিল হাজ্জাজীয় নীতি ও সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আন্দোলন। তবে আন্দোলনটি পূর্ব প্রস্তুতিবিহীন ও সাময়িক হওয়ার কারণে তা বেশি দূর এগোতে পারেনি। বরং মাসলামা বিন আবদুল মালিকের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর হাতে এর সমাপ্তি ঘটে।[৩৫৮]

আব্বাসীয় অভ্যুত্থান

ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিকের শাসনামলে আব্বাসীয় অভ্যুত্থান ঘটে। প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে আব্বাসি বংশের নেতা ছিলেন আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস। তিনি দক্ষিণ জর্ডানের শারাত শহরের অন্তর্গত হামিমায় বসবাস করতেন।

---

৩৫৮. *তারিখে তাবারি*, খ. ৬, পৃ. ৫৯০-৫৯৭।

আব্বাসিদের আরেকজন নেতা আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়্যাহ বিন আলি ইবনে আবু তালেব—যার উপাধি ছিল আবু হাশিম—সিরিয়ায় খলিফা সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করে ফিরে আসেন। পথিমধ্যে তিনি বুঝতে পারেন তার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। তখন তিনি আপন ভাতিজা মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাসকে অসিয়ত করেন, তুমি বনু উমাইয়ার শাসনক্ষমতা ধ্বংসের চেষ্টা করবে।

আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদের অসিয়ত মুহাম্মাদ বিন আলির অন্তরের পূর্ব লালসাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে। অতঃপর সে এ লক্ষ্যে কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু সে নিজের দিকে মানুষকে আহ্বান না করে আহলে বাইতের মর্যাদা রক্ষার প্রতি আহ্বান করে। কারণ, সে ভালো করে জানত—এ কৌশলের কারণে আহলে বাইতের মাঝে অনৈক্যের সৃষ্টি হবে না এবং সেও মানুষের দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারবে। আর স্বাভাবিকভাবেই আহলে বাইতের প্রত্যেকেই ওই সংগঠনকে সমর্থন করবে, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের মর্যাদা রক্ষার প্রতি আহ্বান করবে। সে এ সুযোগটিকেই কাজে লাগায় এবং উমাইয়া শাসনের সবচেয়ে অরাজকতাপূর্ণ প্রদেশ খোরাসানে ঘাঁটি স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করে।

ইয়াযিদের পররাষ্ট্রনীতি

দ্বিতীয় ইয়াযিদের শাসনামলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল না থাকায় উমাইয়া খেলাফত বহিঃরাষ্ট্রে সামরিক অভিযান স্থগিত করে। ফলে তখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়নি; বরং পুরো সীমান্তবর্তী অঞ্চলজুড়ে শান্ত অবস্থা বিরাজ করে।

ইয়াযিদের মৃত্যু

ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক তার সহোদর হিশামকে এবং তারপরে নিজ পুত্র ওয়ালিদকে পরবর্তী খলিফা ঘোষণা করেন এবং ২৫ শাবান ১০৫ হি. (জানুয়ারি ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দে) সিরিয়ার বালকা শহরে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৫৯]

---

৩৫৯. *তারিখে তাবারি*, খ. ৭, পৃ. ২১-২২; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৪, পৃ. ১৬২-১৬৩।

।

হিশাম বিন আবদুল মালিক

(১০৫-১২৫ হি./৭২৪-৭৪৩ খ্রি.)

হিশামের যুগে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

হিশামকে বনু উমাইয়ার শ্রেষ্ঠতম খলিফাদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন মেধাবী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সুব্যবস্থাপক, দূরদর্শী, সচেতন ও উম্মাহর কল্যাণের বিষয়ে সদাসজাগ। তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের মাঝে গোত্রীয় সাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন, যার ফলে চলমান অধঃপতন আপাতত স্থগিত হয়।[৩৬০]

তার সংস্কারকর্মের মধ্যে অন্যতম হলো, রায়-এর খালখনন, হজের রাস্তায় কূপখনন এবং আপন সন্তানদের সঠিক দীক্ষা প্রদান।

আহলে বাইতের একজন শীর্ষ নেতা যায়েদ বিন আলি তার শাসনামলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সে খেলাফতের আশায় সর্বত্র এর প্রচারণা চালাতে থাকে। তার বিশ্বাস ছিল—সেই হলো খেলাফতের উপযুক্ত ও অধিক হকদার।[৩৬১] আলাভিরাও তার আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়। এ ছাড়াও মাদায়েন, বসরা, ওয়াসিত, মসুল ও খোরাসানবাসীরা তাকে সমর্থন জোগায়। কিন্তু ইরাকের গভর্নর ইউসুফ বিন উমরের নেতৃত্বে তার আন্দোলনের অবসান হয়। দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে যায়েদ তীরবিদ্ধ হন এবং এই তীরের আঘাতেই তার মৃত্যু হয়।[৩৬২]

---

৩৬০. *মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*, মাসউদি, খ. ৩, পৃ. ২১১।

৩৬১. *তারিখে তাবারি*, খ. ৭, পৃ. ১৬৫-১৬৬।

৩৬২. প্রাগুক্ত : খ. ৭, পৃ. ১৮২-১৮৯।

হিশামের খেলাফত আমলে
ইউরোপের ঘটনাবলি
তুলুজ যুদ্ধ ১১৪ হি./ ৭৩২ খ্রি.
আটলান্টিক মহাসাগর
বে অব বিস্কে
লোয়ার নদী
আতেন
তুরস
বুরগুন্ডিগণ
আল্পস পর্বতমালা
লম্বার্ডি বংশ
বর্দো
তুলুজ
ফ্রান্সে আবদুর রহমান আল-গাফিকির হামলা ১১৪ হি./৭৩২ খ্রি.
টলেডো
আন্দালুস
কর্ডোভা
তানজিয়ার
সিউটা
ওরান
মরক্কো
এটলাস পর্বতমালা
লিও উপসাগর
রিভেরা
কর্সিকা
সার্দিনিয়া
মেনোরকা
মায়োরকা
রোম
পালের্মো
সিসিলি
মাল্টা
সাইরাকাল
কায়রোয়ান
হানযালা ইবনে সাফওয়ানের হামলা ১২৪ হি./৭৪১ খ্রি.
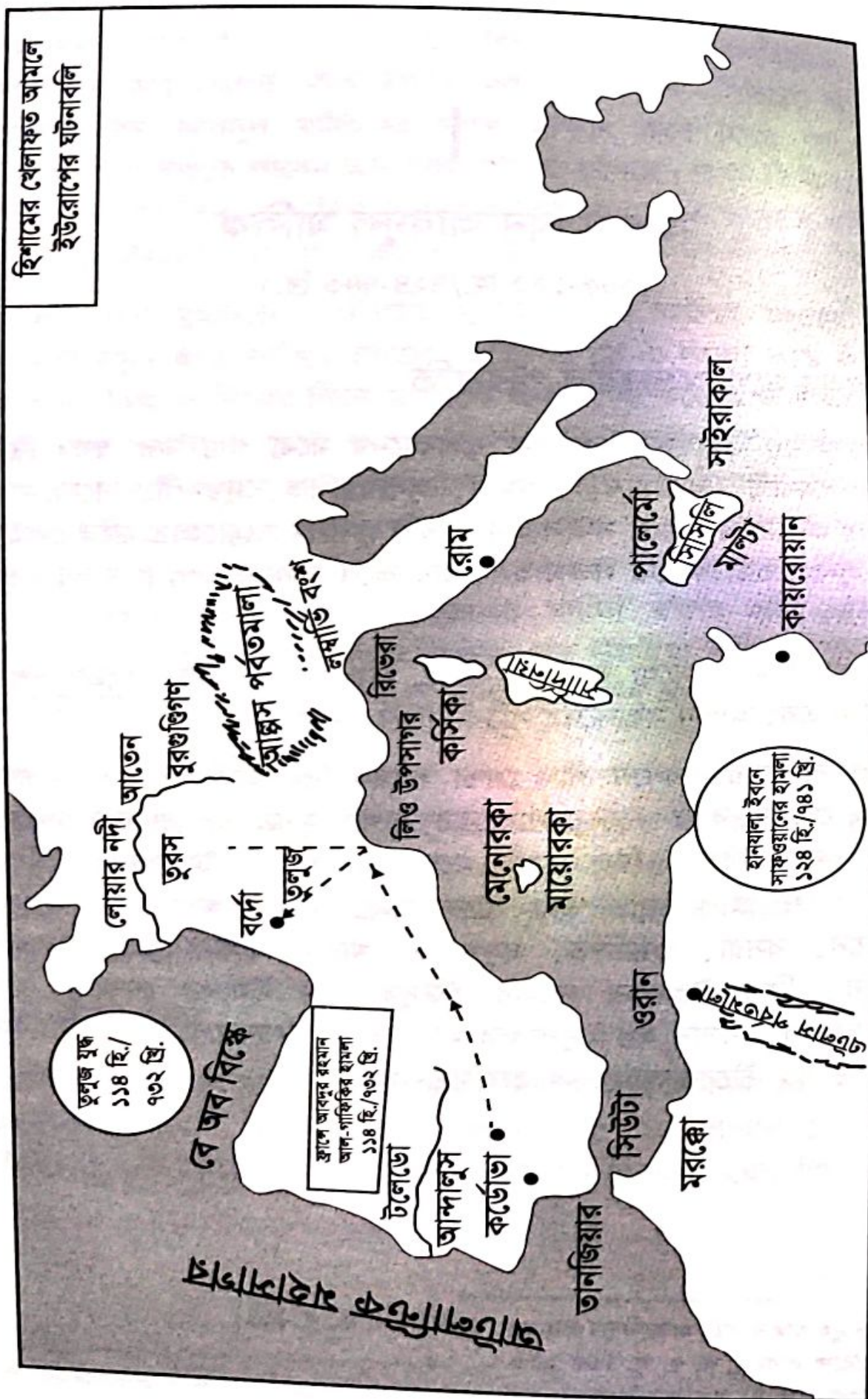
হিশামের যুগে বৈদেশিক পরিস্থিতি

পূর্ব দিকে অভিযান

হিশামের শাসনামলে বিভিন্ন এলাকায় অনেকগুলো ভয়াবহ সংঘর্ষ হয় এবং এর ফলে অনেক এলাকা খলিফার হাতছাড়া হয়ে যায়। মাওয়ারা-উন-নাহরে, বিশেষ করে সমরকন্দে তুর্কিরা মুসলিমদের বিতাড়িত করতে তৎপরতা শুরু করে। সেখানকার অধিবাসী নওমুসলিমরা তাদের সাহায্য করে এবং ইসলামে প্রবেশের পূর্বে তাদের ওপর যে জিযয়া (কর) ধার্য ছিল, তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। দুপক্ষের মধ্যে একাধিকবার সংঘর্ষ হয়, ফলে মুসলিমরা বোখারা-সহ মাওয়ারা-উন-নাহরের বিভিন্ন অঞ্চল ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়।[৩৬৩] এ ছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় অনেকগুলো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এদিকে খোরাসান ও ইরাকের গভর্নর নাসর ইবনে সায়্যার ভূমিকর সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হন। এর মাধ্যমে তিনি মার্ভের মুসলিমদের তরফ থেকে যে শোষণমূলক কর-ব্যবস্থার অভিযোগ ছিল, তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করেন। ফলে খোরাসানের সর্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে।

আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের অভিযান

এ অভিযানে একাধিক মুসলিম শাসক পর্যায়ক্রমে নেতৃত্ব দান করেন। ১০৭ হি. (৭২৫ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে এ অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয়; বিশেষ করে খাজার ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলোতে। ফলে তুর্কি বাহিনী অবদমিত হয় এবং খালাত-সহ বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়।[৩৬৪]

বাইজেন্টাইনের অভিযান

হিশামের শাসনামলে বাইজেন্টাইন বাহিনী ও মুসলিমদের মধ্যে সংঘাত অব্যাহত থাকে। খলিফা সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে অনেকগুলো দুর্গ নির্মাণ করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, একদিকে বাইজেন্টাইনদের আক্রমণ মোকাবেলা করা, অপরদিকে সেগুলোকে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে সেখান থেকে বাইজেন্টাইন ভূখণ্ডে অভিযান পরিচালনা করা।

---

৩৬৩. *তুর্কিস্তান মিনাল ফাতহিল আরাবি ইলাল গাযবিল মুগোলি*, বারথোল্ড ভ্যাসিলি, পৃ. ৩০৬-৩১০।

৩৬৪. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৮, ১৮৬, ১৯৩, ১৯৬, ১৯৮-২০০, ২২৭, ২৩০।

মুসলিমরা এশিয়া মাইনর এলাকায় অনবরত হামলা চালিয়ে খানজারা, খারশানা, কায়সারিয়্যাহ, সামালো প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন। এ ছাড়াও দাওরিলিওম, নাইকায়া, তিওয়ানা ও বারজামা অবরোধ করেন। এমনিভাবে সাইপ্রাস ও সিসিলির মতো নিকটবর্তী দ্বীপসমূহে সামুদ্রিক অভিযান পরিচালনা করেন।[৩৬৫]

এসবের মোকাবেলায় বাইজেন্টাইনদের প্রতিক্রিয়া অতি সামান্যই ছিল। ১২২ হি. মোতাবেক ৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে রাব্য আকরানের যুদ্ধকে উমাইয়া ও বাইজেন্টাইনেদের মধ্যকার সর্বশেষ বৃহৎ যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হয়। এতে বাইজেন্টাইন সম্রাট তৃতীয় লিও স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের ফলে মুসলিমরা এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাঞ্চল থেকে বাইজেন্টাইনদের বিতাড়িত করে। আবদুল্লাহ বাত্তাল খ্যাত তুর্কি বীরের ঘটনাটি এ যুদ্ধেই ঘটেছিল এবং তিনি এ যুদ্ধেই নিহত হন।[৩৬৬]

উত্তর আফ্রিকার অভিযান

খারেজি সম্প্রদায় আমাজিগদের নিজেদের দলে ভেড়ানোর পর তাদের বৈরিতার কারণে এ অঞ্চলে উমাইয়াদের অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। তাদের বৈরিতা বাড়তে বাড়তে একসময় (১২২ হিজরি মোতাবেক ৭৪০ খ্রি.) বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। তাঞ্জিয়ারের গভর্নর আশতাত তার অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় এবং এর নেতৃত্ব প্রদান করে। খলিফা মিসরের শাসক হানযালা বিন সাফওয়ান কালবির নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করলে তিনি আসনাম ও ক্বারনের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করেন।[৩৬৭]

হিশামের মৃত্যু

হিশাম বিন আবদুল মালিক ১২৫ হিজরির রবিউস সানির ৭ তারিখ (৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে) মৃত্যুবরণ করেন।[৩৬৮]

***

---

৩৬৫. *তারিখু খলিফা ইবনি খায়্যাত*, খ. ২, পৃ. ৩৪৯-৩৬৯।

৩৬৬. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৪, পৃ. ২৭০-২৭১; History of the Byzantine Empire : Finlay, p. 20.

৩৬৭. *ফুতুহু মিসর ওয়া আফ্রিকিয়্যাহ*, ইবনু আবদিল হাকাম, পৃ. ২৯৮-২৯৯।

৩৬৮. *তারিখে তাবারি*, খ. ৭, পৃ. ২০০।

ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ (দ্বিতীয় ওয়ালিদ)

(১২৫-১২৬ হি./৭৪৩-৭৪৪ খ্রি.)

হিশামের মৃত্যুর ১০ দিন পর দামেশকে তার ভাতিজা ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদের হাতে বাইআত অনুষ্ঠিত হয়।[৩৬৯] এ খলিফার আচরণ ছোটকাল থেকেই ছিল এলোমেলো। এ কারণে তার প্রতিপক্ষ, বিশেষত চাচা হিশামের তরফ থেকে তিনি মানহানির শিকার হন। কিন্তু তিনি ছিলেন উদার মনের অধিকারী। তাই তিনি ইচ্ছা করেন—তার শাসনকাল হবে তার চাচার শাসনকাল হতে ব্যতিক্রম। এ লক্ষ্যে তিনি সেনাবাহিনী ও সাধারণ জনগণের ভাতা বৃদ্ধি করেন এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কুষ্ঠরোগী ও অন্ধদের জন্য একজন করে খাদেমের ব্যবস্থা করেন।[৩৭০]

ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ তার চাচাতো ভাইদের প্রতি এবং তার নিকটাত্মীয় গভর্নরদের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করেন। যারা যারা হিশামকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে, তাদের সকলের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তার এ বাড়াবাড়ির কারণে জনমত তার বিরুদ্ধে চলে যায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দামেশকে ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের নেতৃত্বে তার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। ইয়েমেনিরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। বিদ্রোহীরা দামেশকের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং একটি সেনাবাহিনী গঠন করে। অতঃপর পালমিরা (তাদমুর)-এর সীমান্তে বাখরা নামক জায়গায় খলিফার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে এবং এ যুদ্ধেই খলিফার মৃত্যু হয়।[৩৭১]

মূলত এ সকল ঘটনা উমাইয়া শাসনের পতনের পটভূমি তৈরি করে। কেননা, একে তো উমাইয়াদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল সৃষ্টি হয়, সেই সঙ্গে

---

৩৬৯. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৬।
৩৭০. *তারিখে তাবারি*, খ. ৭, পৃ. ২১৭।
৩৭১. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৩৮-২৩৯, ২৪৪।

তারা আরব জোট—তথা সিরিয়া ও খোরাসানে বসবাসকারী ইয়েমেনি জোটের সমর্থন হারায়। উমাইয়াদের শাসনক্ষমতায় টিকে থাকার পেছনে যাদের বিরাট ভূমিকা ছিল। তা ছাড়া আব্বাসিদের বিদ্রোহ তাতে আরও বাড়তি মাত্রা যোগ করে।

* * *

।

ইয়াযিদ বিন প্রথম ওয়ালিদ

(১২৬ হি./৭৪৪ খ্রি.)

দামেশকের মিজ্‌জা (Mezzeh) গ্রামে লোকজন ইয়াযিদ বিন প্রথম ওয়ালিদের হাতে বাইআত গ্রহণ করে। এরপর তিনি দামেশকে প্রবেশ করে এ শহরের নিয়ন্ত্রণ নেন। এ খলিফা তার শাসনামলে তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটান এবং উমর বিন আবদুল আজিজের সাদৃশ্য গ্রহণ করেন। তাকে নাকেস (হ্রাসকারী) বলে নামকরণ করা হয়। কারণ, দ্বিতীয় ওয়ালিদ সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের জন্য যে পরিমাণ ভাতা বৃদ্ধি করেছিল, তিনি তা হ্রাস করেন।[৩৭২]

দ্বিতীয় ওয়ালিদের মৃত্যুর পর যে বিশৃঙ্খলার সূচনা হয়, প্রথম ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদের শাসনামলে তা চলমান থাকে এবং তা-ই বনু উমাইয়া বংশে ভাঙন ও তাদের শাসনের পতনের কারণ হয়। বাস্তবতা হলো, তৃতীয় ইয়াযিদের ব্যক্তিত্বের প্রতি সমগ্র বনু উমাইয়ার সমর্থন ছিল না। এ কারণে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। ইতোমধ্যে জাজিরা, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার শাসক মারওয়ান বিন মুহাম্মাদের বিদ্রোহের কারণে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। অতঃপর তিনি শাসন-ক্ষমতার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য খলিফার সঙ্গে আলোচনায় বসেন। যখন তারা দুজনে ঐকমত্যের কাছাকাছি পৌঁছেন, তখন সহসাই ইয়াযিদ (জিলহজ ১২৬ হিজরি (ফেব্রুয়ারি ৭৪৪ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন।[৩৭৩]

* * *

[৩৭২]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৭, পৃ. ২৬০-২৬২।

[৩৭৩]. প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৯৯।

মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ আল-জাদি (দ্বিতীয় মারওয়ান)

(১২৭-১৩২হি./৭৪৪-৭৫০ খ্রি.)

ইয়াযিদ বিন প্রথম ওয়ালিদের মৃত্যুর পর মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ আল-জাদি দামেশককে আক্রমণ করে সেখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং মানুষ তার হাতে খেলাফতের বাইআত গ্রহণ করে।[৩৭৪] এ খলিফাকে বনু উমাইয়া বংশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অশ্বারোহী ও বীরদের মধ্যে গণ্য করা হয়। কিন্তু পরিস্থিতির দাবি ছিল—তার শাসনামলেই উমাইয়া শাসনের পতন হবে, তবে এর জন্য তিনি একা দায়ী নন। কারণ, যে-সকল বিষয় উমাইয়া শাসনকে দুর্বল করে তার পতন ডেকে এনেছে, এগুলোর শিকড় অনেক পূর্ব হতেই বিদ্যমান ছিল। কাজেই তখন তার নিয়তি ছিল—কেবল তার বিরুদ্ধে যে-সকল বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়েছিল, সেগুলোর মোকাবেলা করা। দ্বিতীয় ওয়ালিদের মৃত্যুর পর উমাইয়ারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের সামনে এমন কোনো লক্ষ্য ছিল না, যা তাদের সকলকে একতাবদ্ধ করতে পারে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ভিত দুর্বল হয়ে তাতে ফাটল ধরে। তাদের পিরামিডের চূড়া ধসে পড়তে শুরু করে। তাদের রাজধানী-সহ প্রধান প্রধান শহরগুলোতে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় মারওয়ান সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে তার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ শুরু হয়, তা দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে পূর্ব প্রান্তর, বিশেষত আব্বাসি অভ্যুত্থানের কেন্দ্র খোরাসানের ঘটনাবলি সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন। আব্বাসি সৈন্যরা সিরিয়ার অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ চালায়; কিন্তু মারওয়ানের গভর্নরগণ তাদের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কার্যত ব্যর্থ হয়। ইতোমধ্যে কুফায় আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আব্বাসি—যিনি আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ নামে পরিচিত—তার হাতে লোকজন বাইআত করে। তিনি আপন চাচা আবদুল্লাহ ইবনে আলি আসগরের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যাব নদীর তীরে দ্বিতীয়

---

[৩৭৪]. প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩১১-৩১২, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ৪৬-৪৭।

মারওয়ানের বাহিনীর সাথে তার সংঘর্ষ হলে তিনি বিজয়ী হন। জুমাদাল উখরা ১৩২ হি. মোতাবেক জানুয়ারি ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে এ ঘটনা ঘটে। যুদ্ধের পর মারওয়ান মসুল ও হাররান অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু আব্বাসি সেনারা তার পশ্চাদ্ধাবন করে। অবশেষে মিসরের ফাইয়ুম জেলার ছোট বুসির গ্রামে তাকে হত্যা করে।[৩৭৫] তার হত্যার মাধ্যমেই উমাইয়া শাসনের পতন হয়।

এভাবে এমন একটি বংশের শাসনের অবসান হয়; যারা প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে ইসলামি-বিশ্ব শাসন করে মানবীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংখ্য অবদান ও সুমহান কীর্তি রেখে যায়।

* * *

৩৭৫. *তারিখে তাবারি*, খ. ৭, পৃ. ৪৩৭-৪৪২।

উমাইয়া খেলাফতের পতনের কারণসমূহ

ভূমিকা

উমাইয়া খেলাফতের পতন অন্যান্য সাম্রাজ্যের পতনের মতোই একটি স্বাভাবিক বিষয়। যেমনটি আমরা বর্তমান পৃথিবীর শাসকগোষ্ঠীর দিকে তাকালে দেখতে পাই। তাদের শাসনকাল সবসময় একই অবস্থায় থাকে না; বরং তাদেরকে বিভিন্ন স্তর ও ধাপ অতিক্রম করতে হয়। যেমন দেখা যায়—এক সময়কার দাপট ও আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়ে ক্ষমতা ক্রমশই দুর্বল হয় এবং অবশেষে তার পতন হয়।

বনু উমাইয়ার জনৈক বয়োবৃদ্ধ ও এক সময়কার রাজস্ব কর্মকর্তাকে উমাইয়া শাসনের পতন এবং শাসনক্ষমতা আব্বাসিদের হাতে স্থানান্তরের পর জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনাদের রাজত্বের পতনের কারণ কী ছিল?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমাদের আবশ্যিক দায়িত্বগুলো ভুলে গিয়ে আমরা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়েছি। আমরা প্রজাসাধারণের প্রতি জুলুম করেছি। ফলে, তারা আমাদের থেকে সুবিচারের আশা হারিয়েছে এবং আমাদের থেকে মুক্তি কামনা করেছে। আমাদের ভূমিকর (খারাজ) পরিশোধকারীদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। ফলে, তারা আমাদের ছেড়ে দূরে চলে গেছে।

আমাদের ক্ষেত-খামার বিরান হয়েছে। ফলে, আমাদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার খালি হয়ে গিয়েছে। আমরা আমাদের উজিরদের প্রতি ভরসা করেছি, কিন্তু তারা তাদের ব্যক্তিস্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। অনেক বিষয় তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত করে বাস্তবায়ন করেছে এবং আমাদের থেকে সেগুলো গোপন করেছে। আমাদের সেনাবাহিনীর ভাতা প্রদানে বিলম্ব হয়েছে। ফলে, তারা আমাদের আনুগত্য বর্জন করেছে। তাদেরকে আমাদের শত্রুরা নিজেদের দলে ডেকেছে, অতঃপর তারা তাদের সঙ্গে মিলে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা আমাদের শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করেছি; কিন্তু আমাদের সহযোগী-স্বল্পতার কারণে আমরা পরাজিত

হয়েছি। বস্তুত নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত থাকাটাই আমাদের সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ।'[৩৭৬]

প্রকাশ থাকে যে, হিশাম বিন আবদুল মালিকের শাসনকাল পর্যন্ত উমাইয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্য দৃশ্যমান ছিল। কিন্তু হিশামের মৃত্যুর পর যখন উমাইয়াদের ঐক্যে ফাটল ধরে, তখন তারা ধীরে ধীরে নিজেদের সবকিছু হারাতে থাকে। উমাইয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে যে দুর্বলতা ছড়িয়ে পড়েছিল তার কিছু বিশেষ কারণ ছিল। যেমন : অভ্যন্তরীণ কোন্দল, উমাইয়াদের নীতির প্রভাবে সৃষ্ট ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি। এ ছাড়াও কিছু সামগ্রিক কারণ ছিল। যেমন, সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তন এবং পার্শ্ববর্তী জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সামরিক ও সভ্যতার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।

মোটকথা, উমাইয়া খেলাফতের পতনের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একক কোনো ঘটনাকে দায়ী করা সম্ভব নয়। বরং সেখানে অনেক কার্যকারণ জড়িত ছিল, যেগুলোর সমষ্টি এই নিশ্চিত পরিণাম বয়ে এনেছে। তন্মধ্যে কয়েকটি কারণ সামনে তুলে ধরা হলো :

এক. উমাইয়া পরিবারের দ্বন্দ্ব

মুআবিয়া রাযি. তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শাসনক্ষমতা লাভে সমর্থ হন। এ ক্ষেত্রে তার পরিবার ও গোত্র থেকে কোনো বস্তুগত ও মানবিক সহযোগিতা ছিল না। তবে সিরিয়াবাসীরা তাকে জোরালো সমর্থন করে। এ কারণে দেখা যায়, তার শাসনামলে রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে উমাইয়া পরিবারের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা ছিল না। তবে তিনি নিজ বংশীয় লোকদের একেবারে বঞ্চিত করেননি; বরং তাদের মধ্য হতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। অধিকন্তু তিনি নিজ বংশের হুমকি হবার যোগ্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যেন ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে সে ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন।[৩৭৭] এ ছাড়া তিনি নেতৃত্বের বিরল যোগ্যতা ও গুণাবলির মাধ্যমে তিনি উমাইয়াদের মধ্যকার ঐক্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে এ

---

৩৭৬. *মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*, খ. ৩, পৃ. ২২৮।

৩৭৭. যেমন, তিনি মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও সাইদ ইবনুল আসের মধ্যে অনৈক্য তৈরি করেন।—*তারিখে তাবারি*, খ. ৫, পৃ. ২৯৩-২৯৪।

ঐক্য তখন ভেঙে যেতে শুরু করে, যখন তিনি নিজ পুত্র ইয়াযিদকে যুবরাজ ঘোষণা করে তার হাতে বাইআত হওয়ার নির্দেশ জারি করেন।

মারওয়ান ইবনুল হাকাম ছিলেন একজন শীর্ষ নেতা, যিনি খলিফা হওয়ার আশা পোষণ করতেন। তিনি মুআবিয়া রাযি.-এর জীবদ্দশায় তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হতে পারেননি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তিনি আন্দোলন শুরু করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তবে তখন উমাইয়া খেলাফত যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়, তার দাবি ছিল—সমগ্র বনু উমাইয়া একযোগে সেই দুর্যোগ মোকাবেলা করা। মূলত এ বিষয়টি তাকে বিদ্রোহ থেকে বিরত রাখে। কিন্তু দ্বিতীয় মুআবিয়া ইবনে ইয়াযিদের খেলাফতকালে তিনি ঠিকই তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন।

তখন মারওয়ান ইবনুল হাকামের সামনে জাবিয়ায় অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্ষমতা গ্রহণের সুযোগ এসে যায়। মুআবিয়া রাযি. খলিফার পদ নিয়ে যে রীতির প্রচলন করেছিলেন, জাবিয়ার সভায় তা ভঙ্গ করা হয়; কিন্তু মারওয়ান ইবনুল হাকাম তা উপেক্ষা করে তিনিও এ খলিফার মসনদকে মারওয়ানি পরিবারে সীমিত করেন।

মারওয়ান ইবনুল হাকাম খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর উমাইয়া বংশের সদস্যদের মধ্যে তীব্র বিরোধ শুরু হয়। এরপর সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হতে থাকে এবং বিরোধের বিষয়টি জনসম্মুখে চলে আসে। আমর বিন সাইদ মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে বাইআত হতে অস্বীকার করলে তাদের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়—এটিকে উমাইয়া বংশের জটিলতম বিরোধের মধ্যে গণ্য করা হয়। এ বিরোধের কারণে আমর বিন সাইদ নিহত হন এবং এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও বহু বিরোধের দরজা খুলে যায়; উমাইয়ারা একের পর এক যার সম্মুখীন হয়। তবে মারওয়ান ইবনুল হাকাম উমাইয়া বংশের সম্পর্ক বাহ্যিকভাবে হলেও পুনর্বহাল করতে সক্ষম হন। তবে মানুষের অন্তরে বিদ্বেষ লুকিয়ে থাকে এবং তারা প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ সন্ধানে লেগে যায়। পরবর্তী সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বিদ্রোহ করলে আমরের ভাই ইয়াহইয়া বিন সাইদ তার সহযোগী হয়।

ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক দুটি দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে উমাইয়া বংশের প্রতি তার কর্মনীতি নির্ধারণ করেন : ১. উমাইয়াদের শক্তি ও সামর্থ্য দ্বারা উপকৃত হওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত তা তার নিজের ও মিত্রদের

স্বার্থের খেলাফ না হবে। ২. উমাইয়া পরিবারের মধ্যে বিরোধী জোট গঠনের সুযোগ না দেওয়া।

সুলাইমান বিন আবদুল মালিক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই ওয়ালিদের নিয়োগকৃত সকল গভর্নর ও সেনাপতিদের পদচ্যুত করেন এবং তাদের স্থলে নিজের আস্থাশীল গভর্নর নিয়োগ করেন। যেমন, তিনি উমর বিন আবদুল আজিজকে যুবরাজ ঘোষণা করে পূর্ববর্তীদের রীতি ভঙ্গ করেন। তবে তিনি সহোদর ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিককে দ্বিতীয় যুবরাজ ঘোষণা করে আবার পূর্বের রীতিতে ফিরে যান। তার পরিবারের সদস্যরা তার এ নীতির বিরোধিতা করে, যেমনটি আব্বাস ইবনুল ওয়ালিদ উমর বিন আবদুল আজিজের উদারনীতির বিরোধিতা করে। এ বিরোধিতা ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং অবশেষে তা খলিফাকে হত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত গড়ায়।

হিশাম বিন আবদুল মালিকের শাসনামলে একটি বিরোধী দল আত্মপ্রকাশ করে। তার চাচাতো ভাই ও যুববাজ ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক যার নেতৃত্ব প্রদান করেন। উভয়ের মধ্যে প্রকাশ্য লড়াই হলে হিশাম নিহত হন। অতঃপর ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ তার চাচাতো ভাইদের প্রতি বৈরী আচরণ শুরু করলে তারা মানুষকে প্ররোচিত করে—তারা যেন তাকে হত্যা করে।[৩৭৮] ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদের শাসনের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে উমাইয়াদের শতধা বিভক্তিকেই নির্দেশ করে। তা ছাড়া খলিফার হত্যাকাণ্ডকে উমাইয়া পরিবারের পতনের নির্দেশক হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা, এ হত্যাকাণ্ড খোদ উমাইয়াদের হাতেই সংঘটিত হয়েছিল।

তৃতীয় ইয়াযিদের শাসনামলে উমাইয়া পরিবারের অবক্ষয় আরও বেড়ে যায় এবং শাসনক্ষমতাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যকার বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হতে থাকে। ফলে বিশৃঙ্খলা ব্যাপকতা লাভ করে এবং সাম্রাজ্যের গায়ে দুর্বলতার চিহ্ন স্পষ্ট হতে শুরু করে। তার ভাই ইবরাহিমের হাতে বাইআত এই সংকটকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংকট হলো, উমাইয়াদের সাম্রাজ্যের ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের থেকে শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে বিভিন্ন দল ও ব্যক্তিদের লালসা বেড়ে যায়।

---

[৩৭৮]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৭, পৃ. ২৩২।

উমাইয়াদের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের শাসনামলে যখন অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ক্রমেই খরাপ হতে থাকে এবং বৈদেশিক হুমকি বাড়তে থাকে, তখন তিনি এসব বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের আনার চেষ্টা করে অকৃতকার্য হন। তিনি পূর্ব দিক থেকে আক্রমণকারী আব্বাসি সৈন্যদের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন এবং এরই মধ্য দিয়ে উমাইয়ার খেলাফতের সূর্য অস্তমিত হয়।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে—উমাইয়া পরিবারের বিশ্বাসের শিকড় এতটা মজবুত ছিল না, যা তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। যদিও উমর বিন আবদুল আজিজ এ শিকড়কে দৃঢ় করতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু তা অব্যাহত না থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখতে পারেনি।

দুই. দুজনকে যুবরাজ ঘোষণা করা

যুবরাজ ঘোষণার বিষয়টি উমাইয়া পরিবারে ভাঙন সৃষ্টির একটি অন্যতম কারণ। বনু উমাইয়ার অনেক খলিফা একই সঙ্গে দুজনকে যুবরাজ ঘোষণা করে—যাদের একজন অপরজনের পর খলিফা হবে। মূলত তারা একজন খলিফার মৃত্যুর পর যেন খেলাফতের পদ নিয়ে পারিবারিক সংঘাত না হয়, এ লক্ষ্যে এই নীতির অনুসরণ করে। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়। এ নীতিই নতুন করে কলহের বীজ বপন করে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করে এবং তাদের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে। ফলে দেখা যায়, নবনিযুক্ত খলিফা রাষ্ট্রের ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না করতেই তাকে পদচ্যুত করে পরবর্তীজনকে বা তার কোনো সন্তানকে তার স্থলাভিষিক্ত করার দুরভিসন্ধি শুরু হয়ে যায়। এতে করে পরিবারের সদস্যরা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়।

মারওয়ান ইবনুল হাকাম প্রথম এ রীতির প্রচলন করেন। তার পরবর্তী খলিফারা এ রীতি প্রয়োগের কারণে যে গোলযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে তার প্রতি লক্ষ না করেই এর অন্ধ অনুসরণ করেন। নিঃসন্দেহে এ শাসননীতি ছিল বনু উমাইয়ার পতনের অশনি সংকেত। এরপর উমাইয়া পরিবারের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি হয়। তাদের ভরসাস্থল সেনাবাহিনী বহু দলে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে পূর্ব দিক থেকে ধেয়ে আসা তাদের প্রতিপক্ষরা আক্রমণের সুযোগ পেয়ে সাম্রাজ্য দখল করে নেয়।

তিন. গোত্রীয় দ্বন্দ্ব

উমাইয়া শাসন তার সূচনাকাল থেকেই গোত্রপ্রীতির ওপর নির্ভর করে। এমনকি এ কারণে তাদের ওপর আরব জাতীয়তাবাদের তকমা লেগে যায়, যা তার পতন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আরবরা জাজিরাতুল আরব থেকে বের হয়ে কায়েসি ও ইয়েমেনিদের মধ্যে বিরোধের যে বীজ বপন করে, তা সাম্রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট করে এবং তার ওপর জাতীয়তাবাদের পোশাক পরিয়ে দেয়। উপরন্তু নতুন নতুন অঞ্চল বিজয়ের ফলে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের লোকেরা একসঙ্গে বসবাস করতে শুরু করে। প্রকাশ থাকে যে, উমাইয়া খলিফারাও অনেক সময় সাম্প্রদায়িক চেতনা জাগিয়ে তুলত এবং এ জাতীয় বিরোধ উসকে দিত। আবার কখনো কখনো রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলে এমনিতেই তারা এ জাতীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতো।

মুআবিয়া রাযি. তার স্বরাষ্ট্রনীতির অংশ হিসেবে সিরিয়ায় অবস্থানরত ইয়েমেনের সবচেয়ে শক্তিধর গোত্র বনু কালবের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে গোত্রীয় সম্প্রীতির নজির পেশ করেন। তবে তার পরবর্তী খলিফাদের শাসনামলে এ ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। কেননা, উমর বিন আবদুল আজিজ ব্যতীত বনু উমাইয়ার বাকি খলিফারা এ ভারসাম্য ধরে রাখতে পারেননি। বরং বিপরীতে তারা নিজেদের স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতা উসকে দিয়েছেন। ফলে তারা কখনো এ দলের পক্ষ নিয়েছেন, আবার কখনো ওই দলের পক্ষ নিয়েছেন; যে কারণে মাঝে মাঝেই গোত্রীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে এবং তা সাম্রাজ্যের শক্তি বিনাশ করেছে। এটি ছিল উমাইয়াদের পতনের একটি অন্যতম কারণ।

চার. উমাইয়াদের নিকট আরব জাতীয়তাবাদ

আরব জাতীয়তাবাদ উমাইয়াদের মাঝে প্রকট আকার ধারণ করে। উমাইয়ারা আরবদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিল এবং মাওয়ালিদের[৩৭৯] ওপর ছিল কর্তৃত্বপরায়ণ। তিনটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্র।

---

৩৭৯. মাওয়ালি (موالي) হলো একটি পরিভাষা, যা দ্বারা বিজিত অঞ্চলের মুসলিমদের বোঝানো হতো। উমাইয়া খেলাফতের সময় বিপুলসংখ্যক অনারব যেমন পারসিক, আফ্রিকান, তুর্কি ও কুর্দি ইসলাম গ্রহণ করলে এই পরিভাষাটি গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের কারণে গোত্রীয় আরবসমাজে কিছু সামাজিক জটিলতা সৃষ্টি হয়।—অনুবাদক

মাওয়ালিরা আরবের শাসকশ্রেণির ওপর রুষ্ট ছিল, যে কারণে তারা উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ফলে জাতীয়তাবাদের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে একটি নতুন সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মাওয়ালিরা একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক জোট গঠন করে, যারা উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে। কারণ তারা ছিল এমন দল, যারা রাষ্ট্র থেকে যা গ্রহণ করত তার চেয়ে বেশি প্রদান করত। তা ছাড়া রাষ্ট্র ও সমাজে তাদের বিশেষ অবদান ছিল, যে-কারণে তারাও আরবদের মতো সমানাধিকার লাভের উপযুক্ত ছিল। তাদের এ রাজনৈতিক দাবি কেবল আব্বাসিদের কাছেই মর্যাদা পেয়েছে। আব্বাসিরা তাদের 'আরবদের সঙ্গে সাম্যের দাবি'কে সমর্থন জানিয়েছে।

আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বলা চলে—উমাইয়ারা নির্দিষ্ট কিছু নীতির অনুসরণ করেছে, যার মূল হলো মাওয়ালিদের ওই সকল অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত করা, যেগুলোর মাধ্যমে তাদের কিছু অর্থের জোগান হতো। কিন্তু এ নীতি পরিশেষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হয়, যা ছিল তাদের সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ।

আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলে এ অর্থনৈতিক নীতির প্রভাব প্রকাশ পায়। হাজ্জাজের শাসনামলে তা প্রকট আকার ধারণ করে। তবে ইতঃপূর্বে রাষ্ট্র মাওয়ালিদের মাসিক ভাতা প্রদান করত। যেমন, মুআবিয়া রাযি. তাদের জন্য মাসিক ১৯ দিরহাম নির্ধারণ করেন। আবদুল মালিক তা বাড়িয়ে ২০ দিরহাম করেন। সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের যুগে তা বেড়ে ২৫ দিরহাম হয়। হিশাম বিন আবদুল মালিকের যুগে তা ৩০ দিরহামে উন্নীত হয়। এ সবকিছু প্রমাণ করে—শুরু যুগে মাওয়ালিদের অবস্থান ভালো ছিল এবং তাদের যথেষ্ট সমীহ করা হতো।

কিন্তু হাজ্জাজ চিন্তা করলেন, বিজিত অঞ্চলসমূহের অধিবাসীরা অধিকহারে ইসলাম গ্রহণের ফলে ধীরে ধীরে জিযয়ার পরিমাণ কমে আসছে, অর্থনীতির জন্য হুমকিস্বরূপ। এ চিন্তা করে তিনি নওমুসলিমদের ওপর জিযয়া অব্যাহত রাখার বিধান জারি করেন। তাদের ইসলাম গ্রহণের ফলে বাইতুল মালের আয়ের অন্যান্য উৎস যেমন, জমির মালিকানা ও খারাজ (ভূমিকর) কমতে থাকে। কারণ, খারাজি ভূমির মূল মালিকানা ছিল মুসলিমদের। আর ইসলাম গ্রহণের কারণে তা উশরি ভূমিতে রূপান্তরিত হয়। তার অর্থ দাঁড়ায়, জিযয়ার

মতো খারাজও হ্রাস পাবে।[৩৮০] ফলে হাজ্জাজ জিযয়ার মতো নওমুসলিমদের ওপর খারাজও বহাল রেখে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করেন।

এরপর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরেকটি বিবর্তন দেখা দেয়। আর তা হলো—গ্রামের লোকেরা সরকারি অনুদান লাভ ও অর্থনৈতিক নব জোয়ার থেকে উপকৃত হওয়ার আশায় শহরে গিয়ে পাড়ি জমায়। এ সকল মুহাজিররা শহরের আশপাশে নতুন নতুন বসতি গড়ে তুলে। এসব এলাকা বিশালসংখ্যক কর্মহীন লোকের পদচারণায় ভরে ওঠে। তারা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অসন্তুষ্ট ছিল, যা তাদের আলাভি ও আব্বাসিদের কোলে ঠেলে দেয়। উমাইয়া শাসন ক্রমবর্ধমান এ হিজরতের ধারা বন্ধ করা আবশ্যক মনে করে। এদিকে আব্বাসিরা উমাইয়াদের প্রতি মাওয়ালিদের অসন্তোষকে আব্বাসি অভ্যুত্থানের স্বার্থে ব্যবহার করে।

আর সামাজিক অঙ্গনের অবস্থা ছিল—মাওয়ালিরা ইরাক ও খোরাসান অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল। কেননা, ইসলামের বিজয় প্রাচীন বর্ণবাদ প্রথার অবসান ঘটিয়ে তদস্থলে শ্রমিক, কারিগর ও কৃষক শ্রেণিকে ব্যাপক স্বাধীনতা প্রদান করে। তাদের এ স্বাধীনতা ও ইসলামে প্রবেশের সুবাদে তাদের থেকে আরেকটি মধ্যবর্তী শ্রেণির সৃষ্টি হয়, যারা শহরে বসতি গড়ে প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করে ও ইসলামি সভ্যতায় নিজেদের রাঙিয়ে তোলে। অল্প সময়ের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ইসলামি ফিকহ ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করে। তখন তাদের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, তাদের অবস্থান আরবদের থেকে কোনো অংশে কম নয়। এ নতুন শ্রেণিটিই ছিল আব্বাসি অভ্যুত্থানের ভিত্তিস্বরূপ। তারাই ভবিষ্যতে আব্বাসি শাসনের ক্ষেত্র তৈরি করে।[৩৮১]

পাঁচ. আদর্শিক দ্বন্দ্ব

যে-সকল বিষয় উমাইয়া শাসনকে দুর্বল করে তার পতন ঘটিয়েছে—খেলাফত সম্পর্কিত বিরোধ ছিল সেগুলোর অন্যতম। উমাইয়া শাসনামলে রাজনৈতিক অঙ্গনে চারটি বিবদমান দলের অস্তিত্ব পাওয়া যায় : ১. বনু উমাইয়ার সহযোগী দল, যাদের অধিকাংশই ছিল সুন্নি। ২. আলাভিদের সহযোগী দল, যারা খেলাফতকে আলি ইবনে আবু তালেবের বংশধরদের

---

৩৮০. *আল-আলামুল ইসলামি ফিল আসরিল আব্বাসি*, মাহমুদ ও শরিফ, পৃ. ৩২।

৩৮১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৫

জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। এরা উমাইয়া শাসনের দীর্ঘকালজুড়ে বিরোধিতার ঝান্ডা ধারণ করে ছিল। ৩. আব্বাসিদের দল, যারা উমাইয়া শাসনের শেষদিকে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে এবং উমাইয়া ও আলাভিদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ৪. খারেজি সম্প্রদায়, যারা রাজতন্ত্র বা উত্তরাধিকারসূত্রে শাসনক্ষমতা লাভের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। তাদের বিশ্বাস ছিল—খেলাফত একটি সর্বজনীন বিষয়। কাজেই মুসলিম উম্মাহ স্বাধীনভাবে তাদের খলিফা নির্বাচন করবে। এ দলটি শাসকদের অনাচার ও লোভ-লালসার প্রতি তাদের অসন্তোষ ও ঘৃণা প্রকাশ করে।

এ আদর্শিক দ্বন্দ্বের কারণে বহু রক্তাক্ত সংঘাতের ঘটনা ঘটে। যা উমাইয়াদের উদ্যমে ভাটা ফেলে তাদের অনেকাংশে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে এবং তাদের শক্তি বিনাশ করে। আব্বাসিরা এ সবকিছুর সুযোগ গ্রহণ করে এবং তাদের সমর্থকরা মানুষের মধ্যে দ্বীনি চেতনা ছড়িয়ে দিয়ে নিজেদের পক্ষে জনসমর্থন অর্জনে সক্ষম হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

আব্বাসি শাসনামল[৩৮২]

[৩৮২]. আব্বাসি সাম্রাজ্যের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন আমার রচিত গ্রন্থ—*তারিখুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যাহ*।

আব্বাসিদের প্রথম যুগ

(১৩২-২৩২ হি./৭৫০-৮৪৭ খ্রি.)

আব্বাসিদের প্রথম যুগের খলিফাগণ ও তাদের শাসনকাল

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ আস-সাফফাহ	১৩২-১৩৬ হি./৭৫০-৭৫৪ খ্রি.
আবদুল্লাহ আবু জাফর আল-মানসুর	১৩৬-১৫৮ হি./ ৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.
আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আল-মাহদি	১৫৮-১৬৯ হি./ ৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.
আবু মুহাম্মাদ মুসা আল-হাদি	১৬৯-১৭০ হি./ ৭৮৫-৭৮৬ খ্রি.
আবু জাফর হারুনুর রশিদ	১৭০-১৯৩ হি./ ৭৮৬-৮০৯ খ্রি.
আবু মুসা মুহাম্মাদ আল-আমিন	১৯৩-১৯৮ হি./৮০৯-৮১৩ খ্রি.
আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-মামুন	১৯৮-২১৮ হি./৮১৩-৮৩৩ খ্রি.
আবু ইসহাক মুহাম্মাদ আল-মুতাসিম	২১৮-২২৭ হি./৮৩৩-৮৪১ খ্রি.
আবু জাফর হারুন আল-ওয়াসিক	২২৭-২৩২ হি./৮৪১-৮৪৭ খ্রি.

এ যুগের সার্বিক পরিস্থিতি

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ আস-সাফফাহের খেলাফতের মাধ্যমে এ যুগের সূচনা এবং ওয়াসিকের খেলাফতের মাধ্যমে এর সমাপ্তি। এ যুগের খেলাফতের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল—শক্তিমত্তা ও পূর্ণ স্বাধীনতা। এ ছাড়াও তখন খলিফা কর্তৃক সাম্রাজ্যের ওপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তারা ছিলেন ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনন্য ক্ষমতার অধিকারী। এসবের মধ্য দিয়ে তারা সাম্রাজ্যের ঐক্য অটুট রাখতে ও বিশৃঙ্খলা দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ যুগে পারসিকরা শাসনব্যবস্থায় ঈর্ষণীয় অবস্থান লাভ করে। রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদের বিরাট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনকি পরিশেষে তারা বাগদাদ ও তাদের অনুগত অঞ্চলগুলোর প্রশাসন ও সামরিক বিভাগের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। যেমন, পারসিকদের মধ্য থেকেই উজির, কেরানি ও প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত হতে দেখা যায়। সেনা সদস্যরাও খেলাফতের সহযোগী ও খলিফাদের অনুগত বাহিনী হিসেবে কাজ করে। তখন খলিফাগণ নিজেরাই সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করতেন। আবুল আব্বাস, মানসুর, মাহদি, হাদি, রশিদ, আল-আমিন, মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিক—এদের প্রত্যেকেই এ যুগের প্রতিনিধিত্বকারী খলিফা।

আব্বাসি খেলাফতের প্রতিষ্ঠা

আবু মুসলিম খোরাসানির প্রচেষ্টায় খোরাসানে 'আব্বাসি বিপ্লব' যেন পূর্ণতা পাচ্ছিল না। ইতোমধ্যে উমাইয়া সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাতে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব হয়। আব্বাসীয়দের সেনাপ্রধান হাসান বিন কাহতাবা বিন শাবিব কুফায় প্রবেশ করতে সক্ষম হন। তিনি আব্বাসিদের পক্ষে প্রধান দাওয়াত প্রচারকারী আবু সালামা খাল্লালকে আহলে বাইতের উজির হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। বিপ্লবের সহযোগীরা ইরাকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর আহলে বাইত থেকে একজন নেতা নির্বাচনের সময় হয়। কেননা, আহলে বাইতের নামেই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। আন্দোলনের নেতা হিসেবে ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি আন্দোলনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে পত্রবিনিময় করতে থাকেন। একটি পত্র মারওয়ানের হাতে পৌঁছলে তার সামনে ইবরাহিমের আসল চেহারা ফাঁস হয়ে যায়। অতঃপর মারওয়ান তাকে আটক করে এবং হত্যা করে। তিনি মৃত্যুর পূর্বে তার সহোদর আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদকে আন্দোলনের

নেতৃত্ব প্রদানের অসিয়ত করেন। অতঃপর আবুল আব্বাস ১২ রবিউস সানি ১৩২ হি./অক্টোবর ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে হামিমা থেকে কুফায় পৌঁছলে সেখানে লোকজন তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে।[৩৮৩] কিন্তু তার খেলাফতকাল শুরু হয় ২৭ জিলহজ ১৩২ হি./আগস্ট ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে সর্বশেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান হত্যার পর থেকে। আর তখনই আব্বাসি খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আব্বাসি খেলাফতের সাধারণ নীতি

আব্বাসি খেলাফত তার সূচনাকাল থেকেই স্পষ্টরূপে প্রাচ্যনীতির অনুসরণ করে এবং খোরাসানের প্রতি বিশেষ নজরদারি করে। বেশ কিছু কারণে তারা এ নীতি গ্রহণ করে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো : ১. আব্বাসিদের প্রতি সিরিয়াবাসীর বিরোধিতা। ২. দামেশক থেকে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তর। ৩. আব্বাসীয় জীবনযাত্রা ও শাসনব্যবস্থার ওপর পারসিকদের প্রভাব। ৪. লেভেন্টাইন বাণিজ্যের উত্থান। ৫. ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হতে আব্বাসি সাম্রাজ্যের দূরত্ব এবং ৫. উমাইয়া নৌবাহিনীর মোকাবেলার জন্য ভূমধ্যসাগরে নৌবাহিনী গঠনের প্রতি আব্বাসিদের গুরুত্ব প্রদান না করা।

আব্বাসি শাসনকালের শ্রেণিবিন্যাস

ঐতিহাসিকগণ আব্বাসি শাসনকালকে খেলাফতের সক্ষমতা, রাজনৈতিক অবস্থার উত্তরণ এবং সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধির দিক বিবেচনা করে চারভাগে বিভক্ত করেছেন : ১. ক্ষমতা, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির যুগ। ২. তুর্কি আধিপত্যের যুগ। ৩. পারসিক বুওয়াইহি আধিপত্যের যুগ এবং ৪. সালজুকি তুর্কি আধিপত্যের যুগ।

* * *

---

৩৮৩. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ৫২।

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ আস-সাফফাহ

(১৩২-১৩৬ হি./৭৫০-৭৫৪ খ্রি.)

সাফফাহি যুগের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

আবুল আব্বাস ছিলেন উদার, গাম্ভীর্যপূর্ণ, বুদ্ধিমান, অতিশয় লাজুক স্বভাব ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। তিনি পুরুষদের সঙ্গে গল্পগুজব ও আলেমদের সাক্ষাৎ পছন্দ করতেন। এ ছাড়াও তিনি সাহিত্য ও সংগীতের প্রতি উৎসাহ জোগাতেন। তিনি কবি ও শিল্পীদের জন্য বিপুল পরিমাণ ভাতার ব্যবস্থা করেন।[৩৮৪] উদার স্বভাবের কারণে তাকে সাফফাহ উপাধি দেওয়া হয়।[৩৮৫] পুরো শাসনামলজুড়ে তিনি উমাইয়াদের ভান্ডার খালি করার কাজে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি বিক্ষুব্ধ শহরগুলোতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে কয়েক মাস অনবরত সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন এবং তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী আবু সালামাহ খাল্লালকে হত্যা করেন।[৩৮৬]

সাফফাহি যুগের বৈদেশিক পরিস্থিতি

পূর্ব দিকের ফ্রন্ট

মাওয়ারা-উন-নাহরের দেশগুলো চীনাদের আক্রমণের কারণে বড় হুমকির মুখে পড়ে। মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও পশ্চিম তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনের কারণে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, এর সুযোগে তারা এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। মুসলিম ও চীনাদের মধ্যকার এ দ্বন্দ্বে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত ছিল। চীনারা এই অঞ্চলে স্বল্পকালীন আধিপত্য বিস্তারে সক্ষমও হয়। তারা ফারগানা অধিকার করে শাশ আক্রমণ

---

৩৮৪. *আল-ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়্যাহ ওয়াদ দুওয়ালিল ইসলামিয়্যাহ*, ইবনুত তিকতাকা, পৃ. ১২৪।

৩৮৫. *সুওয়ার ও বুহুস মিনাত তারিখিল ইসলামি*, আবদুল হামিদ আল-আব্বাদি, খ. ২, পৃ. ৭০।

৩৮৬. *কিতাবুল ওয়াযারা ওয়াল কুত্তাব*, জাহশিয়ারি, পৃ. ৯০।

করে। এরপর চীনারা তাদের সিংহাসন নিয়ে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার কারণে মাওয়ারা-উন-নাহরের দেশগুলোতে আর অগ্রসর হতে পারেনি। ১৩৩ হিজরির জিলহজ/৭৫১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে মুসলিম ও চীনাদের মধ্যে তিরাজের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটিকেই আব্বাসীয় শাসনাধীন এই সমৃদ্ধ অঞ্চলে চীনাদের সর্বশেষ উপনিবেশ হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩৮৭]

বাইজেন্টাইন ফ্রন্ট

বাইজেন্টাইনরা উমাইয়াদের থেকে আব্বাসিদের হাতে ইসলামি শাসনের পালাবদল এবং দামেশক থেকে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরের কারণে মুসলিম সাম্রাজ্যে চলমান বিশৃঙ্খলাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। তারা উত্তর সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ করে। বাইজেন্টাইন সম্রাট পঞ্চম কনস্টান্টাইন (Constantine) সিরিয়া ও জাজারের সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে হামলা করে সেখানকার শহর ও দুর্গগুলো দখল করে নেয়। অনুরূপ তারা আর্মেনিয়া আক্রমণ করে আরদ্রুম (Erzurum), ফোরাত নদীর তীরবর্তী কামাখ, হাদাস ও মালাতিয়্যা দখল করে নেয় এবং সামিসাতের দুর্গ ধ্বংস করে।[৩৮৮] এ সবকিছুর কারণে ইসলামি সীমান্ত ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। খেলাফত ব্যবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হওয়ার পর মুসলিমদের পক্ষ থেকে বাইজেন্টাইনদের জবাবদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন অভিযানসমূহ পরিচালনা করা হয়।[৩৮৯] সর্বোপরি উভয় পক্ষের এ সামরিক উত্তেজনাকে 'সীমান্ত যুদ্ধ' বলে অভিহিত করা যায়।[৩৯০]

সাফফাহি যুগের মন্ত্রণালয়

আব্বাসি সৈন্যরা উমাইয়া সৈন্যদের ওপর বিজয় লাভের পরপরই আবুল আব্বাসের হাতে বাইআত হওয়ার পূর্বে ইসলামি শাসনব্যবস্থায় প্রথম মন্ত্রিত্বের প্রথা চালু করা হয়। এটি ছিল পারসিকদের প্রাচীন প্রশাসন-নীতির একটি অংশ।[৩৯১] প্রকাশ থাকে যে, আবুল আব্বাস মন্ত্রিপরিষদের বিষয়টি

---

৩৮৭. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৫, পৃ. ৪০; *তুর্কিস্তান মিনাল ফাতহিল আরাবি ইলাল গাযবিল মুগোলি*, বারথোল্ড, পৃ. ৩১৪-৩১৬।

৩৮৮. *তারিখু খলিফা ইবনি খায়্যাত*, খ. ২, পৃ. ৪৩৫-৪৩৬।

৩৮৯. *খুতাতুশ শাম*, মুহাম্মাদ কুরদ, খ. ৫, পৃ. ১৬।

৩৯০. History of Byzentine States : Ostrogorsky. p. 169

৩৯১. *দোহাল ইসলাম*, আহমদ আমিন, খ. ১, পৃ. ১৬৫; *আন-নুযুমুল ইসলামিয়্যা*, শায়েখ সুবহি, পৃ. ২৯৬

অনুমোদনের সময় রাজধানীকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মূলত পারসিকদের উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে এ কার্য সম্পন্ন হয়।

আস-সাফফাহের মৃত্যু

১৩৬ হি./৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে আবুল আব্বাস পরবর্তী খলিফা হিসেবে তার ভাইয়ের নাম এবং তারপরে ঈসা বিন মুসা বিন মুহাম্মাদের নাম ঘোষণা করেন। এরপর আনবারে অবস্থানকালে তিনি গুটিবসন্তে আক্রান্ত হন এবং ১৩ জিলহজ ১৩৬ হি. মোতাবেক ৯ জুন ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। আনবারে তার প্রাসাদের মধ্যেই তাকে দাফন করা হয়।[৩৯২]

* * *

[৩৯২]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৭, পৃ. ৪৭০-৪৭১

আবদুল্লাহ আবু জাফর মানসুর

(১৩৬-১৫৮ হি./৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)

মানসুরের শাসনামলে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

আবদুল্লাহ বিন আলির অবাধ্যতা

আবু জাফর মানসুর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ভিত মজবুত হতে না হতেই তিনি খেলাফতের দাবিদার আপন চাচা আবদুল্লাহ বিন আলি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কা করেন। এমনিভাবে আবু মুসলিম খোরাসানির প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং তার চাচাতো ভাই আলি ইবনে আবু তালেবের বংশধরদের বিদ্রোহের আশঙ্কাও তাকে সন্ত্রস্ত করে তোলে।

মানসুর ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, উঁচু হিম্মতের অধিকারী, কৌশলী ও বিচক্ষণ পুরুষ। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এ সকল সমস্যার মোকাবেলা করেন এবং রাজনৈতিক অঙ্গনকে শত্রুমুক্ত করেন।

আবদুল্লাহ বিন আলিকে প্রয়াত খলিফা আবুল আব্বাস বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একটি বাহিনীর সেনাপতি করে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি আলেপ্পোর নিকটবর্তী দালুকে পৌঁছে খলিফার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন। এরপর তিনি আর সামনে অগ্রসর না হয়ে হাররানে ফিরে আসেন। তখন সৈন্যরা তার হাতে খেলাফতের বাইআত হয়। অতঃপর তিনি জাজিরার দিকে গমন করেন। খলিফা মানসুর আবু মুসলিমকে সেনাপতি করে তার মোকাবেলার জন্য প্রেরণ করেন। এ সেনাপতি নুসাইবিনের নিকটে আবদুল্লাহ বিন আলিকে পরাজিত করে তাকে বন্দি করেন। অতঃপর খলিফা মানসুর ১৪৭হি./৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তাকে হত্যা করেন।[৩৯৩]

আবু মুসলিম খোরাসানির পরিণতি

আবু মুসলিম খোরাসানি নিজেকে আব্বাসি সাম্রাজ্যের আসল প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করতেন। এ ধারণা থেকে তিনি খোরাসান ও পারস্যের দেশগুলোতে এককভাবে স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। তার অবস্থান আবুল

---

৩৯৩. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৩০২; *তারিখে তাবারি*, খ. ৭, পৃ. ৪৭৪, খ. ৮, পৃ. ৭-৯।

আব্বাসের জন্য দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কিন্তু আব্বাসিদের তরে তার অসামান্য অবদানের কারণে খলিফা তাকে কিছুই বলতে পারেননি। কিন্তু মানসুর তার ব্যাপারে ভিন্ন নীতি অবলম্বন করেন। তিনি যখন দেখলেন, আবু মুসলিম আব্বাসি খেলাফত থেকে স্পষ্ট দূরত্ব রক্ষা করে চলেছেন এবং আব্বাসিদের জন্য রীতিমতো আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তখন তিনি কৌশলে তাকে নিজের কাছে ডেকে এনে হত্যা করেন। ২৫ শাবান ১৩৭ হি./১৩ ফেব্রুয়ারি ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।[৩৯৪]

আবু মুসলিমের হত্যা-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া

আবু মুসলিমের মৃত্যুর পর তার স্মৃতি পারসিকদের মধ্যে সজীব ছিল। তার হত্যার পর খোরাসানে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন আন্দোলন মাথাচাড়া দেয়। অগ্নিপূজকদের একটি দল এসব আন্দোলন পরিচালনা করে। তারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করে। নিজেদের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি ও পারস্য বর্ণবাদের বিষয়টি গোপন করে। তারা আব্বাসি শাসনের বিরোধিতা ও তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য আবু মুসলিমের হত্যাকাণ্ডকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এসব আন্দোলনের মধ্যে সিনবাদ, রাওয়ানদিয়্যা ও উস্তাজসেসের আন্দোলন অন্যতম। খলিফা মানসুর সফলতার সঙ্গে তাদের মোকাবেলা করেন এবং তাদের নির্মূল করেন।[৩৯৫]

আলাভিদের সঙ্গে সম্পর্ক

কারবালায় হুসাইন হত্যার পর আলাভিরা খেলাফতের বিষয়ে তাদের অধিকারের কথা ভুলে যায়নি। যখন আব্বাসিদের পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়, তখন অনেক আলাভি এটাকে তালেবি (আবু তালেব) আন্দোলন মনে করে তাতে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু বিপ্লব শেষ হওয়ার পর যখন খেলাফত আব্বাসিদের হাতে চলে যায়, তখন তারা বিশেষত হুসাইনি শাখার লোকেরা বুঝতে পারে—আসলে আব্বাসিরা তাদের সাথে প্রতারণা করেছে। তারা অধিক হকদার হওয়া সত্ত্বেও নিজেরাই খেলাফতের মসনদ দখল করেছে। আব্বাসিরা তাদের শাসনকালের শুরুতে উদীয়মান সাম্রাজ্যের ভিতকে সুদৃঢ় করতে আলাভিদের সাথে মিলেমিশে কাজ করার চেষ্টা করে। কিন্তু

---

[৩৯৪]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৭, পৃ. ৪৯০-৪৯১।

[৩৯৫]. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৫, পৃ. ৬৬-৬৭, ৮৬-৮৭, ১৬২-১৬৪।

পরবর্তীকালে দুপক্ষের মধ্যে ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়তে থাকে। আলাভিদের মধ্য থেকে 'আন-নাফসুয যাকিয়্যা' (পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী) নামে পরিচিত মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান আব্বাসি শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেন। তিনি মদিনায় বিদ্রোহের ঘোষণা দেন। তারপর তার ভাই ইবরাহিম পূর্বপ্রান্তে বিদ্রোহ করেন। আহওয়াজ, পারস্য ও মাদায়েনবাসীরা তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। তখন হুসাইনি শাখার সদস্য ইমাম জাফর সাদিক সন্ধি করতে মনস্থ করেন। খলিফা মানসুর মুহাম্মাদকে গ্রেফতার করেন এবং ১৪৫ হিজরির রজব/৭৬২ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাকে হত্যা করেন। অনুরূপভাবে ইবরাহিমকে কুফার অন্তর্গত বাখামরা গ্রামে হত্যা করেন। ১৪৫ হিজরির জিলকদ মোতাবেক ৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।[৩৯৬]

মানসুরের যুগে বৈদেশিক পরিস্থিতি

বাইজেন্টাইনদের সাথে সম্পর্ক

আবু জাফর মানসুরের শাসনামলে মুসলিম ও বাইজেন্টাইনদের মধ্যকার যুদ্ধ সন্ধিতে রূপ নেয়। এ কারণে তখন সীমান্তে পূর্বের মতো উত্তেজনা দেখা যায়নি। এ সুযোগে আব্বাসিরা নিজেদের কেন্দ্র সুসংহত করার প্রতি মনোযোগী হয়। বিপরীতে বাইজেন্টাইন সম্রাট পঞ্চম কনস্টান্টাইন একদিকে বলকানের অন্তর্গত বুলগেরিয়ার সাথে যুদ্ধের প্রতি মনোনিবেশ করেন, অপরদিকে আয়কুনাতের (খ্রিষ্টানদের মূর্তি) উপাসনা-সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সুযোগে আবু জাফর মানসুর ধ্বংস হয়ে যাওয়া দুর্গ ও সীমান্ত প্রাচীরগুলো পুনর্নির্মাণ করেন।

বাগদাদ শহর নির্মাণ

খলিফা আবু জাফর মানসুর বাগদাদ শহর নির্মাণ করেন, যেখানে এসে সারাত ও দজলা নদী মিলিত হয়েছে। এ শহর নির্মাণের পেছনে রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিভিন্ন কারণ জড়িত

---

৩৯৬. *তারিখে তাবারি*, খ. ৭, পৃ. ৫৯৬, ৬৪৬-৬৪৭; *মাকাতিলুত তালিবিন*, ইসফাহানি, পৃ. ২৩৬-২৩৭।

ছিল। এটি ছিল খলিফা মানসুরের অন্যতম কীর্তি, আব্বাসি খেলাফতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[৩৯৭]

মানসুর ১৪৫ হি. মোতাবেক ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানীর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। পুরো চার বছর যাবৎ এ কাজ চলমান থেকে ১৪৯ হি. মোতাবেক ৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হয়। মুঘলদের কাছে ৬৫৬ হি./১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে পতনের আগ পর্যন্ত বাগদাদ শহরটি আব্বাসি খেলাফতের রাজধানী ছিল।

মানসুরের মৃত্যু

আবু জাফর মানসুর হজব্রত পালনের জন্য মক্কার উদ্দেশে গমন করছিলেন। পথিমধ্যে ১৫৮ হিজরির ৭ জিলহজ/৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ অক্টোবর তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি চাচাতো ভাই ঈসা ইবনে মুসাকে যুবরাজের পদ থেকে বরখাস্ত করে নিজ পুত্র মাহদির পক্ষে বাইআত গ্রহণ করেন।[৩৯৮]

* * *

[৩৯৭]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৭, পৃ. ৬১৬; *তারিখু বাগদাদ*, খতিবে বাগদাদি, খ. ১, পৃ. ২৫-২৬, ৬৬-৬৭, ৭৭-৮২; *মুজামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ৪৫৬-৪৫৭; *দাইরাতুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ*, খ. ৪, পৃ. ৩-৪।

[৩৯৮]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৭, পৃ. ৫৭৭, খ. ৮, পৃ. ৬০।

আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ মাহদি

(১৫৮-১৬৯হি./৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.)

মাহদির সংস্কারকর্ম

মাহদির পূর্ববর্তী আব্বাসি খলিফাগণ কঠোর শাসন ও দমন-নীতির অনুসরণ করতেন। কিন্তু তিনি সাম্য ও কোমলতার নীতি অনুসরণ করেন। এ কারণে তার শাসনকালকে পরিবর্তনের যুগ বলে অভিহিত করা হয়। তিনি মানুষের মন জয় করে তার খেলাফতকালের সূচনা করেন। তার পিতার শাসনামলে বাজেয়াপ্ত সমুদয় সম্পদ তিনি সেসবের মালিকদের কাছে প্রত্যার্পণ করেন। বহু রাজবন্দিকে মুক্ত করেন এবং হিজাজবাসীদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন। আবু জাফর মানসুর সিরিয়া ও মিসর থেকে যেসব খাদ্যশস্য অধিগ্রহণ করেছিলেন, তিনি সেগুলো ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তিনি সিরিয়াবাসীদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে দামেশক ও বাইতুল মুকাদ্দাস জিয়ারত করেন। এ ছাড়াও মক্কার পথে বিভিন্ন সরাইখানা ও কাফেলার পানি পানের জন্য হাউজ নির্মাণ করেন। কুষ্ঠরোগী ও কয়েদিদের জন্য ভাতা বরাদ্দ করেন। বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি গুরুত্বের অংশ হিসেবে তিনি বাণিজ্যিক বন্দর নির্মাণ করেন, ফলে বাগদাদ আন্তর্জাতিকমানের বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। সংগীত, দর্শন ও সাহিত্য ছিল তার শাসনকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি কাবা শরিফে প্রতিবছর নতুন গিলাফ পরানোর প্রথা চালু করেন। মজলুমদের অভিযোগ তিনি নিজে সরাসরি শুনতেন। ভুক্তভোগীদের অভিযোগপত্র দাখিলের জন্য তিনি এক জানালা বিশিষ্ট কামরা তৈরি করেন।[৩৯৯]

---

৩৯৯. *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ১১৮-১১৯, ১৫৬; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৫, পৃ. ২৫৪-২৫৮; *আল-ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়্যাহ ওয়াদ দুওয়ালিল ইসলামিয়্যাহ*, ইবনুত তিকতাকা, পৃ. ১৭৯।

মাহদির শাসনামলে রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনসমূহ

ধর্মদ্রোহীদের আন্দোলন

উমাইয়া শাসনকাল থেকেই মুসলিম সমাজে ধর্মদ্রোহীদের তৎপরতা ছড়িয়ে পড়ে। আব্বাসি শাসনকালে তাদের দৌরাত্ম্য অনেক বেড়ে যায়। এ ধর্মদ্রোহীদের মূলে ছিল অগ্নিপূজকদের একটি দল। পরে নাস্তিক ও দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীরাও তাতে যোগ দেয়। এরপর এটি শুউবি তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়।[৪০০] আব্বাসীয় প্রশাসন তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিপক্ষদের দমন করতে এ পরিভাষাটি ব্যবহার করে। পরিশেষে একদল দুশ্চরিত্র, লম্পট ও চতুর লোকের ওপর এ শব্দের প্রয়োগ হতে দেখা যায়।[৪০১]

মূলত ধর্মদ্রোহীদের এ আন্দোলনটি ছিল ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোর আবরণে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। এর অনুসারীদের লক্ষ্য ছিল—ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তে মানি ধর্মবিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়া। অগ্নিপূজকদের পরিকল্পনা ছিল—এ আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামি সাম্রাজ্যের মূলোৎপাটন করে তার স্থলে পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।[৪০২]

ধর্মদ্রোহীদের এ আন্দোলনের কারণে দ্বীন ও সাম্রাজ্য বিরাট হুমকির সম্মুখীন হয়। মাহদি এ বিষয়টি উপলব্ধি করে তাদের ওপর অনবরত অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাদের সকলকে ধরে ধরে হত্যা করেন। এমনকি এদের জন্য স্বতন্ত্র একটি দফতর প্রতিষ্ঠা করে ধর্মতত্ত্ববিদদেরকে তাদের মতবাদ খণ্ডনের নির্দেশ প্রদান করেন।[৪০৩]

মুকান্নার আন্দোলন

মাহদির যুগে নাস্তিকদের তৎপরতা অব্যাহত থাকে। ফলে বেশ কিছু সরকারবিরোধী আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। যেগুলো উদ্দেশ্য বিবেচনায় পূর্বের আন্দোলন থেকে অভিন্ন। তন্মধ্যে একটি আন্দোলন হলো, মুকান্না

---

৪০০. শুউবি অন্দোলন বলতে বুঝায়—অনারবদের আন্দোলন, যারা নিজেদেরকে আরবদের থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করত।—অনুবাদক

৪০১. *আত-তারিখুল ইসলামি ওয়া ফিকরুল কারনিল ইশরিন*, ফারুক উমর, পৃ. ১১৩-১১৪।

৪০২. *আত-তাফকির ফারিযাতুন ইসলামিয়্যা*, আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ, পৃ. ৬৭।

৪০৩. *কিতাবুল ওয়াযারা ওয়াল কুত্তাব*, জাহশিয়ারি, পৃ. ১৬৫; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ১৪৯; *আত-তারিখুল ইসলামি ওয়া ফিকরুল কারনিল ইশরিন*, ফারুক উমর, পৃ. ১১৯-১২২।

খোরাসানির আন্দোলন। যে আরবভিত্তিক ইসলামি শাসনকে মূলোৎপাটন করে তার স্থলে পারসিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আত্মপ্রকাশ করে। মাহদি তার মোকাবেলা করেন এবং তার আন্দোলনের অবসান ঘটান। এদিকে মুকান্না গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দেয়।

মাহদির যুগে এ আন্দোলনের সদৃশ আরও অনেক আন্দোলন মাথাচাড়া দেয়। তিনি সেসব দমন করতে সমর্থ হন, তন্মধ্যে খোরাসানে ইউসুফ আল-বার্‌মের আন্দোলন অন্যতম।[৪০৪]

বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে সম্পর্ক

মাহদির যুগে ইসলামি ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমান্তযুদ্ধ চলমান থাকে। উভয় পক্ষ থেকে হামলা, পালটা হামলা চালানো হয়। কিন্তু তাতে ভৌগোলিক সীমারেখায় কোনো পরিবর্তন হয়নি। উল্লেখ্য যে, বাইজেন্টাইন সম্রাট চতুর্থ লিওয়ের মৃত্যু এবং তার স্ত্রী ইরিনের সিংহাসনে আরোহণের কারণে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে মাহদি নিজ পুত্র হারুনের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করেন। হারুন বাইজেন্টাইন ভূখণ্ডের অনেক ভেতরে প্রবেশ করে কনস্টান্টিনোপল উপসাগরের নিকট পৌঁছে যান এবং বাইজেন্টাইন রাজধানী ধ্বংস করেন। তখন সম্রাজ্ঞী ইরিন অবস্থা বেগতিক দেখে সন্ধি করতে বাধ্য হন এবং হারুনের শর্তসমূহ মেনে নেন। এ সন্ধিতে প্রতিবছর ৭০ হাজার দিনার কর প্রদান, বন্দি বিনিময় ও তিন বছর সন্ধি বলবৎ থাকার শর্ত করা হয়।[৪০৫]

মাহদির মৃত্যু

মুহাম্মাদ মাহদি ১৬৯ হিজরির মহররম (৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট) মাসে মৃত্যুবরণ করেন। ইতঃপূর্বে তিনি নিজ পুত্রদ্বয় হাদি ও তার পরে হারুনুর রশিদকে যুবরাজ ঘোষণা করেন।[৪০৬]

* * *

[৪০৪]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ১২৪, ১৩৫; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৫, পৃ. ২১১-২১২, ২১৬।

[৪০৫]. *খলিফা ইবনু খায়্যাত*, খ. ২, পৃ. ৪৭১; *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ১৫২-১৫৩;, *আর-রোম ফি সিয়াসাতিহিম ওয়া হাযারাতিহিম ওয়া দীনিহিম ওয়া ছাকাফাতিহিম*, আসাদ রুস্তম, খ. ১, পৃ. ২৯৫; Chronographia : Theophanes. P 920.

[৪০৬]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ১৬৮-১৭০।

আবু মুহাম্মাদ মুসা আল-হাদি

(১৬৯-১৭০ হি./৭৮৫-৭৮৬ খ্রি.)

মাহদি দীর্ঘকাল যাবৎ আলাভিদের সঙ্গে সন্ধিনীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই সন্ধিরও অবসান ঘটে। হাদি খেলাফতের মসনদে বসেই তাদের প্রতি কঠোরতা ও নির্দয় আচরণ করা শুরু করেন। তাদের জন্য পূর্ব হতে বরাদ্দকৃত ভাতা ও রেশন বন্ধ করে দেন। তাদের ব্যাপারে তথ্য তালাশ করতে থাকেন। গভর্নরদেরকে তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে ও তাদের দমিয়ে রাখতে নির্দেশ প্রদান করেন। এসব কারণে হিজাজে বসবাসরত আলাভিরা দুরবস্থার শিকার হয়। অতঃপর তারা হুসাইন বিন আলির নেতৃত্বে ১৩ জিলকদ ১৬৯ হিজরি (১৫ মে ৭৮৬ খ্রি.) তারিখে উমাইয়া শাসনের সাথে বিদ্রোহ করে। কিন্তু খলিফা হাদি ফাখ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তাদের নির্মূল করতে সক্ষম হন এবং হুসাইন ও তার অনুসারীদের হত্যা করেন।[৪০৭] হাদি নিজ পিতা মাহদির অনুসরণ করে ধর্মদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করেন।

হাদির মৃত্যু

হাদি বাগদাদে অবস্থানকালে ১২ রবিউল আউয়াল ১৭০ হি. মোতাবেক ৯ সেপ্টেম্বর ৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৪০৮]

* * *

---

৪০৭. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯; *মাকাতিলুত তালিবিন*, ইসফাহানি, পৃ. ৩৬৬।
৪০৮. *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ২০৫-২০৬।

আবু জাফর হারুনুর রশিদ

(১৭০-১৯৩ হি./৭৮৬-৮০৯ খ্রি.)

রশিদের গুণাবলি

রশিদকে আব্বাসি খলিফাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ খলিফা হিসেবে গণ্য করা হয়। তার প্রসিদ্ধি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমা সমাজ তার জীবনী নিয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে। ইউরোপের অনেক রাজাবাদশা তার নৈকট্য ও প্রীতি অর্জনের চেষ্টা করে। রশিদ বিচিত্র গুণের অধিকারী ছিলেন। ছিলেন দক্ষ রাজনীতিবিদ, যার মধ্যে মানসুরের সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে কোমলতা ও বদ্যান্যতার মিশ্রণ ছিল। তিনি প্রজাদের বিষয়ে ছিলেন সদা তৎপর। সূক্ষ্ম অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ মেজাজের অধিকারী এবং সংবেদনশীল। কখনো তিনি রাগে টগবগ করতেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণে উতলা হয়ে যেতেন। আবার কখনো অন্তর বিগলিত হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিতেন। রশিদ ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, ধার্মিক ও মুত্তাকি। জীবনের একটি বড় অংশ তিনি হজ ও যুদ্ধে কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন কাব্যপ্রেমী ও সাহিত্যানুরাগী। এ ছাড়াও তিনি ফিকহচর্চা পছন্দ করতেন। তার শাসনকালকে আব্বাসি খেলাফতের স্বর্ণযুগ মনে করা হয়।

রশিদের যুগে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

আলাভিদের সাথে সম্পর্ক

রশিদ তার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে আলাভিদের সাথে কোমল আচরণ করে তাদের নিজের পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা করেন। সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করেন। কিন্তু তারা নিজেদের যে খেলাফতের অধিক হকদার মনে করত, এ দৃঢ়বিশ্বাস থেকে সরে আসেনি এবং খেলাফত লাভের সংগ্রাম থেকেও বিরত হয়নি। এ কারণে দুপক্ষের মধ্যে পুনরায় ভীষণ সংঘর্ষ বেধে যায়। ফাখের যুদ্ধে আলাভিদের দুজন নেতা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। তারা হলো, ইদরিস বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান ও তার ভাই ইয়াহইয়া। প্রথমজন আফ্রিকা গিয়ে তাঞ্জিয়ার প্রদেশে ঘাঁটি

গাড়েন এবং নিজের নামে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা ইদরিসি সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। আর দ্বিতীয়জন দায়লামে গিয়ে শক্ত অবস্থান তৈরি করেন। তার সমর্থক ও অনুসারীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। অতঃপর ১৭৬ হিজরিতে (৭৯২ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি বিদ্রোহের ঘোষণা করেন। রশিদ দুই ভাইকেই শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাদের তৎপরতা থেকে মুক্তি লাভ করেন। তবে তাদের মৃত্যুর পরও ইদরিসি সাম্রাজ্য অবশিষ্ট ছিল।[৪০৯]

খারেজিদের আন্দোলন

রশিদের শাসনামলে জাজিরায় খারেজিদের তৎপরতা অনেক বেড়ে যায়। তারা শরয়ি বিধান সম্পর্কে আব্বাসি খলিফাদের স্বেচ্ছাচারের বিরোধিতা করে। রশিদ এ দলটিকে নির্মূল করতে মনস্থ করেন। ইয়াযিদ বিন মাযিদ শায়বানির নেতৃত্বে ১৭৯ হিজরিতে (৭৯২ খ্রিষ্টাব্দ) একটি সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করেন। ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর তীরে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হলে খারেজিরা পরাজিত হয়।[৪১০]

উত্তর আফ্রিকার অরাজকতা

১৭১ হিজরি (৭৮৭ খ্রি.) খারেজি সম্প্রদায়, সেনাপতিবৃন্দ আমাজিগদের উত্থানকে কেন্দ্র করে উত্তর আফ্রিকায় চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অতঃপর রশিদ হারসামা বিন আয়ুনকে সেখানে প্রেরণ করেন এবং এ সকল বিশৃঙ্খলা নির্মূল করে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার আদেশ করেন। তিনি আপন উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হন। তবে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে নতুন নতুন আন্দোলন দানা বাঁধলে রশিদ যাবের শাসক ইবরাহিম ইবনুল আগলাবকে (১৮৪ হি. মোতাবেক ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে) আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইবনুল আগলাব সকল জটিলতা নিরসন করতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি কেন্দ্রীয় শাসন থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন আগলাবি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং কায়রাওয়ানকে এর রাজধানী ঘোষণা করেন।[৪১১]

---

[৪০৯]. *মাকাতিলুত তালিবিন*, ইসফাহানি, পৃ. ৪০১-৪০৪, ৪০৭-৪০৮।
[৪১০]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ২৫৬।
[৪১১]. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩১৪; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৫, পৃ. ৯-১০।

পূর্ব দিকের অরাজকতা

রশিদের কিছু মন্দনীতির কারণে পূর্ব দিকের দেশসমূহে জাতিগত আন্দোলন শুরু হয়। রাফে বিন লাইস বিন নাসর বিন সায়্যার ব্যক্তিস্বার্থের কারণে কেন্দ্রীয় শাসনের সাথে বিদ্রোহ করেন। খোরাসান ও মাওয়ারা-উন-নাহরের অধিবাসীরাও আব্বাসীয় নীতির প্রতি অসন্তোষের কারণে তার সাথে একাত্মতা পোষণ করে। এ নৈরাজ্য ঠেকাতে রশিদ নিজে খোরাসানের দিকে যাত্রা করেন, তবে পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়।[৪১২]

বারমাকিদের বিপর্যয়

বারমাকি পরিবার পারস্যের একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবার। তাদের পূর্বপুরুষ বারমাকের দিকে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে বারমাকি বলা হয়। বলখ শহরে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বাররক্ষককে এ উপাধি দেওয়া হতো।[৪১৩] আব্বাসি শাসনের শুরু ভাগে এ পরিবারের একজন সদস্য খালিদ বিন বারমাক খ্যাতি লাভ করেন। আবুল আব্বাস তাকে রাজস্ব ও সেনাবিভাগের দায়িত্ব প্রদান করেন।[৪১৪] আবু সালামা খাল্লাল নিহত হলে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন এবং মানসুরের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। খালিদের ঔরসে ইয়াহইয়া নামক এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়, যার সাথে হারুনুর রশিদের ইতিহাস জড়িত। খলিফা হাদি হারুনুর রশিদকে হটিয়ে তার পরিবর্তে নিজ পুত্র জাফরকে যুবরাজ ঘোষণা করতে চাইলে ইয়াহইয়া এর তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং রশিদকে যুবরাজ মনোনীত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। রশিদ ইয়াহইয়ার এ অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন করেন এবং তাকে ফরমান লেখক, ব্যক্তিগত সচিব ও মন্ত্রিত্বের মর্যাদা প্রদান করেন। এ ছাড়াও তাকে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করেন।[৪১৫] রাষ্ট্রের সকল বিভাগের দায়িত্ব তার হাতেই ন্যস্ত ছিল।[৪১৬] ইয়াহইয়া নিজ পুত্রদ্বয় ফজল ও জাফরের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশীদারত্ব নিশ্চিত করেন।

---

[৪১২]. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৩৮৬; *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ৩১৫-৩২০, ৩২৩, ৩৪৩-৩৪৪।

[৪১৩]. *আল-বাদউ ওয়াত তারিখ*, মাকদিসি, খ. ৬, পৃ. ১০৪।

[৪১৪]. *কিতাবুল ওয়াযারা ওয়াল কুত্তাব*, জাহশিয়ারি, পৃ. ৮৭-৮৯।

[৪১৫]. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৭৭।

[৪১৬]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ২৩৫।

বারমাকিরা রশিদকে ঘিরে শাসনকার্য পরিচালনা করে। রাষ্ট্রের অধিকাংশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিল তাদের অনুসারী বা দলভুক্ত। এমনকি এমন অনেক লোক রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োগ পায়, যাদের সঙ্গে খলিফার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাদের সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে গিয়ে তাকে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়।[৪১৭]

উল্লেখ্য যে, এ পরিবারের রাজনৈতিক উত্থান ছিল একটি সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত বিষয়। তাদের লক্ষ্য ছিল—রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি ও লুপ্ত পারসিক উত্তরাধিকার পুনরুজ্জীবিত করা। রশিদের মাতা খায়যুরানের জীবদ্দশায় বারমাকি পরিবার চূড়ান্ত পর্যায়ের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু ১৭৩ হি./৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু হলে এ পরিবারের সদস্যদের প্রতি খলিফার আস্থা বিনষ্ট হতে শুরু করে। পরিশেষে তিনি তাদের কঠিন শাস্তি প্রদান করেন।

অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো, খলিফা দুকারণে তাদের শাস্তি প্রদান করেন : রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। তাদের আধিপত্যের মধ্য দিয়ে কয়েক বছর অতিক্রান্ত হলে রশিদ উপলব্ধি করেন—বারমাকিদের উত্থান তার সাম্রাজ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এ অনুভূতির অন্যতম কারণ হলো, বারমাকিরা ছিল আবু তালেবের বংশধরদের প্রতি নমনীয় এবং বর্ণবাদের প্রতি তাদের ঝোঁক ছিল প্রবল।[৪১৮] তা ছাড়া বারমাকিরা রাষ্ট্রীয় সম্পদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। এমনকি রশিদ সামান্য সম্পদের প্রয়োজন হলেও তা নিতে পারতেন না;[৪১৯] অথচ বারমাকিরা তখন প্রচুর সম্পদ অপচয় করত। তারা খলিফার অর্থনৈতিক ক্ষমতার সাথে সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতাও সীমিত করে ফেলে। তাদের প্রতিপক্ষদের কুৎসার কারণে তারা রশিদের ওপর অতি মাত্রায় প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস চালায়। ফলে রশিদ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে ১৮৭ হিজরির সফর মাসের শুরু ভাগে/৮০২ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে জাফরকে হত্যা করেন এবং ইয়াহইয়া ও তার সন্তানদের গ্রেফতার করে তাদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।[৪২০]

---

৪১৭. *কিতাবুল ওয়াযারা ওয়াল কুত্তাব*, জাহশিয়ারি, পৃ. ২৫৪।

৪১৮. *আছারুল ফারাসিস সিয়াসি ফিল আসরিল আব্বাসি আল-আউয়াল*, আবদুর রহমান আমর, পৃ. ২৩৬।

৪১৯. *কিতাবুল ওয়াযারা ওয়াল কুত্তাব*, জাহশিয়ারি, পৃ. ২৪৬; *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ২৮৭-২৮৮।

৪২০. *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ৩৪১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ২০৪-২০৫।

রশিদের শাসনামলে বৈদেশিক সম্পর্ক

বাইজেন্টাইনদের সাথে সম্পর্ক

রশিদের শাসনামলে মুসলিম ও বাইজেন্টাইনদের মধ্যে সংঘাত অব্যাহত থাকে। রশিদ সীমান্ত অঞ্চলের সুরক্ষা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সুসংহত করার সংকল্প করেন। এ লক্ষ্যে তিনি আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক দুটি সমান্তরাল নীতির অনুসরণ করেন। তিনি সীমান্ত অঞ্চলের জন্য দুটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। অগ্রবর্তী বাহিনী, যারা জাজিরা সীমান্ত ও সিরিয়া অঞ্চলের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। পশ্চাদবর্তী বাহিনী, যারা পশ্চাতের অঞ্চলসমূহ ও দক্ষিণ প্রান্তের সীমান্তের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এদের তিনি আওয়াসিম (প্রতিরক্ষা বাহিনী) বলে নামকরণ করেন। এদের কাজের সীমানা ছিল এন্তাকিয়া থেকে ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদী পর্যন্ত।[৪২১]

বাইজেন্টাইনরা ইসলামি সীমান্তরক্ষীদের মোকাবেলায় প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে, যার পরিধি ছিল তোরোস পর্বতমালা এবং ফোরাত (ইউফ্রেটিস) থেকে সিলিসিয়া পর্যন্ত।

উভয় পক্ষের সামরিক প্রস্তুতি শেষে অভিযান শুরু হয়। রশিদ সম্রাজ্ঞী ইরিনকে সন্ধির শর্তসমূহ মেনে নিতে বাধ্য করেন। ১৮৭ হি. (৮০৩ খ্রিষ্টাব্দ) কোষাধ্যক্ষ নিকিফোরাস সম্রাজ্ঞী ইরিনকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন। এরপর তিনি মুসলিমদের সঙ্গে কৃত সন্ধি ভঙ্গ করেন। রশিদ তার কাছে ইরিন যে কর প্রদান করত, তা পরিশোধের তাগাদা দিলে তিনি তা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে রশিদ এর সমুচিত জবাব প্রদান করেন। সম্রাট নিকিফোরাস অবস্থা বেগতিক দেখে নতি স্বীকার করেন এবং বিপর্যয় এড়াতে রশিদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করে কর প্রদানে সম্মত হন। সেই সঙ্গে মুসলিমরা যে-সকল দুর্গ ধ্বংস করেছে, সেগুলো পুনর্নির্মাণ করবে না বলে অঙ্গীকার করেন। তিন বছরের জন্য এ শান্তিচুক্তি করা হয়।[৪২২]

---

৪২১. *আল-আলাকাতুস সিয়াসিয়্যা বায়না বায়যানতিয়্যা ওয়াশ শারকিল আদনা আল-ইসলামি*, ওয়াদি ফাতহি আবদুল্লাহ, পৃ. ২৪২-২৪৩।

৪২২. Chronographia : Theophanes. p 969. History of Byzantine States : Ostrogorsky. I P 156; *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ৩২১-৩২২।

কিছু সময় পরে নিকিফোরাস বুঝতে পারেন—এশিয়া মাইনরের দক্ষিণাঞ্চলে মুসলিমদের আধিপত্য কায়েম হয়েছে এবং তারা বাইজেন্টাইনদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিসমূহের সড়কগুলোতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। তখন তিনি কর প্রদানে অপমান বোধ করত সন্ধিভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রশিদ এ সিদ্ধান্ত জানামাত্রই সামরিক তৎপরতা শুরু করেন। এরপর তিনি খোরাসানের উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যে কারণে বাইজেন্টাইনে সামরিক তৎপরতা অব্যাহত রাখার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়নি।[৪২৩]

ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে সম্পর্ক

ইউরোপের ফ্রাঙ্ক কারোলিনজিয়ানদের পূর্বপ্রান্তে রাজ্য জয়ের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। যে-কারণে আব্বাসি ও ফ্রাঙ্কদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রাচ্যের ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে এ সম্পর্কের বিষয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি। শুধু ল্যাটিন ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে হারুনুর রশিদ ও ফ্রাঙ্ক রাজা শার্লিমেনের মধ্যে সম্পর্কের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তবে সেই আলোচনাগুলো দুর্বল ও দুর্বোধ্য হওয়ার কারণে তা ঐতিহাসিকদের আস্থা হ্রাস করেছে।

১৮১ হি. মোতাবেক ৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক রাজা ও হারুনুর রশিদের মধ্যে সম্পর্কের সূচনা হয় এবং তারা পরস্পর দূত ও উপঢৌকন বিনিময় করেন। তবে তাদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য হয়নি। বরং গ্রহণযোগ্য মতানুসারে তাদের মধ্যে একরকম বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল, যা রাজনৈতিক ঐক্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। মূলত ইহুদি বণিকদের সুবাদে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে এ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বণিকদের দাবি অনুযায়ী, নিজেদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম সহজ করতে তারা দুপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।[৪২৪]

রশিদের মৃত্যু

রশিদ তার তিন পুত্র মুহাম্মাদ আল-আমিন, আবদুল্লাহ আল-মামুন ও মু'তামিনকে পর্যায়ক্রমে তার পরবর্তী খলিফা মনোনীত করেন। তুরস্কে রাফে বিন লাইসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু হলে রশিদ তা দমন করতে নিজে একটি

---

৪২৩. Chronographia : Theophanes. I bid.

৪২৪. Chariemagne and Palestine : S. Runciman. I P 607. The Life of Charlemagne : Einhard. P 42.

বাহিনী নিয়ে মামুনের সাথে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে খোরাসানের তুস নগরীতে পৌছুলে ৪ জুমাদাল উখরা ১৯৩ হি. মোতাবেক ২৫ মার্চ ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৪২৫]

* * *

৪২৫. *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ২৪০-২৪১, ২৬৯, ২৭৫, ৩৪২-৩৪৬।

আবু মুসা মুহাম্মাদ আল-আমিন

(১৯৩-১৯৮ হি./৮০৯-৮১৩ খ্রি.)

আমিন ও মামুনের মধ্যে বিরোধের কারণসমূহ

আমিন ও মামুনের মধ্যে বিরোধের তিনটি মৌলিক কারণের কথা জানা যায় : ১. যুবরাজ-বিষয়ক জটিলতা; ২. আরব ও পারসিকদের মধ্যকার বর্ণবিরোধ; ৩. আশপাশের লোকদের প্ররোচনা।

যুবরাজ-বিষয়ক জটিলতা

জটিলতার অন্যতম কারণ ছিল—রাজত্বের প্রতি লালসা, যা আমিনকে পেয়ে বসেছিল। সেই সঙ্গে তার ভাইদের প্রতি কিছু জমানো ক্ষোভও তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। প্রথমে তিনি পিতার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের ধারাসমূহ ভঙ্গ করেন। তার দুই ভাইকে যুবরাজের তালিকা থেকে পেছনে হটিয়ে নিজ পুত্র মুসাকে তাদের আগে নিয়ে আসেন। যে কারণে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। এদিকে মামুন খোরাসানে অবস্থান করছিলেন। তার এ অবস্থানের কারণে আমিন শঙ্কিত ছিলেন। অতঃপর দুই ভাই স্বাভাবিকভাবেই একে অপরের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে পড়েন।[৪২৬]

আরব ও পারসিকদের মধ্যকার বর্ণবিরোধ

মামুনের লেখক ও সচিব ফজল বিন সাহল, যিনি আব্বাসি প্রশাসনের মধ্যে পারসিক বর্ণবাদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন এবং ফজল বিন রবি, যিনি আরবি বর্ণবাদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন; এ দুজনের রাজনৈতিক ভূমিকার কারণে বর্ণবাদের বিষয়টি নতুন করে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। হারুনুর রশিদের মৃত্যুর পর দুপক্ষের বিরোধের বিষয়টি জনসম্মুখে চলে আসে। এ ছাড়াও তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা ছিল। এভাবে আরব ও পারসিকদের মধ্যে জাতিগত বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে।[৪২৭]

---

[৪২৬]. *কিতাবুল ওয়াযারা ওয়াল কুত্তাব*, জাহশিয়ারি, পৃ. ২২২; *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ২৮৪-২৮৫, ২৯৯।

[৪২৭] প্রাগুক্ত : পৃ. ২৭৭, ২৮০; প্রাগুক্ত : খ. ৮, পৃ. ৩৬১-৩৭২।

আশপাশের লোকদের প্ররোচনা

ফজল বিন সাহল মামুনের সহযোগী হয়। আমিন কর্তৃক তার বাগদাদে ফিরে আসার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে তাকে খোরাসানে অবস্থান করতে সাহস জোগায়। ফজল মামুনকে খেলাফতের মসনদে বসানোর চেষ্টা করে। একই সময় ফজল বিন রবি, আলি বিন ঈসা বিন মাহান আমিনের সহযোগী হয়ে তাকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে প্ররোচিত করে। এভাবে আশপাশের লোকদের প্ররোচনার কারণে বিরোধের আগুন প্রজ্বলিত হয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।[৪২৮]

দুই ভাইয়ের মধ্যে সংঘাত

দুই ভাইয়ের মধ্যে যুবরাজ নির্ধারণ ও খলিফার যোগ্যতাসংক্রান্ত বিরোধের বিষয়টি প্রথমে দূত ও পত্র প্রেরণের মধ্যে সীমিত ছিল।[৪২৯] আমিন এমন কিছু কৌশল অবলম্বন করেন, যার দ্বারা প্রমাণ হয়- খেলাফতের বিষয়ে তার ভাইয়ের অধিকার তার পুত্রের পরে। যেমন তিনি তার ভাইকে ধোঁকা দিয়ে নিজের কাছে ডেকে আনার চেষ্টা করেন। মামুনও তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাগদাদে আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তার মন্ত্রী ফজল বিন সাহল, তাকে সতর্ক না করলে তিনি হয়তো সেখানেই শেষ হয়ে যেতেন।[৪৩০]

দুই ভাইয়ের মধ্যকার সম্পর্কে ক্রমেই অবনতি হতে থাকে এবং দিন দিন বিরোধ প্রবল হতে থাকে। অতঃপর আমিন আলি বিন ঈসা বিন মাহানের নেতৃত্বে খোরাসানের দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। ওই দিকে মামুন তাহের ইবনুল হুসাইনের নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ করেন। দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হলে মামুনের বাহিনী বিজয়ী হয় এবং আলি বিন ঈসা বিন মাহান নিহত হয়।[৪৩১]

এ বিজয়ের পর লোকজন মার্ভে মামুনের হাতে খেলাফতের বাইআত হয়।[৪৩২] এরপর আমিন আবদুর রহমান বিন জাবালাহ আনসারির নেতৃত্বে তাহেরের বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য আরেকটি বাহিনী প্রেরণ

---

৪২৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৮৯-২৯০; প্রাগুক্ত : *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ৩৭৪।

৪২৯. *তারিখে তাবারি* : খ. ৮, পৃ. ৩৭৪।

৪৩০. প্রাগুক্ত : খ. ৮, পৃ. ৩৭২।

৪৩১. *কিতাবুল ওয়াযারা ওয়াল কুত্তাব*, জাহশিয়ারি, পৃ. ২৯৩; *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ৪৯১।

৪৩২. প্রাগুক্ত।

করেন।[৪৩৩] হামদানে দুপক্ষ আবার মুখোমুখি হলে মামুনের বাহিনী আবারও বিজয়ী হয়। এরপর তারা আরও অগ্রসর হয়ে বাগদাদ অবরোধ করে। খোরাসানি বাহিনী শহরে প্রবেশ করে আমিনকে গ্রেফতার করে এবং তার পদচ্যুতির ঘোষণা করে। ২৫ মহররম ১৯৮ হিজরি মোতাবেক ২৫ সেপ্টেম্বর ৮১৩ খ্রি. তারিখে এ ঘটনা ঘটে। অতঃপর তাহেরের হাতে আমিন নিহত হন।[৪৩৪]

* * *

[৪৩৩]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ৪১৩-৪১৪।
[৪৩৪]. প্রাগুক্ত : খ. ৮, পৃ. ৪৭২-৭৮৯।

আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-মামুন

(১৯৮-২১৮ হি./৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)

খলিফা মামুনের শাসনামলে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

ফজল বিন সাহল মামুনের বিজয়ের ফলাফল ভোগের ইচ্ছা করেন। নতুন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে খলিফাকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন সাধনের পরামর্শ প্রদান করেন। আসলে তার উদ্দেশ্য ছিল একাই ইরাক শাসনের ক্ষেত্র তৈরি করা। এদিকে খলিফাও তার মন্ত্রীর উপদেশ সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি তাহের বিন হুসাইনকে ইরাক থেকে পদচ্যুত করে ফজলের ভাই হাসান বিন সাহলকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। অনুরূপ হারসামা বিন আয়ুনকে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু এ দুই সেনাপতিকে ইরাক থেকে সরিয়ে দেওয়ার কারণে সেখানে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়।[৪৩৫]

মামুন তার মন্ত্রীকে যথাযোগ্য প্রতিদান প্রদানের চেষ্টা করেন। তিনি তাকে 'জুর রিয়াসাতাইন' (দুটি নেতৃত্বের অধিকারী) নামে নতুন একটি উপাধি প্রদান করেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রিয়াসাতুস সাইফ (তরবারির নেতৃত্ব), রিয়াসাতুল কলম (কলমের নেতৃত্ব)। এ বৈশিষ্ট্য দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এ পারসিক নেতা কত ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন।

খলিফার এ রদবদলের কারণে আরবরা তার প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হয়। বিশেষ করে আলাভিদের প্রতি মামুনের ঝোঁকের কারণে বনু হাশিম গোত্র রুষ্ট হয়। তিনি আব্বাসিদের প্রতীক কালো কাপড় নিষিদ্ধ করে আলাভিদের প্রতীক সবুজ পোশাক পরিধান করার নির্দেশ জারি করেন। শিয়া ইমামিয়্যাদের অষ্টম নেতা আলি রেজার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তাকে যুবরাজ মনোনীত করেন।[৪৩৬] ফলে, বাগদাদে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানকার অধিবাসীরা খলিফা মামুনের চাচা মানসুর বিন মাহদির কাছে

---

[৪৩৫]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ৫২৭।

[৪৩৬]. প্রাগুক্ত : খ. ৮, পৃ. ৫৫৪-৫৫৫; *মাকাতিলুত তালিবিন*, ইসফাহানি, পৃ. ৪৫৪-৪৫৫; *আল-ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়্যাহ ওয়াদ দুওয়ালিল ইসলামিয়্যাহ*, ইবনুত তিকতাকা, পৃ. ২১৭।

খেলাফতের বাইআত করে। মানসুর বাগদাদ শহরের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেন। এ ছাড়া অন্যান্য শহরেও ব্যাপক আকারে অরাজকতা দেখা দেয়।[৪৩৭]

ফজল বিন সাহল মামুনের কাছ থেকে এ সকল রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কথা গোপন রাখেন। কিন্তু আলি রেজা তাকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। তখন খলিফা বুঝতে পারেন—তার খোরাসানে অবস্থানের সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল; আর বাগদাদ খলিফাবিহীন থাকতে পারে না। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ বাগদাদে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে তিনি বুঝতে পারেন—তার মন্ত্রী ফজলের কর্মতৎপরতা সুবিধাজনক নয়। তিনি তলে তলে আব্বাসি সাম্রাজ্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনা করছেন। অতঃপর (শাবান ২০২ হি./ফেব্রুয়ারি ৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে) তাকে হত্যার মাধ্যমে খলিফা তার বিষয়ে চিন্তামুক্ত হন। তিনি যখন তুস নগরীতে পৌছেন, তখন আলি রেজার অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। মামুন যাত্রা অব্যাহত রেখে (জিলহজ ২০৩ হি./জুন ৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে) বাগদাদ পৌছেন। তখন তিনি আলাভিদের প্রতীক (সবুজ পোশাক) নিষিদ্ধ করে পুনরায় আব্বাসিদের প্রতীক (কালো পোশাক) চালু করেন। ফলে, মানুষ পুনরায় তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে।[৪৩৮]

মামুনের শাসনামলে সরকারবিরোধী আন্দোলনসমূহ

আলাভি আন্দোলন

আমিন ও মামুনের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে সৃষ্ট আব্বাসি খেলাফতের অস্থিরতার সুযোগে আলাভিরা ইরাক, হিজাজ ও ইয়েমেনে সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু করে। বিশেষত তারা মামুনের প্রতি আলি রেজাকে বিষ প্রয়োগে হত্যার অপবাদ অরোপ করে। এ সকল আন্দোলনের মধ্যে আবুস সারায়া ও মুহাম্মাদ দিবাজ বিন জাফর সাদিকের আন্দোলন অন্যতম। মামুন তাদের আন্দোলন দমন করতে সক্ষম হন। তিনি আবুস সারায়াকে হত্যা করেন, আর মুহাম্মাদ দিবাজ নিজে থেকেই আন্দোলন থেকে সরে যায়।[৪৩৯]

---

৪৩৭. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৪০২-৪০৩; *মাকাতিলুত তালিবিন*, ইসফাহানি, পৃ. ৪৫৬।

৪৩৮. *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ৫৭৪-৫৭৫।

৪৩৯. প্রাগুক্ত : খ. ৮, পৃ. ৫২৮-৫৩০, ৫৩৪-৫৩৬, ৫৩৮-৫৩৯।
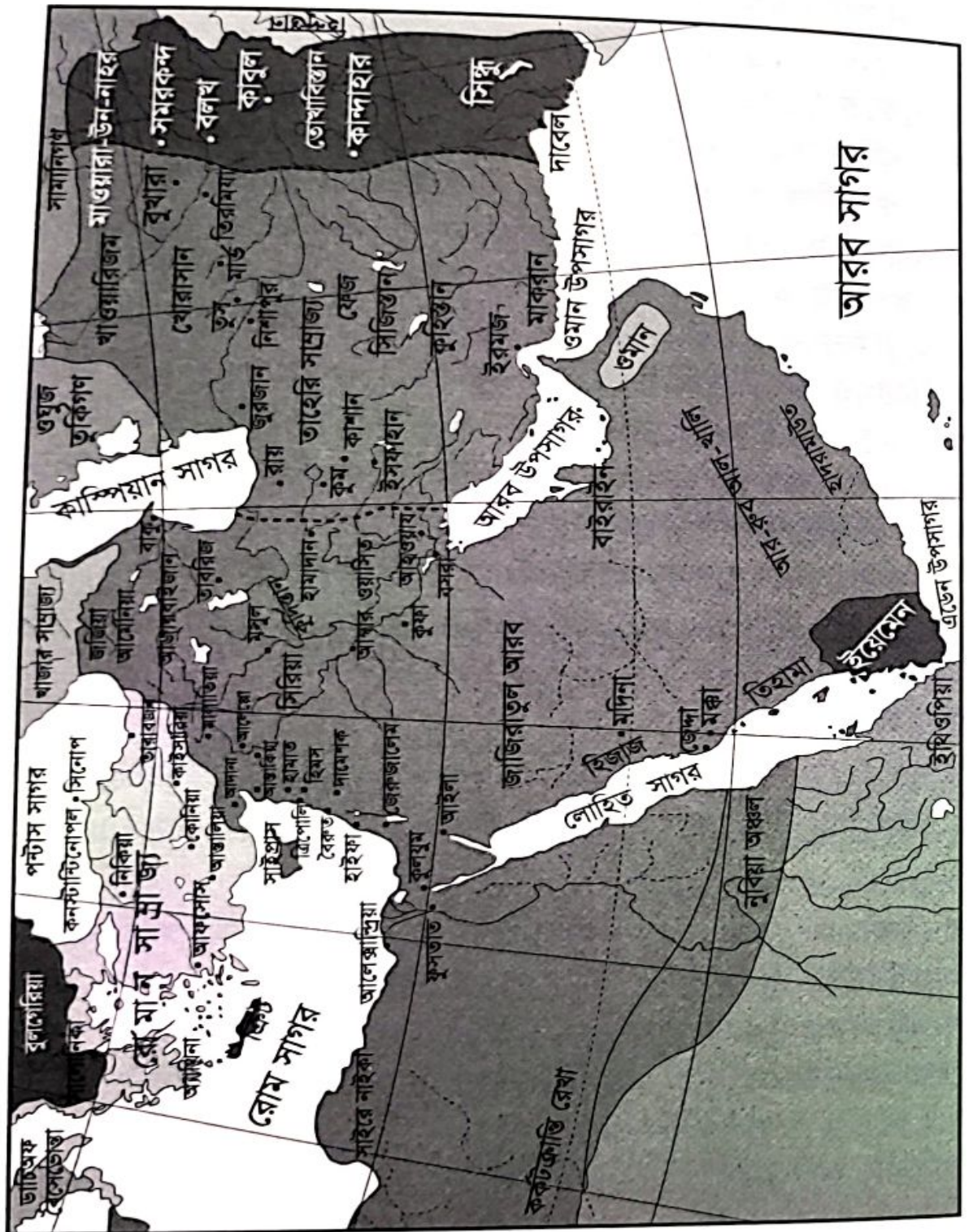
আলাভি ছাড়াও অন্যদের আন্দোলন

১৯৮ হি. মোতাবেক ৮১৪ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিকে নাসর বিন শাব্‌স নামক আরবি নেতা মামুনের প্রতি খোরাসানিদের পক্ষপাতের অভিযোগ আরোপ করে তার সঙ্গে বিদ্রোহ করে এবং আলেপ্পোর উত্তরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। অনেক আরব তাকে সমর্থনও করে।[৪৪০] মামুন তার মোকাবেলার জন্য তাহের বিন হুসাইনকে প্রেরণ করেন। অতঃপর তাহেরের পুত্র আবদুল্লাহকেও সেদিকে প্রেরণ করলে তিনি নাসরকে সন্ধিপ্রস্তাবে বাধ্য করেন।[৪৪১]

ইরাকের দক্ষিণ প্রান্তে বসরা অঞ্চলে জুতি সম্প্রদায় চরম হাঙ্গামা শুরু করে। জুতি হলো বিভিন্ন প্রকার উপজাতি, যারা নাওয়ার নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এরা বসরায় আধিপত্য কায়েম করে বসরা ও বাগদাদের মধ্যকার সকল প্রকার যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। মামুন তাদেরকে নির্মূল করতে একাধিক বাহিনী প্রেরণ করলেও তা সম্ভব হয়নি। তখন থেকে মুতাসিমের শাসনকাল পর্যন্ত জুতিদের প্রতাপ বাকি ছিল। অতঃপর মুতাসিম ক্ষমতায় এসে তাদের শক্তি বিনাশ করেন।

আমিন ও মামুনের মধ্যকার বিরোধের প্রভাব মিসরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপরও পড়ে। সেখানে সারি বিন হাকামের নেতৃত্বে ২০৬ হিজরি (৮২১ খ্রি.) স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ ছাড়া মিসরের আরব গোত্রগুলোও ২১৪ হি. (৮২৯ খ্রি.) গভর্নরদের স্বেচ্ছাচারমূলক নীতির কারণে বিদ্রোহ করে। মামুন এ সকল আন্দোলন ও বিদ্রোহ দমনে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাতে সফলও হন।[৪৪২]

আব্বাসি খেলাফত তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে মামুনের শাসনামলে সবচেয়ে বড় আন্দোলনের সম্মুখীন হয়। যা বাহ্যত ধর্মীয় আন্দোলন হলেও তার উদ্দেশ্য ছিল রাজক্ষমতা দখল করা। পারসিকরা আরবকেন্দ্রিক আব্বাসি খেলাফতের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। তারা বাবাক খুররামির নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলে। বাবাক পূর্ব প্রান্তের অঞ্চলগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করে এবং আব্বাসি খেলাফতের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সরকারবিরোধী আন্দোলন দমনে খলিফার ব্যস্ততার সুযোগে অবিরাম সফলতা লাভ করে।

---

৪৪০. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৩৯৮।

৪৪১. *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ৫৭৯-৫৮০, ৫৯৮-৬০১।

৪৪২. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৪২৩-৪২৫।

তারা আব্বাসি প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দুর্বল করতে তাদের দুর্গগুলো ধ্বংস করে দেয়। মামুন তাদের মোকাবেলায় একাধিক বাহিনী প্রেরণ করলেও তারা ব্যর্থ হয়। এভাবে বাবাক আব্বাসি সাম্রাজ্যের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলে।[৪৪৩]

মামুনের শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য

আব্বাসি শাসনের প্রথম যুগে, বিশেষ করে মামুনের শাসনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের যে বিপ্লব সাধিত হয়, তাতে মামুনের বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের, বিশেষত গ্রিকদের জ্ঞানের ভান্ডারকে একত্র করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিশাল খেদমত আঞ্জাম দানের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ২১৫ হি. (৮৩০ খ্রি.) বাইতুল হিকমাহ (House of wisdom বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বসতবাড়ি) প্রতিষ্ঠা করেন। এটিকে একটি উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া হয়। এ শিক্ষাকেন্দ্রের আওতায় একই সঙ্গে বিভিন্ন ভাষার পুস্তকাদির বিশাল গ্রন্থাগার, গবেষণাগার ও অনুবাদকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ছাড়াও এখানে মহাকাশ বিজ্ঞানচর্চারও ব্যবস্থা রাখা হয়। দক্ষ অনুবাদকগণ সংস্কৃত, ফারসি, গ্রিক, সুরইয়ানি-সহ বিভিন্ন ভাষা থেকে বহু মৌলিকগ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেন। হুনাইন বিন ইসহাক ও তার পুত্র ইসহাক ছিলেন অনুবাদকদের মধ্যে অন্যতম। উল্লেখ্য যে, খলিফা মামুন 'খালকে কুরআন' বা কুরআন সৃষ্টির বিষয়ে মুতাজিলাদের আকিদা গ্রহণ করেন।[৪৪৪]

বাইজেন্টাইনদের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

মামুনের শাসনামলে খেলাফতের চলমান সংকটের কারণে মুসলিম ও বাইজেন্টাইনদের মধ্যকার যুদ্ধ শেষ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, যে-কারণে এ অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি ঘটে। তবে বাইজেন্টাইনরা মুসলিম ভূখণ্ডে, বিশেষ করে জিবাত্রায় (Isparta) আক্রমণের জন্য খুররামিদের সাহায্য করে। বিপরীতে মামুন বাইজেন্টাইন বিদ্রোহী থমাস সেকলাবি (Thomas the Slav)-কে সাহায্য করেন। মামুন ও তার পুত্র ক্যাপাডোকিয়ায়

---

[৪৪৩]. *আল-আখবারুত তিওয়াল*, দিনাওয়ারি; পৃ. ২৮০; *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৪১৯; *আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক*, আবদুল কাহের বিন তাহের বাগদাদি, পৃ. ২৫২, ২৬৮।

[৪৪৪]. *আল-ফিহরিসত*, ইবনুন নাদিম, পৃ. ১৪৭, ৩৫৬, ৩৫৯-৩৬০; *দোহাল ইসলাম*, আহমদ আমিন, খ. ১, পৃ. ২৭৭।

(Cappadocia) বেশ কিছু দুর্গ জয় করতে সক্ষম হন এবং হিরাকলা (Hergla) ও লুলুয়া পুনরুদ্ধার করেন।[৪৪৫]

মামুনের মৃত্যু

মামুন সিরিয়ার উত্তর প্রান্তে বাইজেন্টাইনদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় বাযেনদুন নামক এলাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যু তারিখ ১৮ রজব ২১৮ হি. (আগস্ট ৮৩৩ খ্রি.)। এরপর তাকে তারসুসে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আপন সহোদর মুতাসিমকে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করেছিলেন।[৪৪৬]

* * *

৪৪৫. *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ৬২৩-৬২৪, ৬২৯।

৪৪৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৫০।

আবু ইসহাক মুহাম্মাদ আল-মুতাসিম

(২১৮-২২৭ হি./৮৩৩-৮৪১ খ্রি.)

মুতাসিমের শাসনামলে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

মুতাসিম আব্বাসি সাম্রাজ্যের ওপর স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন শুরু করেন। তবে তার মধ্যে একপ্রকার কোমলতা ও কৌশলও ছিল। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন সাহসী ও নির্ভীক। আলাভিদের প্রতি কঠোরতা মামুন ব্যতীত অন্য সকল খলিফাদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। তার শাসনামলে মুহাম্মাদ বিন কাসেম বিন আলি আয-যাইদি ২১৯ হি. মোতাবেক ৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খোরাসানের অন্তর্গত তালেকানে বিদ্রোহ করেন। তবে তার আন্দোলনের কারণে সাম্রাজ্যের বড় কোনো বিপদ হয়নি।[৪৪৭] খলিফা মুতাসিম জাঠদের আন্দোলনের অবসান ঘটান এবং তাদের অনুসারীদের আনাজারবাসে (عين زربة)[৪৪৮] দেশান্তর করেন। অনুরূপ বাবাক খুররামির নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে একাধিক বাহিনী পাঠিয়ে তার আন্দোলনের অবসান ঘটান। সফর ২২৩ হি./জানুয়ারি ৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাবাক ও তার ভাই আবদুল্লাহকে সামাররায় উপস্থিত করা হলে মুতাসিম তাদের হত্যা করেন।[৪৪৯]

তুর্কি জাতীয়তাবাদের উত্থান

মুতাসিমের শাসনামলে তুর্কি জাতীয়তাবাদ নতুন করে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আরব ও পারসিকদের মধ্যে দীর্ঘ লড়াই এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যে ভারসাম্যের ভিত্তিতে আব্বাসি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল, তা নষ্ট হওয়ার কারণে তুর্কিদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। আরবদের বিচিত্র স্বভাব ও খলিফার বিরোধিতার কারণে তিনি তাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। এদিকে আরবদের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিও পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে

---

৪৪৭. *মাকাতিলুত তালিবিন*, ইসফাহানি, পৃ. ৪৭২; *মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*, খ. ৩, পৃ. ৪৬৪-৪৬৫।

৪৪৮. *তারিখে তাবারি*, খ. ৯, পৃ. ৮-৯। আনাজারবাস (عين زربة) মোপেসেটিয়ার সীমান্তবর্তী একটি শহর।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ৪, পৃ. ১৭৭।

৪৪৯. *তারিখে তাবারি*, খ. ৯, পৃ. ৫৪-৫৫।

খর্ব হয়। ওদিকে পারসিকদের প্রত্যাশা ও আব্বাসিদের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে তাদের প্রতি খলিফা মুতাসিমের আস্থা কমতে শুরু করে। এ সকল সমস্যার কারণে খলিফা মুতাসিম তুর্কিদেরকে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রদান করেন। এ লক্ষ্যে তিনি মাওয়ারা-উন-নাহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তুর্কিদের ক্রীতদাস হিসেবে অথবা যুদ্ধবন্দি হিসেবে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তাদেরকে ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী করেন। খলিফা প্রচুরসংখ্যক তুর্কিকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করেন এবং তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত করেন। এ ছাড়াও রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদেরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেন। তিনি শুধু তুর্কিদের জন্য সামাররায় বসতি স্থাপন করেন। তুর্কিদের ও আব্বাসি খেলাফতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে যার ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

খলিফা মুতাসিমের শাসনামলের শুরুর কয়েক বছর মুসলিম ও বাইজেন্টাইনদের মধ্যকার যুদ্ধ বন্ধ ছিল। কেননা, খলিফা তখন বাবাক খুররামির বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। এদিকে বাইজেন্টাইন সম্রাট থিওফিল (Théophile) মুসলিমদের থেকে সিসিলি দ্বীপ পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করে। এ কারণে সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে চার বছর যাবৎ শান্তি বিরাজ করে। পরবর্তী সময়ে থিওফিল মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধের পরিকল্পনা করলে আবার সামরিক তৎপরতা শুরু হয়। বাবাক খুররামির সাথে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক আলোচনা সফল হলে তা থিওফিলকে যুদ্ধের সাহস জোগায়। অতঃপর থিওফিল আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানে বাবাকের সাথে নিরাপদ যোগাযোগব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে ফোরাত অঞ্চলে আক্রমণ করে। পথিমধ্যে সে খলিফার মাতার জন্মস্থান জিবাত্রায় (Isparta) আধিপত্য বিস্তার করে এবং সেখানকার অধিবাসী মুসলিমদের বন্দি করে তাদের অঙ্গহানি করে। সেই সঙ্গে মুসলিম নারীদেরকেও বন্দি করে। অনুরূপ সামিসাত ও মালাতিয়্যায় আক্রমণ করে সেখানে অগ্নিসংযোগ করে।[৪৫০]

এ সকল আক্রমণকে মুতাসিম নিজের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং জিবাত্রা পুনরুদ্ধারের সংকল্প করেন। বাবাকের বিদ্রোহ দমন শেষ হতে না হতেই খলিফা একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। নিজে সেনাপতি হয়ে

---

[৪৫০]. প্রাগুক্ত : খ. ৯, পৃ. ৫৬।

সেই বাহিনী নিয়ে সম্রাট থিওফিল ও তার পরিবারের জন্মস্থান আমুরিয়্যার দিকে যাত্রা করেন। খলিফা এশিয়া মাইনরের গভীরে অবস্থিত এ শহরটি ধ্বংস করার সংকল্প করেন।[৪৫১] মুসলিম বাহিনী তিন দিক থেকে বিভক্ত হয়ে সেই অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং সকলে আঙ্কারায় মিলিত হয়ে সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।[৪৫২] সম্রাট ইসলামি বাহিনীর একটি অংশের মোকাবেলা করার চেষ্টা করে; কিন্তু তাতে চরমভাবে পরাস্ত হয়ে হলিস নদীর দিকে ফিরে যায় এবং জিবাত্রা (Isparta) ধ্বংসযজ্ঞের কারণে অনুতপ্ত হয়ে খলিফার কাছে সন্ধির প্রস্তাব করেন। সেই সঙ্গে এর ভবনগুলো পুনর্নির্মাণের অঙ্গীকার করে। খলিফা সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আমুরিয়্যার দিকে অগ্রসর হন এবং শহরটি অবরোধ করেন। রমজান ২২৩ হি./আগস্ট ৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শহরে প্রবেশ করে এর প্রাচীরগুলো ধসিয়ে দেন এবং বিপরীতে জিবাত্রার সংস্কার ও সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ প্রদান করেন।[৪৫৩] এরপর ২২৭ হি. (৮৪২ খ্রি.) দুপক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৪৫৪] একই বছরে মুতাসিম ও থিওফিল দুজনই মৃত্যুবরণ করেন।[৪৫৫]

* * *

---

৪৫১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৭।

৪৫২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬১-৬২; A History of the Later Roman Empire : Bury, p 265.

৪৫৩. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৪৩৬-৪৩৭।

৪৫৪. Camb Med Hist. IV P 130.

৪৫৫. *তারিখে তাবারি*, খ. ৯, পৃ. ১১৮-১১৯।

আবু জাফর হারুন আল-ওয়াসিক

(২২৭-২৩২ হি./৮৪১-৮৪৭ খ্রি.)

ওয়াসিক তার পিতা মুতাসিমের ঘোষণা অনুযায়ী খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার শাসনকালকে আব্বাসি খেলাফতের দুটি ভিন্ন যুগের পরিবর্তনকাল হিসেবে গণ্য করা হয়। ওয়াসিক তার শাসনকালের শুরুতে বনু সালিম ও অন্যান্য আরব গোত্রের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন—যারা মদিনার বিভিন্ন প্রান্তে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। তিনি জাজিরাতুল আরবের উত্তর প্রান্তের বাণিজ্যিক রুটগুলোতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।[৪৫৬]

ওয়াসিক 'খালকে কুরআন (কুরআন সৃষ্টি)-বিষয়ক মুতাজিলাদের আকিদা গ্রহণ করেন এবং তার ধর্মীয় মতামতগুলো মানুষের ওপর বলপূর্বক চাপানোর চেষ্টা করেন। ফলে পালমিরার (তাদমুর) আলেম সমাজ ও জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। এমনকি বাগদাদবাসীরা তার পদচ্যুতির জোর দাবি তোলে। উল্লেখ্য যে, ওয়াসিক মৃত্যুর পূর্বে তার ভ্রান্ত আকিদা থেকে ফিরে এসেছিলেন।[৪৫৭]

ওয়াসিকের প্রশাসন ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। তার শাসনামলে ঘুষ, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়াও প্রাদেশিক গভর্নররা ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ নিতে থাকে।[৪৫৮]

ওয়াসিক শোথ রোগে[৪৫৯] আক্রান্ত হয়ে ২৪ জিলহজ ২৩২ হি./১১ আগস্ট ৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কাউকে পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করে যাননি।[৪৬০]

* * *

[৪৫৬]. প্রাগুক্ত : খ. ৯, পৃ. ১২৯-১৩০।

[৪৫৭]. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ৩০৯। *তারিখে তাবারি*, খ. ৯, পৃ. ১২৫-১২৮, ১৩১।

[৪৫৮]. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৪৪১;

[৪৫৯]. জলসঞ্চার হেতু দেহের ফোলা রোগ।

[৪৬০]. *তারিখে তাবারি*, খ. ৯, পৃ. ১৫০-১৫১।

আব্বাসি শাসনের দ্বিতীয় যুগ

(২৩২-৩৩৪ হি./৮৪৭-৯৪৫ খ্রি.)

তুর্কি আধিপত্যের যুগ

আব্বাসি শাসনের দ্বিতীয় যুগের খলিফাগণ ও তাদের প্রত্যেকের শাসনকাল

আবুল ফজল জাফর আল-মুতাওয়াক্কিল	২৩২-২৪৭ হি./৮৪৭-৮৬১ খ্রি.
আবু জাফর মুহাম্মাদ আল-মুনতাসির	২৪৭-২৪৮ হি./৮৬১-৮৬২ খ্রি.
আবুল আব্বাস আহমাদ আল-মুসতাইন	২৪৮-২৫২ হি./৮৬২-৮৬৬ খ্রি.
আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আল-মুতাজ	২৫২-২৫৫ হি./৮৬৬-৮৬৯ খ্রি.
আবু ইসহাক মুহাম্মাদ আল-মুহতাদি	২৫৫-২৫৬ হি./৮৬৯-৮৭০ খ্রি.
আহমাদ আল-মু'তামিদ	২৫৬-২৭৯ হি./৮৭০-৮৯২ খ্রি.
আবুল আব্বাস আহমাদ আল-মুতাযিদ	২৭৯-২৮৯ হি./৮৯২-৯০২ খ্রি.
আবু মুহাম্মাদ আল-মুকতাফি	২৮৯-২৯৫ হি./৯০২-৯০৮ খ্রি.
আবুল ফজল জাফর আল-মুকতাদির	২৯৫-৩২০ হি./৯০৮-৯৩২ খ্রি.
আবু মানসুর মুহাম্মাদ আল-কাহের	৩২০-৩২২ হি./৯৩২-৯৩৪ খ্রি.
আবুল আব্বাস আহমাদ আর-রাজি	৩২২-৩২৯ হি./৯৩৪-৯৪০ খ্রি.
আবু ইসহাক জাফর আল-মুত্তাকি	৩২৯-৩৩৩ হি./৯৪০-৯৪৪ খ্রি.
আবুল কাসেম আবদুল্লাহ আল-মুস্তাকফি	৩৩৩-৩৩৪ হি./৯৪৪-৯৪৫ খ্রি.

এ যুগের সার্বিক পরিস্থিতি

মুতাওয়াক্কিলের খেলাফতের মাধ্যমে এ যুগের সূচনা এবং মুস্তাকফির খেলাফতের মাধ্যমে এর সমাপ্তি। এ যুগে আব্বাসি খেলাফত ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলীন হতে থাকে। এ কারণে অনেক প্রাদেশিক শাসক কেন্দ্রীয় শাসন থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার সাহস পায় এবং তুর্কিরা রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। মুতাওয়াক্কিলের যুগ থেকে তুর্কিদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আব্বাসি খেলাফতের মধ্যে দুর্বলতা প্রবেশ করতে শুরু করে। ফলে, সাম্রাজ্যের পরিধি সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং খলিফাদের শাসন ইরাক, পারস্যের কিছু অঞ্চল ও আহওয়াজে সীমিত হয়ে পড়ে। তখন বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ অঞ্চলে মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে। আর সীমান্ত অঞ্চলগুলো মুসলিমবিশ্বের বিবর্তন অনুসারে কখনো শক্তিশালী হয়, আবার কখনো দুর্বল হয়। তবে (২৫৬-২৯৫ হি. মোতাবেক ৮৭০-৯০৮ খ্রি.) এর মধ্যবর্তী সময়ে আব্বাসি খেলাফত বিশালাকারে তাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে। এ সময়ে মু'তামিদ, মুতাজিদ ও মুকতাফি খেলাফত পরিচালনা করেন। এ অধ্যায়কে খেলাফতের জাগরণকাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মুতাওয়াক্কিল, মুনতাসির, মুসতাইন, মুতায, মুহতাদি, মু'তামিদ, মুতাজিদ, মুকতাফি, মুকতাদির, কাহের, রাজি, মুত্তাকি, মুস্তাকফি প্রমুখ এ যুগের প্রতিনিধিত্বকারী খলিফা।

অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

তুর্কিদের সাথে সম্পর্ক

খেলাফতের রাজধানী বাগদাদ থেকে সামাররায় স্থানান্তরিত হয়—যা প্রায় ৫০ বছর ধরে তুর্কি লিগের সদর দফতর হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। খলিফা তুর্কি বাহিনীর সামনে অনেকটা নমনীয় ছিলেন। তখন তুর্কি সেনাপতিরা পৃথক রাজ্যগঠনের প্রতি মনোনিবেশ করে। তাদের কেউ কেউ রাজধানীতে একচেটিয়া শাসন কায়েমের স্বপ্ন দেখে। সামরিক ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে আশনাসের বিশেষ অবদানের কারণে খলিফা ওয়াসিক তাকে সুলতান উপাধিতে ভূষিত করতে বাধ্য হন।[৪৬১] ধীরে ধীরে তারা দারুল খেলাফতের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তারা খলিফাকে ঘিরে

---

[৪৬১]. *তারিখুল খুলাফা উমারাউল মুমিনিন*, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, পৃ. ৩৪০।

তার সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণেও ভূমিকা রাখে।[৪৬২] খলিফা নির্বাচন, নিয়ুক্তকরণ ও পদচ্যুতির ক্ষেত্রেও তারা হস্তক্ষেপ করতে থাকে; এমনকি তাদের সেনাপতিরা রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকের পর্যায়ে উপনীত হয়।[৪৬৩]

খলিফাগণ তুর্কি আধিপত্যের সামনে অতি সহজেই নতি স্বীকার করেননি। বরং তারা তাদের মোকাবেলা করেন এবং রাষ্ট্রের খলনায়কদের থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করেন। কিন্তু তখন তুর্কিদের বজ্রশক্তির মোকাবেলা করার মতো পর্যাপ্ত সক্ষমতা তাদের ছিল না।

মুতাওয়াক্কিলের খেলাফত

মুতাওয়াক্কিল ২৩২-২৪৭ হি. (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) তুর্কিদের সমর্থনে খেলাফত লাভ করেন। তুর্কিরা যখন বুঝতে পারে—তাদের সাহায্য ব্যতীত খেলাফত পরিচালনা কার্যত অসম্ভব, তখন তাদের দৌরাত্ম্য আরও বেড়ে যায়। খলিফা তুর্কিদের শক্ত অবস্থান, স্বেচ্ছাচারিতা ও তার প্রতি তাদের উপযুক্ত সম্মান না দেওয়ার বিষয়টি বোঝামাত্রই কালবিলম্ব না করে তাদেরকে দমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু তখন তুর্কিরা খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তার পুত্র মুনতাসিরের সহযোগিতায় তাকে হত্যা করে।

মুনতাসিরের খেলাফত

২৪৭-২৪৮ হি. (৮৬১-৮৬২ খ্রি.) মুনতাসির তুর্কিদের সহযোগিতায় খেলাফতের মসনদে আসীন হন এবং তারা তার হাতে বাইআত করে। স্বভাবতই তিনি তুর্কি আধিপত্যের সামনে নতি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তিনি তুর্কি আধিপত্যের ভয়াবহতা অনুভব করে তাদের থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করেন। তুর্কিরা তার মনোভাব বুঝতে পেরে তাকেও হত্যা করে। অতঃপর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুতাসিমকে তার মসনদে বসায় এবং তাকে মুসতাইন উপাধি প্রদান করে।[৪৬৪]

---

৪৬২. *মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*, খ. ৪, পৃ. ৩।

৪৬৩. *তারিখে তাবারি*, খ. ৯, পৃ. ১৬৮-১৬৯, ১৭৫-১৮০, ২১০।

৪৬৪. প্রাগুক্ত : খ. ৯, পৃ. ২৪৪, ২৫১, ২৫৬-২৫৮।

মুসতাইনের খেলাফত

মুসতাইনের শাসনামলে (২৪৮-২৫২ হি. মোতাবেক ৮৬২-৮৬৬ খ্রি.) তুর্কিরা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। খলিফা এ বিরোধকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করেন। তিনি পরিবার নিয়ে সামাররা থেকে বাগদাদ গমন করেন। তখন তুর্কিরা তাকে পদচ্যুত করে মু'তাজ বিন মুতাওয়াক্কিলের হাতে বাইআত গ্রহণ করে। তখন বাগদাদে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এদিকে তুর্কিরা তাদের ঐক্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। আবার বাগদাদের আমির আবদুল্লাহ বিন তাহের মুসতাইনের আনুগত্য বর্জন করে। তখন খলিফা তার পক্ষে জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও খেলাফতের মসনদ ছাড়তে বাধ্য হন।[৪৬৫]

মু'তাজের খেলাফত

খলিফা মুতাজের শাসনামলে (২৫২-২৫৫ হি. মোতাবেক ৮৬৬-৮৬৯ খ্রি.) রাষ্ট্রের পরিস্থিতি খুব একটা ভালো ছিল না। কেননা, খলিফা তখন সামাররায় ফিরে আসেন এবং তুর্কি আধিপত্যের বলয়ের মধ্যে পড়ে যান। যখন তিনি তুর্কি সেনাপতিদের থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করেন, তখন তারা তাকে পদত্যাগে বাধ্য করে। এরপর তারা মুহাম্মাদ বিন ওয়াসিককে খেলাফতের মসনদে সমাসীন করে তাকে মুহতাদি উপাধি প্রদান করে।[৪৬৬]

মুহতাদির খেলাফত

মুহতাদি (২৫৫-২৫৬ হি. মোতাবেক ৮৬৯-৮৭০ খ্রি.) ছিলেন একজন খোদাভীরু, মুত্তাকি মানুষ। তিনি সংস্কারকর্মের প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তুর্কি বাহিনী তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যখন তিনি তুর্কিদের আধিপত্য বিনাশের সংকল্প করেন, তখন তারা সকলে মিলে তাকে হত্যা করে। অতঃপর আবুল আব্বাস আহমাদ আল-মুতাওয়াক্কিলের হাতে বাইআত করে তাকে মু'তামিদ উপাধি প্রদান করে।[৪৬৭]

---

[৪৬৫]. প্রাগুক্ত : খ. ৯, পৃ. ২৫৯, ২৬৩-২৬৪, ২৭৮-২৮১; *মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*, খ. ৪, পৃ. ৭৯।

[৪৬৬]. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৪৬৮-৪৭০; *তারিখে তাবারি*, খ. ৯, পৃ. ৩৮৯-৩৯০।

[৪৬৭]. প্রাগুক্ত : খ. ৯, পৃ. ৪৫৬-৪৬৯; *আল-ইনবা ফি তারিখিল খুলাফা*, ইবনু ইমরানি, পৃ. ৯৮; *মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*, খ. ৪, পৃ. ৯৬।

মু'তামিদের খেলাফত

মু'তামিদের শাসনামলে (২৫৬-২৭৯ হি. মোতাবেক ৮৭০-৮৯২ খ্রি.) তুর্কিদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে তাদের শক্তিতে ভাটা পড়ে। ফলে তারা খলিফার কাছে আবেদন করে—তিনি যেন তার কোনো এক ভাইকে সেনাপ্রধান করেন। তখন খলিফা তার সহোদর আবু আহমাদ মুওয়াফফাক তালহাকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব প্রদান করেন। মুওয়াফ্ফাক সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নেওয়ার পর খেলাফতকে গতিশীল করার চেষ্টা করেন। এর মাধ্যমে তুর্কিদের প্রভাব অনেকাংশে নষ্ট হয়। কিন্তু তৃণমূল থেকে খেলাফতের প্রভাব বিস্তারের পূর্বেই ২৭৮ হি./৮৯১ খ্রি. সালে তার মৃত্যু হয়। তখন খলিফা নিজ পুত্র আবুল আব্বাস মুতাজিদকে যুবরাজ ঘোষণা করেন। এর কয়েক মাস পরে তিনিও মৃত্যুবরণ করেন।[৪৬৮]

মুতাজিদের খেলাফত

মুতাজিদ তার শাসনামলে (২৭৯-২৮৯ হি. মোতাবেক ৮৯২-৯০২ খ্রি.) নিজ পিতার মতো যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে যান এবং খেলাফতকে গতিশীল করা ও তার প্রতাপ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তার শাসনামলেও তুর্কিদের প্রভাব অনেকাংশে খর্ব হয়।

মুকতাফির খেলাফত

মুতাজিদের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুকতাফি (২৮৯-২৯৫ হি. মোতাবেক ৯০২-৯০৮ খ্রি.) তার স্থলাভিষিক্ত হয়।[৪৬৯] তার শাসনামলে বহু বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দেয়। তার মৃত্যুর পর পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে খেলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি উদ্‌বেগজনক হারে বৃদ্ধি পায়। সেই সুবাদে তুর্কিরা তাদের হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে এবং নিজেদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে দুর্বল খলিফা নির্বাচনের নীতি গ্রহণ করে। তারা আবুল ফজল জাফর বিন মুতাজিদকে খলিফা নির্বাচন করে তাকে 'মুকতাদির' উপাধি প্রদান করে। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর।[৪৭০]

---

৩১৯. *তারিখে তাবারি*, খ. ১০, পৃ. ২০-২২; *মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*, খ. ৪, পৃ. ১৪২।

৪৬৯. *তারিখে তাবারি*, খ. ১০, পৃ. ৮৭।

৪৭০. প্রাগুক্ত : খ. ১০, পৃ. ১৩৯।

মুকতাদিরের খেলাফত

মুকতাদিরের শাসনামলে (২৯৫-৩২০ হি. মোতাবেক ৯০৮-৯৩২ খ্রি.) যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা মোকাবেলা করার মতো সামর্থ্য তার ছিল না। তিনি যুবক হওয়ামাত্রই ভোগ-বিলাসে মত্ত হন এবং মুনিস খাদিমকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। তার যুগে রাষ্ট্রের ভেতরে ও বাইরে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। সেনাপতিরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অতঃপর তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আবদুল্লাহ ইবনুল মু'তাজকে তার স্থলাভিষিক্ত করে এবং তাকে 'রাজি' উপাধি প্রদান করে।[৪৭১] উল্লেখ্য যে, একদল তুর্কি সেনাপতি মুকতাদিরের আনুগত্যে অটল থাকে এবং তাকে পুনরায় ক্ষমতাসীন করতে সক্ষম হয়।[৪৭২]

ফলে, পুনরায় পূর্বের মতো বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। তখন রাষ্ট্রীয় কাজে নারীদের পদচারণা বেড়ে যায়। সৈন্যরা এ বিষয়টিকে মন্দ চোখে দেখে। এদিকে খলিফা ও তুর্কি সেনাপতি মুনিস খাদিমের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। অবশেষে খলিফা নিহত হন এবং মুহাম্মাদ বিন মুতাজিদকে খলিফা মনোনীত করে তাকে 'কাহের' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৪৭৩]

কাহেরের খেলাফত

কাহেরের খেলাফত (৩২০-৩২২ হি. মোতাবেক ৯৩২-৯৩৪ খ্রি.) মুকতাদিরের খেলাফতের চেয়ে উত্তম ছিল না। বরং তার শাসনামলে সেনাদের মধ্যে গোলযোগ অব্যাহত থাকে এবং খলিফার পদটি পুনরায় নিন্দার লক্ষ্যে পরিণত হয়। খলিফা তুর্কি সেনাপতিদের থেকে নিস্তার লাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তখন তুর্কিরা তাকে আটক করে তার দুচোখ উপড়ে ফেলে। অতঃপর (৩২২-৩২৯ হি. মোতাবেক ৯৩৪-৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে) তারা রাজির হাতে বাইআত গ্রহণ করে।

রাজির খেলাফত : আমিরুল উমারার প্রথা চালু

রাজির শাসনামলে শাসনব্যবস্থা আরেকটি সংস্কার প্রত্যক্ষ করে। কারণ, তখন খেলাফত তার নেতিয়ে পড়া ক্ষমতা রক্ষায় শেষ চেষ্টাটুকু ব্যয় করে

---

[৪৭১]. *তারিখে তাবারি*, খ. ১০, পৃ. ১৪১; *মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*, খ. ৪, পৃ. ২১৪।

[৪৭২]. *আল-ইনবা ফি তারিখিল খুলাফা*, পৃ. ১২১-১২২।

[৪৭৩]. *মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*, খ. ৪, পৃ. ২২১; *তাজারিবুল উমাম*, মিসকাওয়াইহ, খ. ১, পৃ. ২৮৬-২৯১।

এবং কেন্দ্রীয় খেলাফত মন্ত্রণালয় ও তুর্কিদের দমনে পুনরায় তৎপরতা শুরু করে। আমিরুল উমারা (প্রধান শাসনকর্তা) পদ সৃষ্টির মাধ্যমে এ সংস্কারের সমাপ্তি ঘটে। আমিরুল উমারাকে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। রাজস্ব আদায় ও যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি খেলাফতের ওপর এত বেশি প্রভাব বিস্তার করেন যে, খলিফার পদটি শুধু একটি প্রতীকে পরিণত হয়। শাসনকার্য পরিচালনায় খলিফার কার্যত কোনো প্রভাব ছিল না। আমিরুল উমারা এসে মন্ত্রীদের ক্ষমতা হ্রাস করেন। তখন খেলাফত ও তুর্কিদের মধ্যকার সংঘাত থেমে যায়।

৩২৪ হি. মোতাবেক ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে এ পদের সৃষ্টি হয়। মূলত মন্ত্রীদের দুর্বলতার কারণে এর উপলক্ষ্য তৈরি হয়। একই সময়ে তুর্কিদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার কারণে তাদের প্রভাবও ক্ষুণ্ন হয়।

এ পরিস্থিতিতে খলিফা খেলাফতকে স্থিতিশীল করতে প্রাদেশিক গভর্নরদের সাহায্য গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ওয়াসিত ও বসরার আমির মুহাম্মাদ বিন রায়েককে কাছে ডেকে রাষ্ট্রপরিচালনায় ব্যাপক কর্তৃত্ব প্রদান করেন এবং তাকে 'আমিরুল উমারা' উপাধিতে ভূষিত করেন।[৪৭৪]

এ পদ সৃষ্টির কারণে গভর্নরদের মধ্যে নতুন করে প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং প্রত্যেকেই একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। ৩২৬ হি. মোতাবেক ৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ইবনু রায়েকের ক্ষমতা হ্রাস পায়। বাজকাম নামক একজন সেনাপতি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে শাসনক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেয়। এরপরের বছর বাজকাম নিজেই আমিরুল উমারা পদ গ্রহণ করে। কিন্তু আহওয়াজের শাসক আবু আবদিল্লাহ বুরাইদি আবার তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হন।

মুত্তাকির খেলাফত

রাজির মৃত্যুর পর রাজন্যবর্গ ও আব্বাসি খেলাফতের সদস্যরা জাফর বিন মুকতাদিরকে খলিফা মনোনীত করে এবং তাকে মুত্তাকি উপাধিতে ভূষিত করে।[৪৭৫] এর চার মাস পরেই জনৈক তুর্কির হাতে বাজকাম নিহত হয়।[৪৭৬]

---

৪৭৪. *তাজারিবুল উমাম*, খ. ১, পৃ. ৩৫১-৩৫২।

৪৭৫. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ৯১, ৯৩-৯৪।

৪৭৬. *তাজারিবুল উমাম*, খ. ২, পৃ. ৯-১০।

মুত্তাকি রাজক্ষমতা লোভী প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাদের হাতে নিছক ক্রীড়নক হিসেবে ছিলেন। তার শাসনামলে প্রধানমন্ত্রীর পদ বুরাইদির হাতে স্থানান্তর হয়।[৪৭৭] প্রকাশ থাকে যে, খলিফা সৈন্যদের মাত্রাতিরিক্ত প্রত্যাশা ও প্রয়োজন পূরণে অক্ষম ছিলেন, যে কারণে তিনি তাদের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হন। অবশেষে বাগদাদে নৈরাজ্য সৃষ্টি হলে খলিফা বাগদাদ ছেড়ে চলে যান।[৪৭৮] ফলে ইবনু রায়েক পুনরায় আমিরুল উমারার পদ গ্রহণ করেন।[৪৭৯]

মুস্তাকফির খেলাফত

ইবনু রায়েকের সাথে দ্বন্দ্বের কারণে খলিফা নাসিরুদ্দৌলাহ হামদানিকে (৩৩০ হি. মোতাবেক ৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে) এবং তারপরে তুজুন তুর্কিকে আমিরুল উমারা নিযুক্ত করেন।[৪৮০] তুজুন তুর্কি আশঙ্কা করেন, খলিফা ও মিসরে অবস্থানকারী তুলুন বংশীয়দের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়ে যেতে পারে, যা তার জন্য ক্ষতির কারণ। এ আশঙ্কা থেকে তুজুন খলিফাকে পদত্যাগে বাধ্য করেন এবং আবদুল্লাহ বিন মুকতাফিকে তার স্থলাভিষিক্ত করে তাকে আল-মুস্তাকফি উপাধি প্রদান করেন।[৪৮১] এরপর তুজুন একাই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তারপর ইবনু শিরজাদ তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আমিরুল উমারা পদবি ধারণ করেন। পরবর্তীকালে মুইজ্জুদ্দৌলাহ বিন বুওয়াইহি বাগদাদে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং আমিরুল উমারার পদ বাতিল করে দেন।[৪৮২]

যানজদের আন্দোলন

যানজদের আন্দোলন আব্বাসি খেলাফতের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। আব্বাসিদের হাতে যানজদের পতনের পূর্বে তারা প্রায় ১৫ বছর (২৫৫-২৭০ হি. মোতাবেক ৮৬৯-৮৮৩ খ্রি.) রাজত্ব করে। এ আন্দোলনের সূচনা হয় মুহাল্লাবি ও হামদানি-সহ আরও কিছু আরবদের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দল সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। যেমন : যানজ, বেদুইন ও দুর্বল শ্রেণির আরব। এ ছাড়াও আরও কিছু আরবগোত্র কেন্দ্রীয় খেলাফতের

---

৪৭৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৩।

৪৭৮. *আল-ইনবা ফি তারিখিল খুলাফা*, পৃ. ১৩৪।

৪৭৯. *তাজারিবুল উমাম*, খ. ২, পৃ. ২২।

৪৮০. *তাজারিবুল উমাম*, খ. ২, পৃ. ২৮, ৪৪।

৪৮১. *আল-ইনবা ফি তারিখিল খুলাফা*, পৃ. ১৪১।

৪৮২. *তাজারিবুল উমাম*, খ. ২, পৃ. ৮১-৮২, ৮৪-৮৫।

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পারসিক বংশোদ্ভূত আলি বিন মুহাম্মাদ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। সে ছিল বিচিত্র স্বভাবের অধিকারী, উচ্চাভিলাষী ও দুনিয়াবিমুখতা থেকে বহুদূরে অবস্থানকারী। আলি নিজ ক্ষমতালিপ্সাকে চরিতার্থ করতে মুসলিমসমাজে বিরাজমান বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করে। আলাভিদের সমর্থন লাভের জন্য তিনি নিজেকে আলি বংশোদ্ভূত বলে দাবি করেন; যদিও খেলাফতের বিষয়ে আলাভিদের সাথে তার চিন্তাগত বিরোধ ছিল। সে খারেজিদের মতাদর্শ গ্রহণ করে এবং জীবনের একপর্যায়ে তাদের মতাদর্শ প্রচারও করে। ক্রীতদাসদের দুঃখ-কষ্টকে সে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। আলি দাবি করে—আল্লাহ তাকে ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য প্রেরণ করেছেন। এ ছাড়াও সে অদৃশ্যের জ্ঞান ও নবুওয়তের দাবি করে।[৪৮৩] আদর্শগত বিরোধ সত্ত্বেও তার আন্দোলনে বিভিন্ন দল অংশগ্রহণ করে এবং তারা কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলে। একপর্যায়ে এ আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী আলি বিন মুহাম্মাদ ক্ষমতা দখলের দুঃসাহস করে।

আলি আন্দোলনের ডাক দিলে মানুষ তার ডাকে সাড়া দেয়। তার এ ডাকে সাড়াদানের পেছনে তিনটি মৌলিক কারণ ছিল :

রাজনৈতিক : তুর্কিদের প্রভাব বৃদ্ধির কারণে খেলাফতব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। পাশাপাশি বিত্তবান ও ক্রীতদাসদের মধ্যকার সুপ্ত দ্বন্দ্ব আলি বিন মুহাম্মাদের ডাকে নতুন করে চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক : অধঃমুখী ও ভঙ্গুর অর্থনীতি এবং মুসলিমসমাজের শ্রেণি বৈষম্য। বিত্তশালী ও সাধারণ জনগণের মধ্যকার বিস্তর তফাত জনমানুষের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সামাজিক : ক্রীতদাস শ্রেণির অতি সাধারণ জীবনমান। তারা কঠিন দুরবস্থার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করত। জলাভূমি সেচা, ক্ষেত থেকে ময়লা সরিয়ে তাকে লবণ চাষের উপযোগী করে তোলা, অতঃপর লবণ বহন করে তা পরিবেশন ও বিক্রয়ের মতো কঠিন কঠিন কাজ করত; কিন্তু বিনিময়ে তাদের ভাগ্যে জুটত শুধু সামান্য পরিমাণ খাদ্য। এ শ্রেণির লোকগুলো তাদের কষ্টের জীবন ও কঠোর পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেতে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।[৪৮৪]

---

৪৮৩. *তারিখে তাবারি*, খ. ৯, পৃ. ৪১২।

৪৮৪. *আত-তারিখুল ইসলামি ওয়া ফিকরুল কারনিল ইশরিন*, পৃ. ৩২৮।

আলি বিন মুহাম্মাদ মাত্র ১০ বছরের ব্যবধানে আহওয়াজ ও ওয়াসিতের মধ্যবর্তী বিশাল ভূখণ্ডের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে; এমনকি বাগদাদের ওপরও চোখ রাঙানি দেয়। তখন খলিফা মু'তামিদ তার ভাই আবু আহমাদ মুওয়াফফাক তালহাকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করেন। মুওয়াফফাক যানজদের সাথে লড়াই করলে আলি বিন মুহাম্মাদ তাতে নিহত হয়। তার বাকি অনুসারীরা আত্মসমর্পণ করে।[৪৮৫]

প্রকৃতপক্ষে যানজদের[৪৮৬] আন্দোলনটি ছিল বসরার জলাভূমি ও সমতল ভূমিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের ফলাফল। শুরুতে তার কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল বটে; কিন্তু পরে নৈরাজ্য সৃষ্টি হলে তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুলো ব্যাহত হতে থাকে। এরপর বিপ্লবী কর্মসূচি গ্রহণের ফলে নৈরাজ্য আরও বেড়ে যায়। এর নেতাকর্মীরা নানা প্রকার লোভ-লালসায় জড়িয়ে পড়ে। তথাপি আন্দোলনের নেতাকর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল।

প্রকাশ থাকে যে, আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ গ্রহণ ও সামাজিক বিপ্লব; সংস্কার ও সংশোধন তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তা ছাড়া এর নেতৃত্বদানকারী নিজেকে নেতৃত্বের চিন্তা থেকে মুক্ত করতে পারেনি। উপরন্তু এ বিপ্লবের পরিধি ছিল আঞ্চলিক ও সীমিত; কোনো ব্যাপক কর্মসূচি তাদের ছিল না। উল্লেখ্য যে, আলি বিন মুহাম্মাদ ইরাকের একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করতে সমর্থ হয়নি। যেমন : কৃষক শ্রেণি, শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা, পেশাজীবী; এমনকি কেন্দ্রীয় শাসনের বিরোধিতাকারী কারামিতারাও না। এ অসহযোগের কারণে ক্রীতদাসরা তাদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও দুর্বল হয়ে পড়ে।

অপরদিকে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন এবং আব্বাসিদের বিদ্রোহ দমনের দৃঢ়সংকল্প বিদ্রোহী নেতাকে তার সেনাবাহিনী সুশৃঙ্খল, সুগঠিত ও মজবুত ঘাঁটি নির্মাণ করার সুযোগ দেয়নি। ফলে, এ আন্দোলন স্বাভাবিকভাবে তার মানবিক ও বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে।[৪৮৭]

---

৪৮৫. *তারিখে তাবারি*, খ. ৯, পৃ. ৬১৪-৬১৫, ৬৩১।

৪৮৬. যানজ : কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান দাসশ্রেণি।

৪৮৭. যানজদের আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : *ছাওরাতুয যানজ ওয়া কাইদুহা*, আলি বিন মুহাম্মদ, পৃ. ১৪৫-১৬৫।

আলাভিদের সাথে সম্পর্ক

এ সময়ে আলাভিরা বেশ কয়েকটি আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে, অনেক রাজ্য কেন্দ্রীয় শাসন থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং মুসলিমবিশ্বে আলাভি মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে ইসমাঈলিয়্যাহ ও কারামিতাদের[৪৮৮] আন্দোলন অন্যতম। উল্লেখযোগ্য যে, ইসমাঈলিয়্যারা নিজেদেরকে ইসমাঈল বিন জাফর সাদিকের অনুসারী বলে দাবি করত।

অবশেষে ইসমাঈলিদের প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখে। ২৯৭ হি. মোতাবেক ৯১০ খ্রিষ্টাব্দে উবাইদুল্লাহ বিন মাহদির নেতৃত্বে আফ্রিকায় উবাইদি সাম্রাজ্য এবং ২৫০ হি. মোতাবেক ৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তাবারিস্তানে হাসান বিন যায়েদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈলের নেতৃত্বে জায়েদি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়।[৪৮৯]

* * *

---

৪৮৮. হামদান বিন আশআস উরফে কারমাতের দিকে সম্পৃক্ত করে তাদের আন্দোলনকে কারমাতিয়্যাহ আন্দোলন বলে নামকরণ করা হয়।

৪৮৯. *তারিখু ইরান বা'দাল ইসলাম*, আব্বাস ইকবাল, পৃ. ২০-২১।

তাহেরি সাম্রাজ্য

(২০৫-২৫৯ হি./৮২০-৮৭৩ খ্রি.)

পারস্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে তাহেরি সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। তাহের বিন হুসাইন এর গোড়াপত্তন করেন, যিনি ছিলেন খলিফা মামুনের একজন সেনাপতি। খলিফা তাকে ২০৫ হি. মোতাবেক ৮২০ খ্রিষ্টাব্দে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। সেই সঙ্গে তাকে বাগদাদ থেকে নিয়ে পূর্ব দিকের সকল প্রদেশ, এমনকি হিন্দুস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোর দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি নিশাপুরে তার রাজধানী স্থাপন করেন।[৪৯০] দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা তাহেরকে প্ররোচিত করতে থাকে। ফলে, তিনি ২০৭ হি. মোতাবেক ৮২২ খ্রিষ্টাব্দে মামুনের আনুগত্য ত্যাগ করেন, অতঃপর কালো পোশাক বর্জনের মাধ্যমে বাগদাদের কেন্দ্রীয় শাসন থেকে পৃথক হওয়ার ঘোষণা করেন।[৪৯১] তবে তাহেরের অকস্মাৎ মৃত্যু হলে তার প্রতিনিধিরা তার অর্জনসমূহ অক্ষুণ্ন রাখতে ব্যর্থ হয়। অবশ্য তারা কেন্দ্রীয় খেলাফতের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রাখারও চেষ্টা করে। কিন্তু আলাভিদের অব্যাহত আন্দোলনের সামনে তারা অক্ষম হয়ে যায়। পরিশেষে সাফফারিদের উপর্যুপরি আক্রমণে তাদের পতন হয়।

* * *

---

৪৯০. *তারিখে তাবারি*, খ. ৮, পৃ. ৫৭৭, ৫৯৫।

৪৯১. *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ৪১৩।

সাফফারি সাম্রাজ্য

(২৫৪-২৯৮ হি./৮৬৮-৯১১ খ্রি.)

মুসলিমবিশ্বের পূর্বপ্রান্তে তথা পারস্যে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দেয়, এ সাম্রাজ্যের মাধ্যমে তার বিস্তৃতি ঘটে। ইয়াকুব বিন লাইস আস-সাফফার যানজিদের সাথে খলিফার যুদ্ধের কারণে কেন্দ্রীয় খেলাফতের মধ্যে যে দুর্বলতা আসে, তার সুযোগে ২৫৪ হি. মোতাবেক ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে সাফফারি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। পারস্যের দেশগুলোও তার সঙ্গে যুক্ত হয়। তিনি তাহেরি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে খোরাসানের দিকে অগ্রসর হন। অতঃপর সিজিস্তান, কাবুল উপত্যকা, সিন্ধু ও মাকরানে আধিপত্য বিস্তার করেন।[৪৯২] এরপর পূর্বাঞ্চলের অবস্থা লিখে খলিফার কাছে পত্র প্রেরণ করেন।

প্রকাশ থাকে যে, খলিফা সাফফারি নেতা ইয়াকুবের সাম্রাজ্য বিস্তার ও সার্বিক কর্মকাণ্ডে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই কেন্দ্রীয় শাসন তাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে ইরাকের দিকে বাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু সাফফারি বাহিনীর মোকাবেলা করা সম্ভব নয়, খলিফা এ কথা বুঝতে পেরে সন্ধির প্রস্তাব করেন। ইয়াকুব এ প্রস্তাবে সাড়া দিলে খলিফা তাকে পূর্ব দিকের বিভিন্ন প্রদেশ, বাগদাদের দুটি জেলা ও সামাররা শাসনের সুযোগ প্রদান করেন।[৪৯৩]

আরও প্রকাশ থাকে যে, খলিফা শুধু প্রয়োজন অনুপাতে সন্ধি করতে রাজি হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে মাওয়ারা-উন-নাহরে নাসর বিন আহমাদ সামানির নেতৃত্বে একটি মিত্ররাষ্ট্র কায়েম করে ইয়াকুবের প্রভাব কমিয়ে আনেন।

---

[৪৯২] প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৫৯-৪৬০; আল-কামেল ফিত তারিখ : খ. ৬, পৃ. ২৪৭-২৪৮।

[৪৯৩] তারিখে তাবারি : খ. ৯, পৃ. ৫১৪, ৫১৬; ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান : ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান : ইবনু খাল্লিকান, খ. ৬, পৃ. ৪১৩।

ইয়াকুব তার প্রতি খলিফার বৈরী আচরণ অনুভব করে এ অবস্থার অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে ২৬৫ হি. মোতাবেক ৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষ্য বাস্তবায়নের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে।[৪৯৪]

সময়ের বিবর্তনে কেন্দ্রীয় খেলাফত ও সাফফারি সাম্রাজ্যের খলিফাদের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন হয়। তাদের মধ্যে কখনো মৈত্রী সম্পর্ক আবার কখনো বৈরী সম্পর্ক বিরাজ করে। খলিফা এ বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে বিনাশের সংকল্প করে পূর্ব দিকের প্রদেশগুলোতে বাহিনী প্রেরণ করেন। এভাবে তিনি ইয়াকুবের সহোদর আমরের প্রাদেশিক শাসকদের দমন করতে সক্ষম হন। পরিশেষে আহমাদ বিন ইসমাঈল সামানি ২৯৮ হি. মোতাবেক ৯১১ খ্রি. সালে সিজিস্তানের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং এর মাধ্যমে সাফফারি সাম্রাজ্যের পতন হয়।[৪৯৫]

* * *

৪৯৪ আল-কামেল ফিত তারিখ : খ. ৬, পৃ. ৩৬০-৩৬১।

৪৯৫ তারিখে তাবারি : খ. ১০, পৃ. ১৪৩-১৪৪।

সামানি সাম্রাজ্য

(২৬১-৩৮৯ হি./৮৭৪-৯৯৯ খ্রি.)

মাওয়ারা-উন-নাহরের ভূখণ্ডে সামানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সাম্রাজ্য পারস্য ছাড়িয়ে খোরাসানে আধিপত্য বিস্তার করে। এমনকি তাবারিস্তান, রায়, জাবাল ও সিজিস্তানকে অধিভুক্ত করে নেয়। তারা পারস্য ভাষা ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে পারসিক বিচ্ছিন্নতাবাদকে চাঙ্গা করে তোলে।[৪৯৬] উল্লেখ্য যে, পারস্যের একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারের দিকে সম্পৃক্ত করে এদের সামানি বলা হয়। তারা তাদের রাজনৈতিক জীবনে খলিফার আনুগত্যে অটল থাকার চেষ্টা করে। তারা মূলত অন্যান্য ইসলামি সাম্রাজ্যের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব পরিহার করে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতি মনোনিবেশ করে। আমুদরিয়ার পূর্বপ্রান্তে তুর্কিস্তানে তার বিজয় নিশ্চিত হয়।

অপরদিকে কেন্দ্রীয় খেলাফত সামানিদের মধ্যে নিষ্ঠাবান শাসক খুঁজে পায়। তবে ওই সকল শাসক নিজেদের প্রদেশগুলোতে পূর্ণ কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা ভোগ করে। এদিকে কেন্দ্রীয় খেলাফত পূর্ব দিকের প্রদেশগুলোতে কর্তৃত্ব বহাল রাখতে ওই সকল শাসকদের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

সামানি সাম্রাজ্য তার শেষযুগে পারিবারিক দ্বন্দ্ব এবং সেনাপতি ও প্রাদেশিক গভর্নরদের বিদ্রোহের কারণে অভ্যন্তরীণ চাপের মুখে পড়ে। তা ছাড়া বাইরে থেকে দায়লাম, বুওয়াইহি, তুর্কি খান ও গজনবিদের হামলার আশঙ্কা তৈরি হয়। ফলে, তাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রতি লালায়িত হয়ে ওঠে। পরিশেষে সামানি সাম্রাজ্য গজনবি ও তুর্কি খানদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।[৪৯৭]

উল্লেখ্য যে, সামানিরা রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। তাদের শাসনামলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল—জ্ঞান ও সাহিত্যের জাগরণ।

---

৪৯৬. Literary History of Persia : Brown. I pp 356, 369, 399.
৪৯৭. *তারিখু ইরান বা'দাল ইসলাম*, পৃ. ৬২।

তাদের রাজধানী ছিল রায়, যা ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। আর রাজনৈতিক দিক থেকে তারা পূর্ব দিকের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে এবং তুরস্ক পর্যন্ত ইসলামের প্রভাব বর্ধিত করে। এতৎসত্ত্বেও তারা একদিনের জন্য খেলাফতের আনুগত্য বর্জন করেনি।[৪৯৮]

* * *

৪৯৮. *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, খ. ১, পৃ. ১৫২-১৫৩।

তুলুনি সাম্রাজ্য

(২৫৪-২৯২ হি./৮৬৮-৯০৫ খ্রি.)

আহমাদ বিন তুলুন তুলুনি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। তিনি ছিলেন একজন তুর্কি বংশোদ্ভূত সম্রাট। তার পিতার মৃত্যুর পর তার মাতা আমির বায়েকবাক তুর্কিকে বিবাহ করেন, যাকে খলিফা মু'তাজ ২৫৪ হি. মোতাবেক ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি আহমাদকে নিজ প্রতিনিধি হিসেবে মিসরে প্রেরণ করেন। তৎকালীন ভঙ্গুর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তার নিজের অবস্থান মজবুত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এরপর খলিফা মুহতাদি সিরিয়ায় বিরাজমান বিশৃঙ্খলার প্রেক্ষিতে তাকে সেখানকার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোর দায়িত্ব প্রদান করেন।[৪৯৯] বায়েকবাকের মৃত্যুর পর বারজুখ তার স্থলাভিষিক্ত হন। অতঃপর বারজুখের মৃত্যুর পর আহমাদ বিন তুলুন (২৫৯ হি. মোতাবেক ৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফার পক্ষ থেকে মিসরের শাসক নিযুক্ত হন।[৫০০]

দায়িত্ব গ্রহণ করেই আহমাদ বিন তুলুন তার সংস্কার কাজ শুরু করেন। যা মিসরের প্রতি তার গভীর মনোযোগকে নির্দেশ করে। এর মাধ্যমে তিনি খেলাফত থেকে পৃথক হয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র কায়েমের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি মিসরের প্রাচীন নগরী ফুসতাতের সন্নিকটে আল-কাতাই (Al-Qatai) নামক শহর নির্মাণ করেন এবং সেখানে একটি বিখ্যাত মসজিদ নির্মাণ করেন, যা আজও বিদ্যমান। তিনি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসসমূহ বৃদ্ধি করেন এবং অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করেন। এভাবে তিনি অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করে স্বনির্ভরতা অর্জন করেন। এ ছাড়াও তিনি রায়-এর খাল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীরসমূহ সংস্কার করেন এবং সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য উপঢৌকন গ্রহণ নিষিদ্ধ করেন।

---

৪৯৯. *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, ইবনু তাগরি বারদি, খ. ৩, পৃ. ৭।
৫০০. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৬, পৃ. ২৫০।

এ সকল সংস্কার কাজের মাধ্যমে আহমাদ বিন তুলুনের হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ জমা হয়ে যায়। এর সাহায্যে তিনি একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হন। যা তাকে স্বাধীন রাষ্ট্রগঠন ও তার প্রতিরক্ষার কাজে সাহায্য করে।

আহমাদ বিন তুলুন সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটি মোকাবেলা করেন, তা হলো আবু আহমাদ মুওয়াফফাক তালহার সাথে বৈরী সম্পর্ক। যিনি বাগদাদের সার্বিক বিষয়ে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং কেন্দ্রীয় শাসনকে পুনরুজ্জীবিত করতে একটি সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। এ ধারাবাহিকতায় তিনি তুলুন সাম্রাজ্যের পতন ঘটানোর চেষ্টা করেন, যা তখন কেন্দ্রীয় শাসন থেকে পৃথক হয়ে সিরিয়ার দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করে। কিন্তু মুওয়াফফাকের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইবনে তুলুন খলিফার সাথে সুসম্পর্কের কারণে মিসর, সিরিয়া ও তার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোর শাসনাধিকার লাভে সমর্থ হন।[৫০১]

ইবনে তুলুন মুওয়াফফাকের সাথে দ্বন্দ্বের সুবাদে খেলাফতের রাজধানী মিসরে স্থানান্তরের চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি খলিফা ও মুওয়াফফাকের মধ্যকার সম্পর্কের দূরত্বের সুবিধা গ্রহণ করেন। তবে তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।[৫০২]

প্রকাশ থাকে যে, মুওয়াফফাকের শান্তিচুক্তির কোনো ইচ্ছা ছিল না। বরং তিনি সর্বদা তার প্রতিপক্ষদের বিতাড়নের চেষ্টা করেন। এমনকি মিসর ও সিরিয়া থেকে তার প্রতিপক্ষের গভর্নরদের বিতাড়িত করে সেখানে ইসহাক বিন কিনদাজকে গভর্নর নিযুক্ত করেন।[৫০৩] এতে করে তুলুনি সাম্রাজ্যের শক্তিতে অনেকাংশে ভাটা পড়ে। অতঃপর রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উভয় পক্ষ আলোচনায় বসতে সম্মত হয়। কিন্তু বৈঠকের পূর্বেই ইবনে তুলুন মৃত্যুবরণ করেন। ২৭০ হিজরির জিলকদ মাসের শুরুতে তথা ৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে তার মৃত্যু হয়।[৫০৪]

তারপর তার পুত্র খুমারাওয়াইহ উত্তরাধিকারসূত্রে তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং মিসর ও সিরিয়ায় তুলুনি সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। তখনো

---

৫০১. প্রাগুক্ত : খ. ৬, পৃ. ২৫০, ৩৫৩।

৫০২. *কিতাবুল উলাত ওয়াল কুযাত*, আল-কিন্দি, পৃ. ২২৫, ২২৯।

৫০৩. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৩, পৃ. ৬৯৫।

৫০৪. *সিরাতু আহমাদ বিন তুলুন*, আল-বালাভি পৃ. ৩০৫; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৬, পৃ. ৪২৭-৪২৮।

তুলুনি সাম্রাজ্য ও খলিফার মাঝে বৈরী সম্পর্ক ছিল। মুওয়াফফাক তাকে পদচ্যুত করা বা যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বিশেষ করে ফিলিস্তিনের দক্ষিণে আবু ফিতরাস নদীর তীরে তাওয়াহীন যুদ্ধে তুলুনি বাহিনীর সামনে পরাজয় বরণের পর তার মনোবল ভেঙে যায়। ২৭১ হি. মোতাবেক ৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৫০৫]

খুমারাওয়াইহের শাসনামলে তুলুনি সাম্রাজ্য প্রচুর-শক্তি সঞ্চয় করে। খুমারাওয়াইহ একাধিক যুদ্ধে বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও শান্তিচুক্তি করতে আগ্রহী হন। সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব করে তিনি আব্বাসি খলিফার সাথে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। অবশেষে দুপক্ষের সম্মতিতে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যে, তুলুনিরা আগামী ৩০ বছর মিসর, সিরিয়া ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো শাসন করবে এবং বিনিময়ে খলিফাকে অতি সামান্য কর প্রদান করবে। পরবর্তী সময়ে খলিফা মুতাজিদ খুমারাওয়াইহের কন্যা কাতরুন নাদাকে বিবাহ করলে উক্ত সম্পর্ক আরও জোরালো হয়।[৫০৬]

২৮২ হি. মোতাবেক ৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে খুমারাওয়াইহ তার জনৈক গোলামের হাতে নিহত হন। তার মৃত্যুর পর তুলুনি সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এবং ক্রমেই এর অবনতি হতে থাকে। সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বেজায় হস্তক্ষেপ শুরু করে, অমাত্যবর্গ পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। পরিশেষে খলিফা মুকতাফির হাতে তাদের পতন নিশ্চিত হয়। তিনি ২৯২ হি. মোতাবেক ৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে বাহিনী প্রেরণ করলে তারা 'আল-কাতাই' শহরের মসজিদ বাদ দিয়ে বাকি সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। তখন এ দেশ পুনরায় সরাসরি আব্বাসি খেলাফতের আওতাভুক্ত হয়।[৫০৭]

* * *

---

[৫০৫]. *তারিখে তাবারি*, খ. ১০, পৃ. ৮; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৬, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪।

[৫০৬]. *তারিখে তাবারি*, খ. ১০, পৃ. ২০-২১, ২৯-৩০; *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ৩, পৃ. ৫১।

[৫০৭]. *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ৩, পৃ. ১৩৪-১৪০।

ইখশিদি সাম্রাজ্য

(৩২৩-৩৫৮ হি./৯৩৫-৯৬৯ খ্রি.)

তুলুনি সাম্রাজ্যের পতনের মাধ্যমে মিসর পুনরায় আব্বাসি খেলাফতের অধীনে চলে আসে। কিন্তু মুকতাদিরের শাসনামলে খেলাফত আবার দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মিসর-সহ বিভিন্ন প্রদেশে শাসন টিকিয়ে রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে ফাতেমিদের পক্ষ থেকে এ অঞ্চলে আক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হয়। সব মিলিয়ে একজন কঠোর শাসকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়, যিনি শূন্যতা পূরণ করে বিপদ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবেন এবং ফাতেমিদের সামনে মিসরে মজবুত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবেন। তখন খলিফা মুহাম্মাদ বিন তুগ্‌জ বিন জুফকে (৩২৩ হি. মোতাবেক ৯৩৫ খ্রি.) মিসরের গভর্নর করে এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন।[৫০৮]

মুহাম্মাদ বিন তুগজ আহমাদ বিন তুলুনের নীতি অনুসরণ করে প্রথমে কেন্দ্রের অভ্যন্তরকে শক্তিশালী করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। ৩২৪ হিজরি (৯৩৬ খ্রি.) ফাতেমিরা মিসর আক্রমণ করলে তিনি সফলভাবে এর মোকাবেলা করেন। একই সঙ্গে তিনি আব্বাসি খেলাফতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। তখন খলিফা তাকে সিরিয়ারও দায়িত্ব প্রদান করেন এবং 'ইখশিদ' উপাধিতে ভূষিত করেন।[৫০৯]

সে সময় আমিরুল উমারা পদ নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে আব্বাসি খেলাফত কিছু ত্বরিত বিবর্তন প্রত্যক্ষ করে। ইখশিদও এ প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করেন এবং ৩২৮ হি. মোতাবেক ৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে আরিশ নামক এলাকায় ইবনে রায়েককে পরাজিত করেন।[৫১০] তবে ইখশিদ ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে ইবনে রায়েকের সাথে সন্ধি করেন এবং রামলার উত্তরে অবস্থিত সিরিয়া ভূমি তার জন্য ছেড়ে দেন। তার মৃত্যুর পর (৩৩০ হি. মোতাবেক ৯৪২

---

৫০৮. প্রাগুক্ত : খ. ৩, পৃ. ২৫১।

৫০৯. *কিতাবুল উলাত ওয়াল কুযাত*, পৃ. ২৮৮। ফারগানি ভাষায় ইখশিদ শব্দের অর্থ সম্রাট বা রাজাধিরাজ।

৫১০. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ১০৪।

খ্রি.) ইখশিদ সমগ্র সিরিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন।[৫১১] খলিফা মুত্তাকি উত্তরাধিকারসূত্রে তার মিসর শাসনের স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং সিরিয়ার শাসক হিসেবে তাকেই বহাল রাখেন।[৫১২]

উত্তর দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় সাইফুদ্দৌলাহ হামদানির সাথে ইখশিদের সংঘর্ষ হয়। কিন্তু ইখশিদ সংঘর্ষে বিজয় লাভ করেও পেছনে ফিরে যান। কারণ, তখন তিনি সিরিয়ার উত্তর প্রান্তে হামদানি বাহিনীর মতো বাইজেন্টাইনদের মোকাবেলার জন্য শক্তিশালী মুসলিম সেনাবাহিনীর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

ইবনে তুলুনের অনুসরণ করে ইখশিদও খেলাফতের রাজধানী মিসরে স্থানান্তরের চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তুর্কি শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং হামদানিদের খলিফা আল-মুত্তাকিকে সহায়তা থেকে সরে আসার বিষয়টিকে মোক্ষম সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেন। তবে খলিফা তার রাজধানী ছাড়তে অস্বীকৃতি জানালে তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়।[৫১৩]

৩৩৪ হি. মোতাবেক ৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ইখশিদ মৃত্যুবরণ করেন।[৫১৪] তখন কাফুর রাজত্বের হাল ধরেন এবং ইখশিদের অসিয়ত মোতাবেক তার পুত্রদ্বয় আনোজুর ও আলির অভিভাবকত্ব লাভ করেন। তিনি দীর্ঘকাল অভিভাবকের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি ধরে রাখতে সক্ষম হন। কিন্তু ৩৫৭ হি. মোতাবেক ৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু হলে মিসরে আবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তখন ফাতেমিরা মিসরে আক্রমণ করে। এর পরের বছর তারা মিসরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং ইখশিদি শাসনের পতন ঘটায়।[৫১৫]

---

৫১১. *তাজারিবুল উমাম*, খ. ২, পৃ. ২৭-২৮।

৫১২. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ১০৪।

৫১৩. *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ৪৬; *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ৩-পৃ. ২৫৪

৫১৪. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ১৬৩।

৫১৫. *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ৪, পৃ. ১৮, ২৪-২৫।

মসুল ও আলেপ্পোতে হামদানি শাসন

হামদান বিন হামদুন হলেন আরবের তাগলিব গোত্রের একজন নেতা। তার অনুসারীদের হামদানি বলে নামকরণ করা হয়। তাগলিব গোত্র মসুলের উপকণ্ঠে বসতি গড়ে। হামদান ২৬০ হি. মোতাবেক ৮৭৪ খ্রি. থেকে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২৭৭ হিজরি মোতাবেক ৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খারেজিদের সহায়তায় উঁচু জাজিরার মারদিন দুর্গে আধিপত্য বিস্তার করেন। ২৮১ হি. মোতাবেক ৮৯৪ খ্রি. সালে খলিফা মুতাজিদ তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে পরাস্ত করেন। হামদান তার পুত্র হুসাইনকে হামদানের শাসনক্ষমতা অর্পণ করে মসুল ছেড়ে পলায়ন করেন। তিনি খলিফার হাতে বন্দি হন; তথাপি তার পুত্র হুসাইন খারেজিদের পরাজিত করলে খলিফা তাকে ক্ষমা করে দেন।[৫১৬] তখন থেকে রাজনীতির মঞ্চে হামদানিদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ২৯৩ হি. মোতাবেক ৯০৬ খ্রি. খলিফা মুকতাফি হুসাইনের সহোদর আবুল হায়জা আবদুল্লাহ বিন হামদানকে মসুলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। অনুরূপভাবে তার ভাই ইবরাহিমকে ৩০৭ হি. মোতাবেক ৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে দিয়ারে রাবিয়ার দায়িত্ব প্রদান করেন।[৫১৭]

আবদুল্লাহ পুত্র হাসানকে মসুলে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। হাসান উত্তর সিরিয়া-সহ পুরো জাজিরার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। ওদিকে বুরায়দি ও তার ভাইয়েরা ইরাকে একাধিকবার হামলা করলে খলিফা মুত্তাকি তার শরণাপন্ন হন। ৩৩০ হি. মোতাবেক ৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে তাকে পুরস্কৃত করে 'নাসিরুদ্দৌলাহ' উপাধি প্রদান করেন। সেই সঙ্গে তাকে আমিরুল উমারা (প্রধান আমির বা চিফ গভর্নর) নিযুক্ত করেন। এভাবেই তার ভাই আলিকে 'সাইফুদ্দৌলাহ' উপাধি প্রদান করেন।[৫১৮]

হামদানি পরিবারটি ৩৩৪ হি. মোতাবেক ৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ অধিকার করে নিলে তারা বুওয়াইহিদের শত্রুতার শিকার হয়। মুইজ্জুদ্দৌলাহ বুওয়াইহি হামদানিদের ওপর আক্রমণ করে তাদের পরাস্ত করেন। নাসিরুদ্দৌলাহ তার শাসনামলে বুওয়াইহিদের কর প্রদান করেন এবং তাদের নাম উল্লেখ করে খুতবা প্রদান করেন। একপর্যায়ে তার পুত্র আবু তাগলিব

---

[৫১৬]. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৬, পৃ. ৭৭-৭৮, ৮১।
[৫১৭]. প্রাগুক্ত : পৃ. ১১১।
[৫১৮]. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৮৪।

৩৫৬ হি. মোতাবেক ৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তাকে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করে এবং পারিবারিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে। কিন্তু রামলার আমির দাগফাল বিন মুফাররিজ ও ফাতেমিদের সাথে যুদ্ধের প্রাক্কালে ৩৬৯ হি. মোতাবেক ৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে সে নিহত হয়।[৫১৯]

তার ভাই আবু তাহেরের পক্ষে ৩৭৯ হি. মোতাবেক ৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মসুল পুনর্দখলের পর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল; তবে কুর্দিরা তার শাসনের অবসান ঘটায়। অতঃপর তার ভাই ও বংশধরগণ বুওয়াইহি ও ফাতেমিদের কাছে পরাজয়ের পর তাদের ক্ষমতা হারায়।[৫২০]

বাস্তবতা হলো, হামদানি পরিবারের অন্যতম সদস্য নাসিরুদ্দৌলার ভাই সাইফুদ্দৌলাহ যদি সুযোগের সঠিক ব্যবহার না করতেন, তাহলে ইতিহাসের পাতায় এ পরিবারের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান কোনোভাবেই সৃষ্টি হতো না। সাইফুদ্দৌলাহ ইরাক ও মিসরের মধ্যবর্তী উত্তর সিরিয়ায় নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

সাইফুদ্দৌলাহ বুঝতে পেরেছিলেন, খলিফার নিযুক্ত শাসক ও তার ডান হাত হয়ে তুর্কিদের সংঘাত এবং বুওয়াইহিদের লালসা ও আস্ফালনের মধ্য দিয়ে তার পক্ষে ইরাকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। এ কারণে তিনি সিরিয়ার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং ৩৩৩ হি. মোতাবেক ৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ইখশিদিনদের সাথে লড়াই করে আলেপ্পোর নিয়ন্ত্রণ হাতে নেন। এরপর তিনি দামেশকের দিকে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। সেখানে কাফুরের নেতৃত্বাধীন ইখশিদ বাহিনীর সাথে তার সংঘর্ষ হয়। এরপর তিনি তার পরবর্তী মিশন তথা বাইজেন্টাইনদের মোকাবেলার জন্য যুদ্ধবিরতি করেন, যার জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে শক্তি সঞ্চয় করে আসছিলেন। তখন বাইজেন্টাইন সম্রাট সিরিয়ায় বারংবার আক্রমণ করে আর্মেনিয়ার কিছু অংশ দখল করে নেয়। তোরেস ও মালাতিয়্যা পর্বতমালা এবং আরদরুমের মধ্যবর্তী দীর্ঘ সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ সময় মুসলিমরা তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকার কারণে বাইজেন্টাইনদের মোকাবেলা করতে অক্ষম ছিল। তখন নিকিফোরাস ফোকাস ও ইউহান্না জিমিসকিসের মতো সম্রাটরা এশিয়া মাইনর অতিক্রম করে সিলিসিয়া, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় আক্রমণ করে। তখন সাইফুদ্দৌলার একার পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কঠিন ব্যাপার ছিল। উপরন্তু

---

৫১৯. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ২৭০, ৩৬৬-৩৬৭।

৫২০. *যাইলু কিতাবি তাজারিবিল উমাম*, আবু শুজা, খ. ৩, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

তার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্য ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি ২০ বছর যাবৎ বাইজেন্টাইনদের মোকাবেলা করেন এবং পূর্বসূরিদের গৌরবগাথার পুনরাবৃত্তি করতে সক্ষম হন।

তিনি এশিয়া মাইনরে জোরালো আক্রমণ পরিচালনা করেন। এসব আক্রমণের মাধ্যমে বাইজেন্টাইন বাহিনীর মধ্যে বেশি প্রভাব না পড়লেও তিনি (৩৫৭ হি. মোতাবেক ৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) সিলিসিয়া, উত্তর সিরিয়া, এন্তাকিয়া ও তারসুস পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। পূর্ব দিকে দুই সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমান্ত ধরা হয় অরোন্টাস নদীর উত্তর তীরের পর্বতমালা এবং আলেপ্পোর উত্তর কূল ঘেঁষে মধ্য ফোরাতের বরাবর হয়ে তোরেস পর্বতমালার পূর্ব পাদদেশ এবং তাইগ্রিস নদীর ঝরনাসমূহকে। বাইজেন্টাইন সৈন্যরা আলেপ্পোর ওপর অবরোধ আরোপ করে। যুদ্ধের একপর্যায়ে সাইফুদ্দৌলাহ তাদেরকে আলেপ্পো শাসনের স্বীকৃতি প্রদান করেন।[৫২১]

ফাতেমিরা রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে প্রবেশ করলে সাইফুদ্দৌলাহ তাদের আনুগত্যের ঘোষণা করেন এবং তাদের মিসর অভিযানকে সমর্থন করেন। উপরন্তু তিনি আলাভি মাযহাব গ্রহণ করেন। তবে তার শাসনাধীন সকল অঞ্চলের ওপর তিনি আপন নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হন।[৫২২]

রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও সামরিক প্রস্তুতির পাশাপাশি সাইফুদ্দৌলাহ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য ও কবিতার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তার শাসনামল অনেক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম, লেখক, কবি ও সাহিত্যিকের মাধ্যমে সমৃদ্ধি লাভ করে। তন্মধ্যে আবুল ফাতাহ জিন্নি নাহবি, আবুত তায়্যিব আল-মুতানাব্বি অন্যতম। অনেক হামদানি শাসকও কবিতা রচনায় খ্যাতি লাভ করেন। যেমন, সাইফুদ্দৌলার চাচাতো ভাই আবু ফিরাস; এমনকি স্বয়ং সাইফুদ্দৌলাও ভালো কবিতা রচনা করতে পারতেন।[৫২৩]

৩০৬ হি. মোতাবেক ৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে সাইফুদ্দৌলাহ আলেপ্পোতে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর পর্যায়ক্রমে নিজ পুত্র সা'দুদ্দৌলাহ এবং নাতি সাঈদুদ্দৌলাহ

---

[৫২১]. *যুবদাতুল হালাব মিন তারিখি হালাব*, ইবনুল আদিম, খ. ১, পৃ. ১১১-১৪৫; *তারিখুশ শুউবিল ইসলামিয়্যা*, কার্ল ব্রোকেলম্যান, পৃ. ২৪২; *আদ-দাওলাতুল বায়যানতিয়্যা*, ড. সায়্যিদ বায আল-উরায়নি, পৃ. ৪৪৭-৪৬০, ৪৭২-৪৮৯।

[৫২২]. *তারিখুশ শুউবিল ইসলামিয়্যা*, প্রাগুক্ত।

[৫২৩]. *ইয়াতিমাতুদ দাহর*, ছাআলিবি, খ. ১, পৃ. ২১-২৩।

৩৯২ হি. মোতাবেক ১০০২ খ্রি. পর্যন্ত আলেপ্পো শাসন করেন। এরপর তারা ফাতেমিদের আক্রমণের আশঙ্কা দূর করতে বাইজেন্টাইনদের সাথে শান্তিচুক্তি করেন। পরিশেষে ৪০৬ হি. মোতাবেক ১০১৫ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমিদের মাধ্যমে হামদানি সাম্রাজ্যের অবসান হয়।[৫২৪]

* * *

[৫২৪]. *যুবদাতুল হালাব মিন তারিখি হালাব*, খ. ১, পৃ. ১৪৪, ১৪৬, ১৬৮, ১৮৮; Camb. Med. Hist IV pp 147-148.

আব্বাসি শাসনের তৃতীয় যুগ

(৩৩৪-৪৪৭ হি./৯৪৫-১০৫৫ খ্রি.)

বুওয়াইহি আধিপত্যের যুগ

আব্বাসি শাসনের তৃতীয় যুগের খলিফাগণ ও তাদের শাসনকাল

আবুল কাসেম আবদুল্লাহ আল-মুস্তাকফি	৩৩৩-৩৩৪ হি./৯৪৪-৯৪৬ খ্রি.
আবু কাসেম ফযল আল-মুতি	৩৩৪-৩৬৩ হি./৯৪৬-৯৭৪ খ্রি.
আবু বকর আবদুল কারিম আত-তায়ে	৩৬৩-৩৮১ হি./৯৭৪-৯৯১ খ্রি.
আবুল আব্বাস আহমাদ আল-কাদের	৩৮১-৪২২ হি./৯৯১-১০৩১ খ্রি.
আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-কায়েম	৪২২-৪৬৭ হি./১০৩১-১০৭৫ খ্রি.

এ যুগের সার্বিক অবস্থা

আল-মুস্তাকফির খেলাফত দিয়ে এ যুগের সূচনা এবং আল-কায়েমের খেলাফত দিয়ে এর সমাপ্তি। এ যুগের সাথে বুওয়াইহিদের ইতিহাস জড়িত। মুস্তাকফি, মুতি, তায়ে, কাদের ও কায়েম প্রমুখ এ যুগের প্রতিনিধিত্বকারী খলিফা।

বুওয়াইহি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন

চতুর্থ হিজরির শুরুভাগে রাজনীতির মঞ্চে বুওয়াইহিদের আবির্ভাব হয়।[৫২৫] বুওয়াইহি পরিবার দায়লাম থেকে ইরানের উত্তর প্রান্তে হিজরত করে। এ পরিবারের তিনভাই ছিল, যারা মারদাভিজ জাইয়ারির অধীনে চাকরি করত। আলি বিন শুজা বিন বুওয়াইহির মাধ্যমে তারা প্রসিদ্ধি লাভ করে। মারদাভিজের সাথে মতভেদ করে তার থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং ইসফাহান ও পারস্যে আধিপত্য বিস্তার করে। খলিফা এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পেরে তার শাসনের স্বীকৃতি প্রদান করেন। আলি শিরাজ নগরীকে তার রাজধানী ঘোষণা করে।[৫২৬] অতঃপর আলির ভাই হাসান পার্বত্য অঞ্চলে এবং তৃতীয় ভাই আহমাদ কিরমান ও খুজিস্তানে আধিপত্য বিস্তার করে ইরাকে প্রবেশের পথ তৈরি করে। এভাবে বুওয়াইহিরা পারস্য, আহওয়াজ, কিরমান, রায়, ইসফাহান ও হামদানে পৃথক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং ইরাকেও কার্যত আধিপত্য বিস্তার করে।

তখন আব্বাসি খেলাফত যানজ ও কারামিতাদের উপর্যুপরি বিদ্রোহ, বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং সামরিক ব্যবস্থাপনায় গোলযোগ-সহ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ছিল। তবে বুওয়াইহিদের রাজনৈতিক, সামরিক ও ভৌগোলিক বিস্তৃতির সামনে তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি; বরং তারা আহওয়াজ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। তবে তাদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ বিজয়ের সুবাদে বুওয়াইহিরা ইরাক আক্রমণের সুযোগ পেয়ে যায়, যেখানে গভর্নর ও শাসকদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। তখন আব্বাসি খেলাফত নিজেদের পতন ঠেকাতে বুওয়াইহিদের সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হয়। খলিফা আল-মুস্তাকফি আহমাদ বিন বুওয়াইহিকে ডেকে বাগদাদে প্রবেশের প্রস্তাব

---

৫২৫. *তাজারিবুল উমাম*, খ. ১, পৃ. ২৭৫-২৭৯।

৫২৬. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ১৫৭-১৫৮।

করেন। তুর্কিরা বাগদাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আহমাদ বিন বুওয়াইহি ৩৩৪ হি./৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে প্রবেশ করে। তখন খলিফা তাকে উপঢৌকন প্রদান করেন, আমিরুল উমারা পদে অভিষিক্ত করেন এবং মুইজ্জুদ্দৌলাহ উপাধি প্রদান করেন। সেই সঙ্গে তার ভাই আলিকে ইমাদুদ্দৌলাহ ও হাসানকে রুকনুদ্দৌলাহ উপাধি প্রদান করেন।[৫২৭]

প্রকৃতপক্ষে প্রথম যুগের বুওয়াইহিরা ছিল প্রভাবশালী শাসক। তাদের শাসনামলে তথা মধ্য যুগে ইসলামের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সভ্যতা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। স্বয়ং আযদুদ্দৌলাহ ছিল একজন শ্রেষ্ঠ শাসক। বুওয়াইহিরা অর্থনীতিতেও বিশেষ অবদান রাখে। বিশেষ করে পারস্যে তারা উন্নয়নমূলক বহু কাজ করে। শহরগুলোতে তারা দুষ্কৃতিকারীদের দমন করে এবং ইসফাহান, শিরাজ ও বাগদাদে উঁচু উঁচু ভবন নির্মাণ করে। ধর্মীয় দিক থেকে তারা ছিল কট্টর আলাভি শিয়া। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও তাদের ছিল বিশেষ অবদান। যেমন, তারা আরবি সংস্কৃতির চর্চাকারী আলেমদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখে। এমনিভাবে ফারসি সংস্কৃতির জাগরণেও তারা বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। তাদের নির্মিত সামরিক ঘাঁটি, গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসাকেন্দ্রগুলো ছিল সকলের বিস্ময় ও প্রেরণার উৎস।

বুওয়াইহিদের সঙ্গে আব্বাসি খেলাফতের সম্পর্ক

যেহেতু বুওয়াইহিরা আব্বাসি খেলাফতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল, তাই তাদের প্রতি প্রত্যাশা ছিল—তারা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে এবং মতাদর্শগত ফিতনা দমন করে খেলাফতের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ঐক্য পুনরুদ্ধার করবে। তবে এ প্রত্যাশা অপূর্ণই থেকে যায়। কারণ, আব্বাসি খলিফাদের সাথে তাদের মতাদর্শগত ভিন্নতা ছিল এবং তাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে তারা বাগদাদে প্রবেশ করেছিল।

ইরাকের কার্যত শাসন ও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ বুওয়াইহিদের হাতেই ছিল। আর খলিফার নাম ছাড়া সেখানে তার কোনো প্রভাব ছিল না। তার ভূমিকা এমন ছিল যে, যেন তিনি বুওয়াইহিদের বেতনভুক্ত কর্মচারী। তাদের শরণাপন্ন হওয়া এবং তাদের মতামত গ্রহণ ব্যতীত রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তসরুফ করার অধিকার যেন তার নেই। এ যুগে খলিফা প্রভাবশূন্য হয়ে পড়েন। তাকে যা আদেশ করা হয় তিনি যেন তা-ই করেন। মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে দ্বীনি

---

৫২৭. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ১৫৭।

বিষয়ে তাদের ওপর খলিফার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। আর বুওয়াইহিরাও নিজেদের স্বার্থে খলিফার পদ নিয়ে কোনো ঝামেলায় জড়াতে চায়নি। মুইজ্জুদ্দৌলাহ বাগদাদে প্রবেশ করে সকল বিষয়ের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর আব্বাসি খেলাফতকে বাতিল করে তার স্থলে আলাভি খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও জাইদিদের মধ্য হতে একজনকে খলিফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করেছিল। তার পক্ষে এটা সম্ভবও ছিল। কিন্তু তার সভাসদদের সাথে পরামর্শ করে সে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়। কারণ, সে বুঝতে পেরেছিল—এ পরিবর্তনের কারণে ইসলামি বিশ্বজুড়ে দুর্বার আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে; সেই সঙ্গে বুওয়াইহি সাম্রাজ্যও হুমকির সম্মুখীন হবে।

বুওয়াইহিদের শাসনামলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকার কারণে খলিফাগণ দীর্ঘকাল শাসনের সুযোগ পান। কেননা, তখন বুওয়াইহি শাসকরাই শাসনকার্যের সকল ঝুঁকি ও দায় বহন করত।

বুওয়াইহিদের অবসান

বাস্তবে বুওয়াইহিদের সমৃদ্ধির যুগ খুব দীর্ঘ ছিল না। তাদের ভুলের দায় শুধু তারাই বহন করেছেন এমন নয়। একাদশ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে ইসলামি বিশ্ব মতাদর্শ, সমাজ ও বর্ণবাদ ইত্যকার বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এদিকে সেনাবাহিনীর মাঝেও বিভিন্ন প্রকার দলাদলি ছিল। তা সত্ত্বেও আযদুদ্দৌলাহ ছিল সে-সকল নেতাদের একজন, যারা একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে তার খলিফারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ করে বুওয়াইহি সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করে। এতে বুওয়াইহি পরিবারের প্রভাব হ্রাস পায়। তখন প্রত্যেক শাসক তার সহযোগী দলের সাহায্য কামনা করে। এদিকে সেনাবাহিনীর মাঝেও বিভিন্ন প্রকার মতভেদ মাথাচাড়া দেয়, যা আব্বাসিদের শক্তি খর্ব করে।

এ সবকিছুর কারণে শাসকদের প্রতিপত্তি, রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস ও বেতন-ভাতা সবকিছু হ্রাস পায়। এদিকে অন্যায় ও অবিচারের কারণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিও অসন্তোষ দানা বাঁধে। সেই সুযোগে দুষ্কৃতিকারীদের ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে যায়।

৪০৩ হি./১০১২ খ্রিষ্টাব্দে বাহাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তার ছেলেদের দ্বন্দ্ব ও প্রভাবশালী তুর্কিদের ওপর নির্ভরতার কারণে বুওয়াইহি সাম্রাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে বুওয়াইহি পরিবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে এবং গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অবশেষে তুর্কি সেলজুকিদের উপর্যুপরি আক্রমণের মুখে ইরাক ও পারস্যে বুওয়াইহি সাম্রাজ্যের পতন হয়। তুর্কিরা ৪৪৭ হি./১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে প্রবেশ করে বুওয়াইহি শাসনের অবসান ঘটায়।[৫২৮]

* * *

৫২৮. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৮, পৃ. ১২৫-১২৬।

আব্বাসি শাসনের চতুর্থ যুগ

(৪৪৭-৬৫৬ হি./১০৫৫-১২৫৮ খ্রি.)

সেলজুকি তুর্কিদের আধিপত্যের যুগ

আব্বাসি শাসনের চতুর্থ যুগের খলিফাগণ ও তাদের শাসনকাল

আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-কায়েম	৪২২-৪৬৭ হি./১০৩১-১০৭৫ খ্রি.
আবুল কাসেম মুহাম্মাদ আল-মুকতাদি	৪৬৭-৪৮৭ হি./ ১০৭৫-১০৯৪ খ্রি.
আবুল আব্বাস আহমাদ আল-মুসতাযহির	৪৮৭-৫১২ হি./ ১০৯৪-১১১৮ খ্রি.
আবু মানসুর ফযল আল-মুসতারশিদ	৫১২-৫২৯ হি./১১১৮-১১৩৫ খ্রি.
আবু জাফর মানসুর আর-রাশেদ	৫২৯-৫৩০ হি./১১৩৫-১১৩৬ খ্রি.
আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আল-মুকতাফি	৫৩০-৫৫৫ হি./১১৩৬-১১৬০ খ্রি.
আবুল মুজাফফার ইউসুফ আল-মুসতানজিদ	৫৫৫-৫৬৬ হি./১১৬০-১১৭০ খ্রি.
আবু মুহাম্মাদ হাসান আল-মুসতাজি	৫৬৬-৫৭৫ হি./১১৭০-১১৮০ খ্রি.
আবুল আব্বাস আহমাদ আন-নাসের	৫৭৫-৬২২ হি./১১৮০-১২২৫ খ্রি.
আবু নাসর মুহাম্মাদ আজ-জাহের	৬২২-৬২৩ হি./১২২৫-১২২৬ খ্রি.
আবুল জাফর মানসুর আল-মুস্তানসির	৬২৩-৬৪০ হি./১২২৬-১২৪২ খ্রি.
আবু আহমাদ আবদুল্লাহ আল-মুসতা'সিম	৬৪০-৬৫৬ হি./১২৪২-১২৫৮ খ্রি.

এ যুগের সার্বিক পরিস্থিতি

খলিফা আল-কায়েমের খেলাফত আমলে এ যুগের সূচনা এবং আল-মুস্তা'সিমের মৃত্যুর মাধ্যমে এর সমাপ্তি হয়। এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, খেলাফতের ক্ষমতা কার্যত পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী সেলজুকি তুর্কিদের হাতে চলে যায়। এ সময় খলিফাদের দাপট ও কার্যক্ষমতা সর্বদা এক সমান ছিল না। মুসতারশিদের শাসনামল থেকে তারা তাদের হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার শুরু করে এবং মুকতাফির শাসনামল থেকে বাগদাদ ও এর আওতাধীন অঞ্চলসমূহের ওপর নিরঙ্কুশ শাসন প্রতিষ্ঠা করে। অনুরূপভাবে আন-নাসেরের শাসনামল থেকে তারা আবারও ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে এবং ইরাকে নিরঙ্কুশ শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ৬৬ বছর সময় তারা কোনো সুলতানের সামনে মাথা নত না করে শাসন করে। পরিশেষে মোঙ্গলরা পশ্চিম দিক থেকে ঘূর্ণিবেগে ধেয়ে আসে এবং একের পর এক রাজ্য দখল করে সেখানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। অতঃপর তারা বাগদাদ দখল করে আব্বাসি খেলাফতের পতন ঘটায়। এ যুগে ইউরোপীয়রা নিকট-প্রাচ্যে ব্যাপক আক্রমণ চালায়—যা ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে পরিচিত। খলিফা কায়েম, মুকতাদি, মুসতাজহির, মুসতারশিদ, রাশেদ, মুকতাফি, মুসতানজিদ, মুসতাজি, নাসের, জাহের, মুসতানসির, মুস্তা'সিম—প্রত্যেকে এ যুগের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

সেলজুকি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

একাদশ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যভাগে ইতিহাসের নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা হয়, যেখানে ইসলামি বিশ্বের পূর্বাঞ্চলের সর্বত্র আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ সময় তুর্কিরা ক্রমবর্ধমান বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শাসনক্ষমতা লাভ করে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুভাগ পর্যন্ত তাদের শাসন টিকে থাকে।

মূলত সেলজুকিরা ছিল তুর্কি 'কুনক গাযিয়্যা' বংশের অন্তর্গত। তাদের পূর্বপুরুষ (সেলজুক বিন দাক্কাকের) দিকে সম্পৃক্ত করে তাদের সেলজুকি বলা হয়।[৫২৯] এ পরিবারের মধ্য হতে তিনিই প্রথম ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। তাদের মূল আবাস ছিল চীন থেকে নিয়ে কাস্পিয়ান সাগরের তীর পর্যন্ত

---

[৫২৯]. *আখবারুদ দাওলাতিস সালজুকিয়্যা*, সদরুদ্দিন বিন আলি, পৃ. ২-৩।

বিস্তীর্ণ মরুভূমি ও সমতল তৃণভূমিতে।[৫৩০] তারা সুন্নি মতাদর্শ গ্রহণ করে এবং পূর্ণোদ্যম ও সাহসিকতার সঙ্গে সুন্নাহর পক্ষে কাজ করে।

অর্থনৈতিক মন্দা ও গোত্রীয় যুদ্ধের কারণে ৩৭৫ হি. মোতাবেক ৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তারা নিজেদের আসল ভূমি ছেড়ে মাওয়ারা-উন-নাহর (Transoxiana) ও খোরাসানে হিজরত করে। সেখানে পৌঁছে তারা গজনবিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তুঘরিল বেগ সেলজুকি ৪৩১ হি. মোতাবেক ১০৪০ খ্রিষ্টাব্দে দানদাকান যুদ্ধে সুলতান মাসউদ গজনবিকে পরাজিত করে খোরাসানে সেলজুকি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। সেখানে তারা বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এরপরের বছরই আব্বাসি খলিফা তাদের আধিপত্যের স্বীকৃতি প্রদান করেন।[৫৩১]

আব্বাসি খলিফা মূলত বুওয়াইহি শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য সেলজুকিদের স্বীকৃতি প্রদান করেন। সেই সুবাদে সেলজুকিরা পারস্যে তাদের রাজ্য সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখে এবং ইরাকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। ৪৪৭ হি. মোতাবেক ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তারা ইরাকে প্রবেশ করে। তুঘরিল বেগ যে-সকল অঞ্চলের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, খলিফা সেসবের স্বীকৃতি প্রদান করেন। সেই সঙ্গে খুতবায় তার নাম উল্লেখের আদেশ দেন।[৫৩২] এভাবেই ইরাকে সেলজুকিরা আধিপত্য বিস্তার করে।

আব্বাসি খেলাফত ও সেলজুকি সাম্রাজ্যের মধ্যকার সম্পর্ক

সেলজুকি সাম্রাজ্যের সঙ্গে আব্বাসি খেলাফতের সম্পর্ক বুওয়াইহিদের সম্পর্কে তুলনায় ভালো ছিল। কারণ, সেলজুকিরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী হওয়ার কারণে খলিফাদের ধর্মীয় দিক থেকেও খুব সম্মান করত। তাদের প্রতি এমন ভক্তি ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করত—যা দ্বারা তাদের ধর্মীয় পদমর্যাদার হক আদায় হয়ে যায়। অন্যদিকে সেলজুকিরা মাশরিকে ইসলামিকে (ইসলামি প্রাচ্য) নতুন করে তাদের পতাকাতলে একতাবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। এ ছাড়াও তারা বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পশ্চিম এশিয়ায় বসফরাস প্রণালি পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে এবং ফাতেমিদেরকে হটিয়ে সিরিয়ার সিংহভাগের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।

---

৫৩০. *তারিখু বুখারা*, আরমিনিয়াস ভাম্বেরি, পৃ. ১২৭।

৫৩১. *রাহাতুস সুদর ওয়া আয়াতুস সুরুর ফি তারিখিদ দাওলাতিস সালজুকিয়্যা*, রাওয়ানদি, পৃ. ১৬৮।

৫৩২. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৮, পৃ. ১২৫-১২৬।

কিন্তু তুঘরিল বেগ ইরাকের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে চাইলে অল্প সময়ের মধ্যে তার ও খলিফার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

৪৫৫ হি. মোতাবেক ১০৬৩ খ্রিষ্টাব্দে আলপ আরসালান উত্তরাধিকারসূত্রে বিশাল সেলজুকি সাম্রাজ্যের শাসনক্ষমতা লাভ করেন। তার শাসনামলে পরিস্থিতি পূর্বের মতোই ছিল। তারপর তার পুত্র মালিকশাহ উত্তরাধিকারী হন। মালিকশাহর যুগে খলিফা অনেক অপমানের শিকার হন। এদিকে সুলতানের অনেক প্রশাসক ধর্মীয় বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করে। যেমন, তাদের দরজার সামনে তবলা বাজানোর প্রচলন করে।[৫৩৩] মালিকশাহর সাথে খলিফার সম্পর্ক ক্রমেই খারাপ হতে থাকে। একপর্যায়ে খলিফা মালিকশাহকে বাগদাদ থেকে বিতাড়িত করে খেলাফতের রাজধানী ইসফাহানে স্থানান্তরের সংকল্প করেন। কিন্তু ভাগ্যের লিখন সুলতানের পক্ষে ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে হীনভাবে খলিফার পদচ্যুতি ঘটে।

সেলজুকদের পতন

৪৮৫ হি. মোতাবেক ১০৯২ খ্রিষ্টাব্দে মালিকশাহ মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তার সন্তানদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে বিশাল সেলজুকি সাম্রাজ্যে ভাঙন সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টি সেলজুকি পরিবার ও খেলাফত উভয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেলজুকি সাম্রাজ্য বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সেগুলো হলো, ইরাকি সেলজুকি, কিরমানি সেলজুকি, সিরীয় সেলজুকি ও রোমান সেলজুকি। এ ছাড়াও সেলজুকিদের শীর্ষস্থানীয় অনেক ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এহেন সঙ্গিন পরিস্থিতিতে খলিফা তাদের বিবাদ নিরসনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। খলিফা সেলজুকিদের শৃঙ্খল হতে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে তাদের বিবাদ নিরসনের ক্ষেত্রে নিজের সুবিধা অনুযায়ী ফয়সালা করতেন। অনেক সময় খলিফা তাদের বিবাদ দেখে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতেন। দেখা যেত খলিফা কখনো সেলজুকিদের কেন্দ্রীয় শাসনকে সমর্থন করছেন, আবার কখনো একই সময়ে একাধিক বা সর্বাধিক প্রভাবশালীকে সমর্থন করছেন। এভাবে তিনি সেলজুকিদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ জিইয়ে রেখে তাদের শক্তি খর্ব করার চেষ্টা করেন। খলিফা মুসতারশিদ ও তার পরবর্তী খলিফাগণ

---

৫৩৩. *তারিখু দাওলাতি আলি সালজুক*, বুন্দারি, পৃ. ৫৫।

এ সুযোগে খেলাফতের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন।[৫৩৪] এ কারণে ৫৪৩ হি. মোতাবেক ১১৪৮ খ্রি.-কে খেলাফতের পুনর্জাগরণের কার্যত সূচনাকাল হিসেবে গণ্য করা হয়। মূলত এসব ছিল ইরাকের শাসক সুলতান মাসউদের ব্যর্থতার ফল। যিনি তার অধীন প্রশাসকদের বিদ্রোহ দমন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। এ পরিস্থিতি খলিফাকে তার ক্ষমতা সুসংহত করার সুযোগ করে দেয়। ৫৪৭ হি. মোতাবেক ১১৫২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতানের মৃত্যু হলে সেলজুকি সাম্রাজ্য ইরাকে তাদের সবচেয়ে বড় খুঁটিটি হারায়। অতঃপর সেলজুকিদের মধ্যে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। শাসনব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়তে শুরু করে। এমনকি এত বেশি অরাজকতা সৃষ্টি হয় যে, ইরাকে সেলজুকিদের আধিপত্য ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে। দ্বিতীয় সুলতান মুহাম্মাদের উত্তরসূরিরা ৫৫৪ হি. মোতাবেক ১১০৯ খ্রিষ্টাব্দে তাদের পূর্বেকার আধিপত্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু তারা খলিফার কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ঐতিহাসিক সেলজুকি বুন্দারি এ অবস্থাকে এ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—"বাগদাদের বিষয়ে তাদের অন্তরে ভয় জায়গা করে নিয়েছে, ফলে ব্যর্থতা তাদের পেয়ে বসেছে। এরপর তাদের কাছে না ক্ষমতা এসেছে, আর না তাদের কোনো সুলতান মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে।"[৫৩৫]

আব্বাসি খলিফারা সেলজুকিদের চাপ থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে তাদের সঙ্গে লড়াই অব্যাহত রাখেন। পরিশেষে খলিফা নাসেরের শাসনামলে আব্বাসিরা সেলজুকিদের থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেন।

৫৫২ হি. মোতাবেক ১১৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সানজারের মৃত্যুর মাধ্যমে পারস্য ও খোরাসানে সেলজুকিদের বিশাল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। ৫৪৮ হি. মোতাবেক ১১৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সানজার ঘোজ তুর্কিদের কাছে পরাজিত হয়ে তাদের হাতে বন্দি হন। কিন্তু তারা তার সঙ্গে সম্মানসূচক আচরণ করে। ৫৫১ হিজরির রমজান মোতাবেক ১১৫৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত তিনি অবরুদ্ধ ছিলেন। অতঃপর তার সহযোগীরা তাকে মুক্ত করে তার সাম্রাজ্যের রাজধানী খোরাসানের প্রধান নগরী মার্ভে নিয়ে যান। এরপরের বছর তিনি আপন সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংসের বেদনায় শোকাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

---

৫৩৪. The Chaliphate : Arnold. p 80.

৫৩৫. *তারিখু দাওলাতি আলি সালজুক*, বুন্দারি, পৃ. ২৬৮।

মাওয়ারা-উন-নাহরের অঞ্চলগুলো থেকে খাওয়ারিজম মরুভূমিবেষ্টিত হওয়ার কারণে যুদ্ধবিগ্রহ থেকে দূরে ছিল। এ কারণে নগরবাসী ও কৃষকেরা সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। খাওয়ারিজম শাহের পরিবারের কয়েক সদস্য দ্বাদশ হিজরির শুরুভাগে সেলজুকি সাম্রাজ্যের মতোই আরেকটি তুর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। আব্বাসি খলিফা নাসের খাওয়ারিজমি নেতা টেকিশ (Tekish)-এর সহযোগিতায় ৫৯০ হি. মোতাবেক ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের সর্বশেষ সেলজুকি সুলতান তৃতীয় তুঘরিলকে হত্যা করেন। এরপর খাওয়ারিজমিরা খেলাফতের বিষয়ে অন্যায় হস্তক্ষেপ করতে চাইলে খলিফা মোঙ্গলদের সহযোগিতায় তাদের মোকাবেলা করেন।[৫৩৬]

* * *

৫৩৬. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ১০, পৃ. ১২৭-১২৮, ৪০০-৪০১; *তারিখু কাহিরিল আলম*, জুওয়াইনি, খ. ১, পৃ. ২৭৯।

আব্বাসি খেলাফতের শেষ অধ্যায়

(৫৯০-৬৫৬ হি./১১৯৪-১২৫৮ খ্রি.)

আতাবেকি সাম্রাজ্য

সেলজুকিদের দুর্বলতার সুযোগে তাদের শাসনকালের শেষদিকে আব্বাসি খেলাফতের মধ্যে আরেকটি বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য আত্মপ্রকাশ করে। যা আতাবেকি সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। মূলত আতাবেকিরা ছিল তুর্কি বংশোদ্ভূত। সেলজুকি সাম্রাজ্যে আতাবেকিদের আবির্ভাব হয় তাদের তুর্কি ক্রীতদাস ক্রয় করে রাজদরবারের খেদমত, তাদের সন্তানদের প্রতিপালন ও রাষ্ট্রীয় পদাধিকারী করার নীতি থেকে। আতাবেকিরা প্রশাসনিক ও সামরিক সেক্টরে উন্নতি করে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পদে পৌঁছে যায়। সুলতান মালিকশাহের মৃত্যুর পর সেলজুকিরা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তারা নিজ নিজ শাসনাধীন অঞ্চলগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করে এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ফলে সেলজুকিদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মতো আতাবেকিদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। আতাবেকিরা যে-সকল বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র গড়ে তোলে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—কেফা, মারদিন, দামেশক, দানেশমান্দ, মসুল (মাওসিল), জাজিরা, আজারবাইজান ও পারস্য। উল্লেখ্য যে, আতাবেকি সাম্রাজ্যের কয়েকটি অঙ্গ রাজ্য [যেমন : মসুল ও আলেপ্পো] ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখে; যা ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছে।

ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় পূর্ব আরবের ইসলামি বাহিনী

একাদশ হিজরির শেষের দিকে পূর্ব আরবের ইসলামি বাহিনী ক্রুসেডার নামে পরিচিত (ল্যাটিন ইউরোপীয় বাহিনীর) সঙ্গে যুদ্ধ করে। তারা খেলাফতের নিয়ন্ত্রণাধীন কিছু অংশকে বিচ্ছিন্ন করতে তুর্কি শাসক ও আতাবেকিদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। দীর্ঘ দুই যুগ পর্যন্ত এই অঞ্চলে বিশেষ পরিস্থিতি বিরাজ করে।

এখানে ক্রুসেড অভিযানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে এ কথা আমরা বলতে পারি যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে যে দীর্ঘ বিরোধ চলে

আসছিল, এটি সেই ধারাবাহিকতারই অংশ। যা একেক যুগে একেক রূপে প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিচারে সবগুলোই ছিল অভিন্ন।

ঐতিহাসিকগণ আটটি ক্রুসেড হামলার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে চারটি হামলা হয় পুণ্যভূমি ফিলিস্তিনে। অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ষষ্ঠবারের হামলা। দুটি মিসরের বিরুদ্ধে; সেগুলো হলো পঞ্চম ও সপ্তমবারের হামলা। একটি কনস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে, সেটি ছিল চতুর্থ হামলা। আর অষ্টমবারের হামলাটি ছিল উত্তর আফ্রিকায়।

১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে পোপ দ্বিতীয় আরবান কর্তৃক ক্লেরমন্টে (Clermont) ক্রুসেড যুদ্ধের ঘোষণার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। ইউরোপ থেকে পূর্ব আরবের দিকে প্রথম হামলা করা হয়। ক্রুসেডাররা এডেসা, আন্তাকিয়া, বাইতুল মাকদিস ও ত্রিপোলিতে চারটি ক্রুসেডীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। মুসলিমরা প্রথমে ক্রুসেডারদেরকে রোমান বাইজেন্টাইনদের মতো ধারণা করে বড় ভুল করেছিল।

ক্রুসেডাররা মুসলিমদের অধঃপতন ও বিভক্তির সুযোগে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। তাদের সেনাবাহিনী আমেদ, নুসাইবিন, রা'সুল আইন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এদিকে রাক্কাহ ও হাররানবাসীরা ইউরোপীয়দের নির্যাতন ও হামলার আশঙ্কায় কালাতিপাত করতে থাকে। ফলে রাহবা[৫৩৭] ও সিরিয়ার মরুভূমি ছাড়া দামেশকে পৌঁছার অন্যান্য রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। তখন বণিকদল ও মুসাফিররা অনেক ঝুঁকি নিয়ে সফর করে। মরু অঞ্চল দিয়ে সফরের কারণে তাদের সীমাহীন কষ্ট হয়। এদিকে বেদুইনদের থেকে তাদের জানমালের ওপর আক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হয়। এর ওপর আরও জটিলতা সৃষ্টি হয় যখন প্রতিটি শহর ও অঞ্চল অতিক্রমের কারণে নিরাপত্তাস্বরূপ কর ও শুল্ক ধার্য করা হয়। সিরিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা এসব অঞ্চলের চেয়ে আরও সঙ্গিন ছিল। তখন মুসলিম শাসকরা তাদের দ্বীন ও স্বধর্মাবলম্বীদের সাহায্য করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল।[৫৩৮] অবশেষে সাধারণ জনগণ ও সিরিয়ার ঘটনাপ্রবাহের প্রত্যক্ষদর্শীদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে।

সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য বড় শহরগুলোর নিয়ন্ত্রণ মুসলিমদের হাতেই ছিল। কালপরিক্রমায় তাদের অন্তরে এ কথার বোধোদয় হয় যে,

---

৫৩৭. রাহবা : বর্তমান আবুধাবির অন্তর্গত একটি শহর।—অনুবাদক

৫৩৮. *আত-তারিখুল বাহির ফিদ দাওলাতিল আতাবিকিয়্যাহ ফিল মাওসিল*, ইবনুল আছির, পৃ. ৩২-৩৩।

ক্রুসেডাররা যে-সকল সমুদ্র বন্দরের দখল নিয়েছে, সেগুলোর বিশেষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। তারা এ কথাও বুঝতে পারে যে, এ সকল ঔপনিবেশিক স্থানীয় পরিবেশের সাথে মিশে যেতে আগ্রহী নয়। যেহেতু তারা উদার রাজনীতির চর্চা করে না, তাই যেকোনো সময় আবার মুসলিমদের ওপর হামলা করতে পারে।

এর ফলে নতুন করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও মোকাবেলা করার চিন্তা জাগ্রত হচ্ছিল। সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে অধঃপতন ও রাজনৈতিক বিভক্তির কারণে ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় পরাজয়ের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট—এ চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে। এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, জনবল ও সম্পদে সমৃদ্ধ নগরী জাজিরা ও মসুলের মুসলিমদের সহযোগিতা ব্যতীত সিরিয়াবাসীদের পক্ষে একাকী ক্রুসেডারদের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে জিহাদের চিন্তা মসুল, আলেপ্পো ও দামেশকে ছড়িয়ে পড়ে। তখনকার রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির অপরিহার্য দাবি ছিল—এমন একজন নেতার আবির্ভাব হওয়া, যিনি আঞ্চলিক শাসকদের বিবাদ নিরসন করে সকলকে ইসলামের পতাকাতলে একত্র করতে সক্ষম হবেন। সবাইকে সাথে নিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। অবশেষে মসুলের আতাবেকিরা এ গুরুদায়িত্ব পালন করে।

জেনগি ও ক্রুসেডার[৫৩৯]

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মসুল, আলেপ্পো ও দামেশকে ইমাদুদ্দিন জেনগির নেতৃত্বে জেনগি পরিবারের আবির্ভাব হয়। সেলজুকি সুলতান মুহাম্মাদ ৫২১ হি. মোতাবেক ১১২৭ খ্রিষ্টাব্দে তাকে মসুল, জাজিরা ও সিরিয়ার বিজিত অঞ্চলগুলোর গভর্নর নিযুক্ত করেন।[৫৪০]

ইমাদুদ্দিন জেনগি তার প্রথম জীবনে সেলজুকি শাসক আলপ আরসালান ও ফররুখ শাহের সেনাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন দক্ষ সৈনিক, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ও শ্রেষ্ঠ প্রশাসক। শাসনকার্য পরিচালনার মাধ্যমে তিনি এ সকল গুণাবলি অর্জন করেন। তিনি আলেপ্পো, সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল ও জাজিরায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসলামি বিশ্বের কিছু অংশকে একতাবদ্ধ করেন। এরপর মসুলের পার্শ্ববর্তী এডেসায় আক্রমণ করে তা জয়

---

৫৩৯. ক্রুসেডারদের সাথে যিনকিদের সম্পর্ক ও যিনকিদের ইতিহাস জানতে দেখুন আমার রচিত গ্রন্থ : *তারিখুয যানকিয়্যিন ফিল মাওসিল ও বিলাদিশ শাম*।

৫৪০. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৯, পৃ. ৭-৮।

করেন এবং জুমাদাল উখরা ৫৩৯ হি. মোতাবেক ডিসেম্বর ১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তা ক্রুসেডারদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেন। এটি ছিল তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এ বিজয়কে ইসলামের তরে তার বিশাল খেদমত হিসেবে গণ্য করা হয়।[৫৪১] এরপর মসুল থেকে আলেপ্পোর দীর্ঘ পথকে ক্রুসেডারদের উপস্থিতি থেকে পবিত্র করা হয়। এ বিজয়ের ফলে পূর্ব-আরবের ইসলামি ভূখণ্ডে ক্ষমতার পট পরিবর্তন হয়। মুসলিমরা ক্রুসেডারদের দুর্বলতা অনুভব করে নিজেদের ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়। এ বিজয় পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান সমাজে বিরাট যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। এরপর ইমাদুদ্দিন জেনগি তার এক ক্রীতদাসের হাতে নিহত হন। ৫৪১ হিজরির রবিউস সানি মোতাবেক ১১৪৬ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় তিনি ফোরাত নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত জাবর দুর্গ অবরোধ করে ছিলেন—যা তখনো উকায়লিদের অধিকারে ছিল।[৫৪২]

ইমাদুদ্দিন জেনগি ছিলেন একজন প্রজাবৎসল শাসক। তাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন। অনুরূপভাবে স্বেচ্ছাচারী শাসকদের মোকাবেলায় তিনি ছিলেন দুর্বলদের আশ্রয়স্থল। তার শাসনামলে সর্বত্র ন্যায়নীতি বিরাজ করে এবং মানুষ তাদের জানমালের নিরাপত্তা লাভ করে।

ইমাদুদ্দিনের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র সাইফুদ্দিন গাজি ও নুরুদ্দিন মাহমুদ তাদের পিতার উত্তরাধিকার বণ্টন করে নেন। প্রথমজন পূর্বাঞ্চল শাসন করেন। তার অবস্থান ছিল মসুলে। আর দ্বিতীয়জন পশ্চিমাঞ্চল শাসন করেন। তার রাজধানী ছিল আলেপ্পো।[৫৪৩] তাদের সময়ও বৃহৎ দুটি সমস্যা বিদ্যমান ছিল, যার সমাধানের পেছনে ইমাদুদ্দিন জেনগি তার শাসনকালের সিংহভাগ ব্যয় করেছেন। একটি হলো, দামেশকের সমস্যা। যেখানে বুরিরা শাসন করছিল, যারা ক্রুসেডারদের সহায়তা করত। অপরটি হলো, বিভিন্ন অঞ্চলের ল্যাটিন শাসন।

সমকালীন ও পরবর্তী প্রজন্মের নজরে নুরুদ্দিন জেনগির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, দ্বীনি বিষয়ে প্রচণ্ড গায়রত বা অহমিকা তিনি মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ দ্বীনি অহমিকার পাশাপাশি তিনি মুসলিমদের মধ্যে রুহানি ঐক্য পুনরুদ্ধারের সংকল্প করেন। এ লক্ষ্যে তিনি

---

৫৪১. *আত-তারিখুল বাহির ফিদ দাওলাতিল আতাবিকিয়্যাহ ফিল মাওসিল*, ইবনুল আছির, পৃ. ৬৯।
৫৪২. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৯, পৃ. ১৪২।
৫৪৩. প্রাগুক্ত : খ. ৯, পৃ. ১৩-১৪।

দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, খোদার সাহায্যের শর্ত হলো মুসলিমদের রাজনৈতিক ঐক্য। অতঃপর তিনি জিহাদের বিষয়ে অবহেলাকারী অথবা ক্রুসেডারদের সহায়তাকারী প্রশাসকদের পদচ্যুত করেন। এদিকে দামেশকের নেতারা তার ইসলামিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বেশ কয়েকবার প্রচেষ্টার পর তিনি ৫৪৯ হি. মোতাবেক ১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দে দামেশককে সঙ্গে করে তার নেতৃত্বে সিরিয়ার মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্রুসেডারদের জন্য এ ঐক্য বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এরপর তিনি এডেসা শাসনের পতনের ফলে পূর্বাঞ্চলে ক্রুসেডারদের দ্বিতীয়বারের হামলা রুখে দেন। অতঃপর ক্রুসেড সাম্রাজ্যের অবসান ঘটানোর প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সিরিয়ার কয়েকটি শহর জয় করেন এবং জর্ডান ও আসির পশ্চিমে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চলের ক্রুসেডারদের অবরোধ করেন।[৫৪৪]

নুরুদ্দিন মিসরের দখল নিয়ে, যা তখন ফাতেমি শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে মন্ত্রিত্বের লড়াইয়ের কারণে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় জর্জরিত ছিল—বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসকের সঙ্গে রক্তাক্ত সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। নুরুদ্দিন দুটি লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করেন : রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। কারণ, মিসরকে সিরিয়ার শাসনের অধীন করতে পারলে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করার সুযোগ তৈরি হবে। বিপরীতে বাইতুল মাকদিসের শাসক প্রথম আমুরি (Amalric)-এর হাতে মিসরের নিয়ন্ত্রণ চলে গেলে তার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে সিরিয়া অবরোধের সুযোগ তৈরি হবে—যা ইসলামি ঐক্যের জন্য চরম ঝুঁকির কারণ হবে। উপরন্তু মিসরের বিরাট বাণিজ্য, সুবিশাল আলেজান্দ্রিয়া বন্দর এবং এদেশকে কেন্দ্র করে যে বিশ্ববাণিজ্য হচ্ছে, এসব বিষয়ও তার চিন্তায় ছিল। কেননা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার বাণিজ্যের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও উত্তম পথগুলোতে মিসর শাসন করত।[৫৪৫]

এ দ্বন্দ্ব চলাকালে আইয়ুবিদের উত্থান হয়, যারা ইমাদুদ্দিন জেনগি ও তার পুত্র নুরুদ্দিনের অধীনে শাসক হিসেবে কাজ করত। এটি ছিল একটি কুর্দি বংশ। পূর্ব আরবে (মাশরিক আরাবি) ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় তারা

---

৫৪৪. *আত-তারিখুল বাহির ফিদ দাওলাতিল আতাবিকিয়্যাহ ফিল মাওসিল*, ইবনুল আছির, পৃ. ১০৭।

৫৪৫. The Crusaders in the East : Stevenson. pp - 185-186; Saladin : Andrew S. Ehrenkreutz. pp 17-18, Nour Addin : Elisseeff. II p 585.

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের মধ্যে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতনামা ব্যক্তি। তার চাচা আসাদুদ্দিন শেরকোহ মিসর আক্রমণকালে তিনিও তার সঙ্গে ছিলেন। নুরুদ্দিন মিসরকে জেনগি শাসনের অধীন করতে তাকে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন।

আসাদুদ্দিন শেরকোহ মিসর দখল করে সেখানকার মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। তার মৃত্যুর পর সালাহুদ্দিন আইয়ুবি তার স্থলাভিষিক্ত হন। নুরুদ্দিনের পীড়াপীড়িতে তিনি ফাতেমি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটান। ৫৬৭ হিজরির মহররম মোতাবেক ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম শুক্রবার ফাতেমি শাসক আজেদ খুতবা প্রদান করেন। খুতবায় তিনি আব্বাসি খলিফা মুস্তাজির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।[৫৪৬]

সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ছিলেন স্বাধীনচেতা পুরুষ, তাই তিনি মিসরের স্বায়ত্তশাসন অর্জনের মনস্থ করেন। অবশ্য এ কারণে নুরুদ্দিনের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি হয়। কেননা, তিনিই তাকে মিসর শাসনে নিজের প্রতিনিধি করেছিলেন। ৫৬৯ হিজরির শাওয়াল মোতাবেক ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে নুরুদ্দিন জেনগির মৃত্যু হলে তার পুত্র সালেহ ইসমাঈল তার স্থলাভিষিক্ত হন।

যেহেতু তিনি ছিলেন দায়িত্বের বিষয়ে অবহেলাকারী তাই সালাহুদ্দিন আইয়ুবি আশঙ্কা করেন—এ মুহূর্তে খলিফার একজন সহযোগীর প্রয়োজন। তিনি মনে করেন—তিনি সেই সহযোগী হওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার।[৫৪৭] এ কারণে তিনি মুসলিমবিশ্বকে একতাবদ্ধ করা ও এই অঞ্চল থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করার ক্ষেত্রে ইমামুদ্দিন জেনগি ও নুরুদ্দিনের নীতির অনুসরণ করেন। সিরিয়াকে মিসরের অধীন করার উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। ৫৭৭ হি. মোতাবেক ১১৮১ খ্রিষ্টাব্দে সালেহ ইসমাইলের মৃত্যুর পর তার পরিকল্পনার প্রথম অংশ বাস্তবায়ন করে দ্বিতীয় অংশ বাস্তবায়নের দিকে মনোনিবেশ করেন।

আইয়ুবি ও ক্রুসেডার

ক্রুসেডাররা ফরাসি রাজা ফিলিপ অগাস্টাস (Philip Augusty) ও ইংরেজ রাজা রিচার্ড লায়নহার্ট (Richard Lionhrt)-এর নেতৃত্বে তৃতীয়বার হামলা

---

৫৪৬. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৯, পৃ. ৩৬৪; *মুফাররিজুল কুরুব ফি আখবারি বনি আইয়ুব*, ইবনু ওয়াসেল, খ. ১, পৃ. ১৬৩; *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ৫, পৃ. ৩৪১।

৫৪৭. *মুফাররিজুল কুরুব ফি আখবারি বনি আইয়ুব*, ইবনু ওয়াসেল, খ. ২, পৃ. ৭, ১৮।

করলে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি তাদের মোকাবেলা করেন। এরপর থেকে পশ্চিমা ইউরোপীয়রা তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ভালো করে জানতে পারে। সম্ভবত সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ব্যক্তিত্ব নুরুদ্দিনের ব্যক্তিত্বের চেয়ে অধিক আকর্ষণীয় ছিল। এ কারণে সালাহুদ্দিনের ব্যক্তিত্ব নুরুদ্দিনের ব্যক্তিত্বকে পরবর্তী প্রজন্ম থেকে আড়াল করে দিয়েছে। তবে উভয়ের নীতি ছিল অভিন্ন; বরং বলা যায়, সালাহুদ্দিন নুরুদ্দিনের নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করে সফলতার চূড়ায় আরোহণ করেছেন।

ক্রুসেডাররা প্রায় সময় সিরিয়ায় ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে হামলা করত। তখন সালাহুদ্দিন ফিলিস্তিনের দিকে তাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৫৭৩ হিজরির জুমাদাল উলা মোতাবেক ১১৭৭ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রামলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে 'তাল আল-জাযার' (Tell Jezer)-এর কাছে তিনি পরাজিত হন।[৫৪৮] এরপর তিনি আর দুবছরের মধ্যে এর বদলা নিতে সক্ষম হননি। দুবছর পর তিনি 'তাল আল-কাযি' (Dan)-এর নিকটে, লিটানি নদী ও জর্ডান নদীর প্রধান স্রোতধারার মধ্যবর্তী মারজাইয়ুন (Marjayoun)-এর সমতলে চতুর্থ বাল্ডউইনকে পরাজিত করেন। ৫৭৪ হিজরির জিলহজ মোতাবেক ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে এ বিজয় অর্জিত হয়।[৫৪৯]

সালাহুদ্দিনের ক্রমাগত বিজয়ের কারণে রাজা চতুর্থ বাল্ডউইন দুবছরের জন্য সন্ধির প্রস্তাব করতে বাধ্য হয়। সালাহুদ্দিন এতে সম্মত হলে ৫৭৫ হিজরির জিলহজ মোতাবেক ১১৮০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে দুপক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৫৫০]

সে সময় ক্রুসেডারদের জুনিয়র শাসকদের মধ্যে বিরোধের কারণে বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসন চরম সংকটের মধ্যে ছিল, যে-কারণে সন্ধি রক্ষা করা ছাড়া তাদের জন্য কোনো উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু কারাকের শাসক রেনাল্ড চেটিলনের (Raynald Chatillon) পক্ষে রাজনীতির প্রতিকূল পরিস্থিতি বুঝে ওঠা সম্ভব হচ্ছিল না। তার ভূখণ্ডের পাশ দিয়ে মুসলিমদের বাণিজ্যিক কাফেলার নিশ্চিন্ত সফর সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। ফলে সে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে ওই সকল কাফেলার ওপর আক্রমণ করে। রেনাল্ড

---

[৫৪৮]. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৯, পৃ. ১৪১-১৪২।

[৫৪৯]. *কিতাবুর রাওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইনি : আন-নুরিয়্যা ওয়াস সালাহিয়্যাহ*, আবু শামাহ, খ. ২, পৃ. ১০-১১।

[৫৫০]. *তারিখুল আমালিল মুনজাযা ফিমা ওয়ারাল বিহার*, উইলিয়াম সুরি, খ. ২. পৃ. ১০১৭।

অবিরত সীমালঙ্ঘন করতে থাকে। অবশেষে ৫৭৮ হি. মোতাবেক ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিমদের পুণ্যভূমি মক্কা ও মদিনায় আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[৫৫১] সালাহুদ্দিন আইয়ুবির পক্ষে এ সকল অনাচার চোখ বুজে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। কাজেই তিনি ৫৮৩ হি. মোতাবেক ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে সীমালঙ্ঘনকারীদের শায়েস্তা করার সংকল্প করেন। এদিকে সালাহুদ্দিন আইয়ুবিকে মিসর থেকে যাত্রা করার সময়ই শেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রেনাল্ড চেটিলন ও তার সঙ্গীরা বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা গাইডি লুসিগানকে মাওয়ারা-উন-নাহারে বিশাল সৈন্য সমাবেশ করতে রাজি করায়।

উভয় পক্ষ টাইবেরিয়াস (Tiberias)-এর নিকটে হিত্তিনের সমতলভূমিতে মুখোমুখি হয়। ৫৮৩ হিজরির রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এ যুদ্ধে ক্রুসেডারদের চরমভাবে পরাজিত করেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা গাইডি লুসিগান, রেনাল্ড চেটিলন-সহ অনেক ক্রুসেডার শাসকদের বন্দি করেন।[৫৫২] এর মাধ্যমে ক্রুসেডারদের দুর্গগুলো মুসলিমদের করতলগত হয়। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি তার সৈন্যদের সঙ্গে করে বাইতুল মুকাদ্দাসের সদর দরজা পর্যন্ত পৌছে যান। অতঃপর রজব মোতাবেক সেপ্টেম্বর মাসে বাইতুল মুকাদ্দাসবাসীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এরপর তিনি পূর্ব-আরবে ক্রুসেডারদের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে তার জিহাদি তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু সুর ও ত্রিপোলিবাসী তার সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।[৫৫৩]

বাইতুল মুকাদ্দাসের পতন পশ্চিমা ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রাচ্যে অভিযান প্রেরণের চিন্তা জাগ্রত করে। ফলে আলমানিয়ার রাজা প্রথম ফ্রেডরিক বারবারোসা (Fredrick Barbarossa), ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস ও ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড লায়নহার্ট প্রত্যেকে ক্রুশ ধারণ করে সম্মিলিত আক্রমণ চালায়। এটি ছিল ক্রুসেডারদের তৃতীয় আক্রমণ। তবে এ আক্রমণের দ্বারা উল্লেখযোগ্য কোনো ফলাফল অর্জিত হয়নি। অবশেষে তারা রামলার সন্ধিতে একমত হয়। ৫৮৮ হিজরির শাবান মোতাবেক ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সন্ধির ফলে সালাহুদ্দিন

---

৫৫১. *কিতাবুর রাওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন : আন-নুরিয়্যা ওয়াস সালাহিয়্যাহ*, আবু শামাহ, খ. ২, পৃ. ৭৫; *মুফাররিজুল কুরুব ফি আখবারি বনি আইয়ুব*, ইবনু ওয়াসেল, খ. ২, পৃ. ১২৭; *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৭৯।

৫৫২. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ১০, পৃ. ২৪-২৬।

৫৫৩. প্রাগুক্ত : খ. ১০, পৃ. ৩১-৩২।

লড, রামলা ও আসকালান-সহ অন্যান্য বিজিত অঞ্চলগুলোর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখেন। খ্রিষ্টানদের শুধু তীর্থযাত্রী হিসেবে নিরস্ত্র অবস্থায় বাইতুল মুকাদ্দাসের জিয়ারতের সুযোগ প্রদান করেন। আর ক্রুসেডারদের জন্য উপকূলীয় কিছু দুর্গ ব্যতীত আর কিছুই অবিশিষ্ট রাখেননি।[৫৫৪]

সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এ সন্ধির সুফল বেশি দিন ভোগ করতে পারেননি। বরং সন্ধিচুক্তির কয়েক মাস পরেই ৫৮৯ হিজরির সফর মোতাবেক ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য নিজ সন্তানাদি ও ভাই আদিলের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তার মৃতুর পর এক বছর যেতে না যেতে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। আদিল সহোদর সালাহুদ্দিনের সন্তানদের এক এক করে শেষ করে দেন। ৬৫৮ হি. মোতাবেক ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গলদের আক্রমণের পূর্ব-পর্যন্ত আলোপ্পোতে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বংশধরদের শাসন টিকেছিল।

মালিক আদিল আইয়ুবি উত্তরাধিকারের সিংহভাগকেই একতাবদ্ধ করতে সক্ষম হন, আবার আইয়ুবি শাসকবর্গও সকল অস্থিরতার মধ্যে ক্রুসেডার শত্রুদের মোকাবেলায় তাদের শাসনাধীন অঞ্চলগুলোতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পেরেছিলেন। উভয় পক্ষের সন্ধিমূলক বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণে নগরবাসীও উপকৃত হয়। অনেক সময় এ সন্ধি ভঙ্গ করা হয়। মূলত পশ্চিমা ইউরোপীয়রাই প্রথমে সন্ধি ভঙ্গ করেছে এবং তারা মুসলিমদের থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে।

সে সময় মুসলিমবিশ্বের রাজধানী মিসরে স্থানান্তরিত হয়। যেখান থেকে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতেন। এ কারণে ক্রুসেডারদের মূল লক্ষ্য ছিল মিসর। ৬১৫ হি. মোতাবেক ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে তারা রাজা ইউহান্না ব্রায়েনের নেতৃত্বে মিসরের ওপর পঞ্চম ক্রুসেড হামলা চালায়। অতঃপর তারা মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ সইতে না পেরে পেছনে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এর পূর্বেই মালিক আদিল তীব্র মনঃকষ্টে মৃত্যুবরণ করেন।[৫৫৫]

আদিলের মৃত্যুর পর মালিক কামিল বিন আদিল আইয়ুবি শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগী হন। সিসিলির রাজা ও জার্মানির সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক, যে

---

৫৫৪. প্রাগুক্ত : খ. ১০, পৃ. ১১১-১১২; *কিতাবুর রাওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন : আন-নূরিয়্যা ওয়াস সালাহিয়্যাহ*, আবু শামাহ, খ. ২, পৃ. ২০৬; *মুফাররিজুল কুরুব ফি আখবারি বনি আইয়ুব*, ইবনু ওয়াসেল, খ. ২, পৃ. ৪০৩-৪০৪।

৫৫৫. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ১০, পৃ. ৩২৬।

৬২৫ হি. মোতাবেক ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রাচ্যের দিকে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে—তার এ চিন্তাকে সমর্থন করে। এ চিন্তা এত বেশি জোরালো হয় যে, কামিল জার্মান সম্রাটের কাছে বাইতুল মাকদিস, বেথেলহেম, নাসিরা (Nazereth) এবং দুটি করিডোর হস্তান্তর করেন, যেগুলো জাফফা ও সিডন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। এ শান্তি চুক্তিতে তার শর্ত ছিল—অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে ও ধর্মচর্চার স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। ক্রুসেডাররা সিরিয়ায় তার অধিকারভুক্ত বিষয়-সম্পত্তির সম্মান বজায় রাখার অঙ্গীকার করে।[৫৫৬] যতদিন পর্যন্ত সন্ধি বাকি থাকবে, ততদিন এ নীতি বলবৎ থাকবে বলে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

কামিল ফিলিস্তিনের সন্ধির মাধ্যমে যে মূল্য দিয়েছেন, তার সুফল ভোগ করতে শুরু করেন। তিনি আনাতোলিয়ায় (এশিয়া মাইনরে) অবস্থানরত রোমান সেলজুকি সাম্রাজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে রাজ্য সম্প্রসারণের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এর মাধ্যমে তিনি দামেশকে অবস্থানরত সহোদর মালিক আশরাফের মনে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করেন।[৫৫৭] কামিল যখন তার সহোদরের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে দামেশকের সদর ফটকে উপস্থিত হয় তখনই আশরাফ মৃত্যুবরণ করেন। আশরাফের মৃত্যুর পর কামিলও বেশদিন বেঁচে থাকেননি। তিনি ৬৩৫ হি. মোতাবেক ১২৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার পুত্র মালিক দ্বিতীয় আদিল তার স্থলাভিষিক্ত হন। দুবছর যেতে না যেতে তার ভাই মালিক সালেহ আইয়ুব তার সঙ্গে বিদ্রোহ করে তাকে মিসর থেকে বের করে দেন।[৫৫৮] এরপর মালিক সালেহ চেঙ্গিস খান থেকে পলায়নকারী খাওয়ারিজমি তুর্কিদের সহায়তায় ৬৪২ হি. মোতাবেক ১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তার চাচাতো ভাই ও কারাকের শাসক আন-নাসের দাউদ বিন মালিক আল-মুয়াজ্জাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের সাথে সম্পাদিত সন্ধির মেয়াদ শেষ হলে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে আধিপত্য বিস্তার করেন।[৫৫৯]

মালিক সালেহ আলেপ্পো ও উচ্চ জাজিরা (Upper Peninsula)-সহ সালাহুদ্দিন আইয়ুবির শাসনাধীন প্রায় গোটা সাম্রাজ্যকে এক করতে সক্ষম

---

৫৫৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৩৪-৪৩৫।

৫৫৭. *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ৬, পৃ. ২৮২-২৮৩।

৫৫৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩০০; কিতাবুর রওযাতাইন...: আবু শামাহ, পৃ. ১৬৮।

৫৫৯. *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৩১৬।

হন। তবে তার শাসনকালে আইয়ুবি পরিবারের প্রতিদ্বন্দ্বী ও ক্রুসেডার-সহ ভাড়াটে খাওয়ারিজমিদের সাথে গৃহযুদ্ধ লেগেই ছিল।

যখন বাদশাহ সালেহ আলেপ্পোর শাসক দ্বিতীয় ইউসুফের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তার কাছে সংবাদ এলো, ক্রুসেডাররা ফ্রান্সের রাজা নবম লুইস—যিনি সেন্ট নামে পরিচিত ছিলেন—এর নেতৃত্বে পুনরায় মিসর আক্রমণ করতে যাচ্ছে এবং তার সৈন্যরা (৬৪৭ হিজরির রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১২৪৯ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে) দিময়ায় অবস্থান নিয়েছে।[৫৬০]

তখন বাদশাহ সালেহ অসুস্থ ছিলেন। শাবান বা নভেম্বর মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করলে তার স্ত্রী শাজারাতুদ দুর তার মৃত্যুর সংবাদ গোপন রাখেন। তার পুত্র মুয়াজ্জাম তুরান শাহ যখন ইউফ্রেটিস উপদ্বীপ থেকে তার দাসদের নিয়ে উপস্থিত হন এবং ক্রুসেডারদের হাত থেকে দিময়াত পুনরুদ্ধার করে রাজা লুইসকে বন্দি করতে সক্ষম হন; তখন তিনি বাদশাহর মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ করেন।[৫৬১]

তুরানশাহ ও তার দাসদের আচরণ মিসরের দাসদের অতিষ্ঠ করে তোলে। তখন তারা তুরানশাহকে হত্যা করে শাজারাতুদ দুরকে সম্রাজ্ঞী করে ইজ্জুদ্দিন আইবেক জাশানকির সালেহিকে [যার উপাধি ছিল আল-মুইয] সেনাপ্রধান মনোনীত করে। অল্প দিনের মধ্যে ইজ্জুদ্দিন শাজারাতুদ দুরকে বিবাহ করেন। তিনি মিসরে ব্যাপক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫৬২] এর মাধ্যমে মিসরে আইয়ুবি সাম্রাজ্যের অবসান হয়। কেননা শাজারাতুদ দুরের পরে শাসনক্ষমতার পালাবদল হয় এবং মামলুকরা চালকের আসন দখল করে নেয়।

মোঙ্গলদের হাতে বাগদাদের পতন

মোঙ্গলরা ছিল যাযাবর জাতিগোষ্ঠীর সমষ্টি, গোবি মরুভূমির (চীনা : হানহাই) উত্তরে মোঙ্গলিয়া মালভূমি থেকে এদের উৎপত্তি। তারা আমুর নদীর (Heilong Jiang) শাখাসমূহের আশপাশে বসবাস করত। তারা পশ্চিমে বৈকাল হ্রদ ও পূর্বে মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তবর্তী গন্‌জান পর্বতমালার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

---

৫৬০. প্রাগুক্ত : খ. ১, পৃ. ৩৩৪-৩৪৫, ৩৪৬; *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, ইবনু তাগরি বারদি, খ. ৬, পৃ. ৩২৯-৩৩০।

৫৬১. *আন-নুজুমুয যাহেরা...*, খ. ৬, প. ৩৬৪-৩৬৭।

৫৬২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭৩-৩৭৫ ।

মোঙ্গল বংশ থেকে তেমুজিন বিশেষ খ্যাতি লাভ করলে মোঙ্গলরা তাকে নিজেদের সম্রাট নির্বাচন করে। অতঃপর সে চেঙ্গিস খান (জগতের প্রতাপশালী) উপাধি ধারণ করে। চেঙ্গিস খান এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। যার সীমানা পূর্বে চীন থেকে ইরাক ও কাস্পিয়ান সাগর, পশ্চিমে রাশিয়া এবং দক্ষিণে হিন্দুস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মোঙ্গলরা ৬২৪ হি. মোতাবেক ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির অধীনে পশ্চিম এশিয়ার দিকে অভিযান পরিচালনা করে। ৬৪৬ হি. মোতাবেক ১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্কো খান মোঙ্গলদের নেতা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তার ভাই হালাকু খার নেতৃত্বে পারস্যে-সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তাকে ইরাক থেকে নিয়ে মিসরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকা মোঙ্গলীয় শাসনের অধীন করতে নির্দেশ প্রদান করে। মানকো খান আব্বাসীয় খলিফাদের সাথে সম্পর্কের পরিধি নির্ধারণ করে দেয়। তাকে এ কথাও বলে দেয় যে, খলিফা যদি তোমার কথা অমান্য করে তাহলে তাকে খতম করে দেবে।[৫৬৩]

এদিকে একাধিক শাসনব্যবস্থার কারণে বাগদাদের তৎকালীন দুরবস্থা, প্রশাসন পরিচালনায় খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহর অদক্ষতা[৫৬৪] ইত্যকার বিষয়গুলো মোঙ্গল নেতাকে বাগদাদ শহরে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। ফলে, সে ৬৫৬ হিজরির সফর মোতাবেক ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বাগদাদে প্রবেশ করে শহরটি ধ্বংস করে দেয় এবং খলিফাকে হত্যা করে।[৫৬৫]

বাগদাদের পতন ও আব্বাসি খলিফার হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে আব্বাসি সাম্রাজ্যের অবসান হয়। উল্লেখ্য যে, এ সকল ঘটনা প্রবাহ খেলাফতের পদকে শূন্য করে দেয়। ফলে প্রত্যেক প্রত্যাশী নেতা এ পদ লাভের জন্য মুখিয়ে থাকে। মামলুকি সুলতান আয-যাহির বাইবার্স মিসরের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আব্বাসি পরিবারের জনৈক সদস্যকে ৬৫৯ হি. মোতাবেক ১২৬১ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের খলিফা নিযুক্ত করেন। এর মাধ্যমে তিনি শাসনকালকে শরয়ি রূপদানের চেষ্টা করেন। উসমানি সুলতান প্রথম সালিম ৯২৩ হি. মোতাবেক ১৫১৭ খ্রি. মিসরকে উসমানি সাম্রাজ্যের অধীন করার আগ পর্যন্ত মিসরে এ অবস্থাই বহাল ছিল। এরপর খেলাফতের ধারা উসমানিদের হাতে চলে যায়।

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

---

৫৬৩. *জামিউত তাওয়ারিখ*, *তারিখুল মুগোল ফি ইরান*, রশিদুদ্দিন, খ. ২, পৃ. ২৩৬-২৩৭।

৫৬৪. *আল-ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়্যাহ ওয়াদ দুওয়ালিল ইসলামিয়্যাহ*, ইবনুত তিকতাকা, পৃ. ৩৩৩।

৫৬৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ১৩, পৃ. ২০১-২০৫।
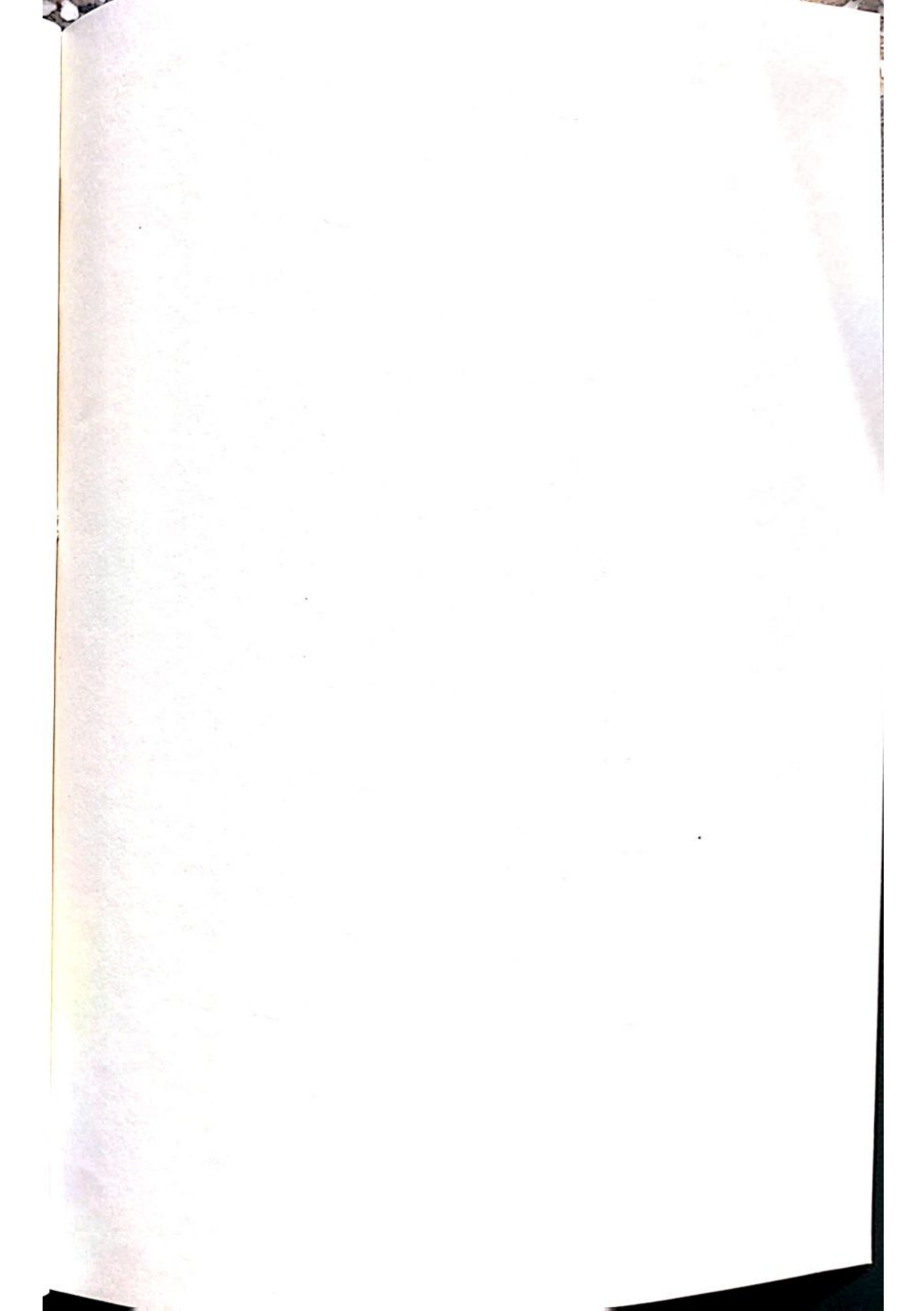
লেখক পরিচিতি

ড. সুহাইল তাক্কুশ। জন্ম ১৯৫৫ সালে লেবাননে। একজন জনপ্রিয় আরব ইতিহাসবিদ, লেখক ও গবেষক। পড়াশোনা করেছেন আল আজহার ইউনিভার্সিটিতে। বর্তমানে বৈরুতের ইমাম আওযায়ি ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। মূলত তুর্কি ইতিহাসে উচ্চতর ডিগ্রি নিলেও সামগ্রিকভাবে ইসলামি ইতিহাস তার কাজের ক্ষেত্র। মুসলিম ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সব সময়কাল ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে লিখেছেন দুই হাতে, এখনো লিখে চলেছেন। ইতিহাসে এখন পর্যন্ত তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশের ঘর ছুঁয়েছে। গতানুগতিক ধারার বাইরে ইতিহাস রচনা ও বিশ্লেষণের স্বতন্ত্র শৈলী তাকে এনে দিয়েছে অনন্য খ্যাতি।

কেমন ছিল জাহিলি আরব? কোন আঁধারে আলোর বার্তা নিয়ে আগমন ঘটল মহানবির? কী বিপুল বিস্ময় আর মাহাত্ম্য লুকিয়ে আছে তার গোটা জীবনাদর্শের পরতে পরতে? কী অপরূপ ছিল খেলাফতে রাশেদার স্বর্ণ-ফলানো দিনগুলো? তারপর সহসাই সর্বগ্রাসী ফেতনার চোরা স্রোতে সবকিছু ডুবতে গিয়েও ইসলাম ফের স্বমহিমায় উজ্জ্বল হলো কীভাবে? উমাইয়াদের রাজ্য-জয়ের তুমুল হিরিক, আব্বাসিদের জ্ঞানগরিমার উৎকর্ষ, আন্দালুসের বিজ্ঞানচর্চার মাহাত্ম্য, বাদ যায়নি গৌরবের কোনো অধ্যায়। ছোট-বড় সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই স্থান পেয়েছে এখানে। আছে রাজনৈতিক ভাঙাগড়া এবং পরাজয় ও পতনের বেদনাবিধুর উপাখ্যানও। আব্বাসিশাসনের মাঝবয়স থেকে গড়ে ওঠা স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলো, ফাতেমি, আইয়ুবি ও মামলুক সালতানাত এবং সর্বশেষ তুর্কিদের সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত শাসনের শুরু থেকে শেষ, সবকিছুই উঠে এসেছে অত্যন্ত নির্মোহ ও বিশ্লেষণাত্মক বিবরণে এবং ঝরঝরে ও প্রাণবন্ত গদ্যে।

ইসলামের ইতিহাস জানতে সামান্য আগ্রহ থাকলে, মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রী এবং বিশেষত ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য নিঃসন্দেহে একটি মাস্টারপিস বই মুসলিম জাতির ইতিহাস।

- আব্দুর রহমান আদ-দাখিল